প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক : চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১, বাংলাদেশ। মুদ্রণ : এম, আলম, ইডেন প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল।

রুবিকে

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

সৌন্দর্যের দরজায় শিল্পী উন্নিদ্র প্রহরী। যদিও শিল্পী জানে এই দায়িত্ব পালনে সে একা, যদিও জানে এই কাজ দুরূহ, দুরবগাহ, এই পথ মায়াবী চোরাস্রোতে ভরা, এই পথের প্রতি কুটিল বাঁকে জয়ের চেয়ে পরাজয়ই অতি-অবশ্যম্ভাবী; তখনও একজন শিল্পী দুঃসাহসের আগুনে হৃদয় জ্বেলে ঐ সৌন্দর্যের দরজা অনিদ্র আগলে আছে। কবিতা যদি অনাদি হয়, অথবা বাল্মীকিই যদি আদি কবি হন, এই হাজার-হাজার বৎসরের ব্যবধানে কবিতা যে আলোর দ্যুতি বিকীর্ণ করে চলছে তার অমরতার প্রতি, এবং কবির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারি না। কেননা, কবি শিল্পী। কেননা, শিল্পের মায়াবী জগতের মায়াময় আহ্বানে সমগ্র জীবনকে বাজি রাখতে শিল্পী কখনও পশ্চাৎপদ নয়। এইজন্য সকল মানুষ নয়, একমাত্র শিল্পীই অমৃতের পুত্র হবার অধিকারী।

কিন্তু, কবিতা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অলক্ষ্যের দিকে ক্রমধাবমান যদি স্বীকার ক'রে নিই তাহলে প্রশ্ন থাকে যে, বৈরিতা কি তার মৃত্যু ডেকে আনছে? তা হলেও, পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠে কবিতা যদি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পারে তবেও কি কবিতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়? শিল্পের এও একটি ধর্ম যে, পরিণামে সকলের ঊর্ধ্বে উঠে স্বমহিমায় নিজেকে প্রকাশ করা, অর্থাৎ অবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে অসম্ভব কিছুর জয় ঘোষণা করা যদি শিল্পের অনভিপ্রেতও হয়, তবু'ও শিল্প পরিণামে সমস্ত প্রতিবেশকে পরিবর্জন করে স্বমহিমা ঘোষণা করবেই—এইজন্যই শিল্পের এত কদর, শিল্পী তাই শত আঘাত-অভিঘাতে ধ্বস্ত হয়েও শিল্পকে বর্জন করতে পারে না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'ভাষা, ভাব আর ছন্দ, এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গড়ে ওঠে।' কাব্যের ঐ ভাষার জাদুতে শব্দের রসপ্রতিপত্তির অভিধা অনির্বচনীয় রূপ নেয়, ঐ ভাষার পটেই চিত্রিত হয়ে ওঠে রূপ। তাই রূপ নির্মিতিতে কবি প্রত্যেকটি বাঁক, প্রত্যেকটি খাত, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি দৃশ্য-অদৃশ্য কাঁটায় রক্ত ঝরিয়ে লক্ষ্যের দিকে স্বতঃঅভিসারী।

আর, এই শৈল্পিক কারুকৃতিতে যে বাগৈশ্বর্য গড়ে ওঠে তা অনির্বচনীয় এবং অবিশ্লেষ্য, কেননা শিল্পের জন্মের গূঢ় দিকটি আজও মানুষের মনে এক প্রকার রহস্যময়। যে বাক্‌প্রয়োগরীতিতে কবি কতকগুলি চরণ বা

পঙক্তি রচনা করেন, রচনা শেষে শিল্পী নিজেও জানেন না কেমন করে এই মাত্র কতকগুলি অবিস্মরণীয় পদের জন্ম নিল—কারণ মানব মনটিই এবং সেই সঙ্গে সৃজন ক্রিয়াটিও আজও দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়। তবুও আমরা জানি রহস্যমণ্ডিত ঐ বাকসমষ্টির ধ্বনি, আবেগবাহী ভাব ও ছন্দের শোভনতাই কবিতা সৃষ্টি করছে—সেই রহস্যময় বাকসমষ্টির মধ্যেই কবিতার প্রাণ নিহিত, অর্থাৎ ঐ পথে কবিতা ও কবির মন-মেজাজ রূপ চকিত আভাসে উৎসারিত দেখা যাবে। একটি উপমার সাহায্যে এই কথাটি বিশ্লেষণ বা সমর্থন করা যেতে পারে।

পথে হল দেরী, ঝ'রে গেল চেরি,
দিন গেল বৃথা প্রিয়া ;
তবুও তোমার ক্ষমাহাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।
[রবীন্দ্রনাথ]

'পথে হল দেরী', 'ঝরে গেল চেরি', 'দিন গেল বৃথা প্রিয়া' কতকগুলি বাক্‌সমষ্টি। পথে দেরী হওয়ার মধ্যে, চেরি ফুল ঝরার মধ্যে আছে বেদনা ; কিংবা ব্যর্থতাও। এই প্রত্যেকটি বাক্‌সমষ্টি যে খণ্ড রূপ নির্মাণ করেছে, তারা আবার ভিন্ন-ভিন্নধর্মী চিত্ররূপও নির্মাণকারী। পথে দেরী হওয়ায় এবং বৃথা দিনপাতে একটি তীব্র ভাবানুভূতিক বেদনা কর্মশীল, আর চেরি ফুলের পতনে আছে দৃশ্যানুভূতি (এই সঙ্গে বেদনার মিশ্রণ)। 'তোমার ক্ষমাহাসি বহি', 'দেখা দিল আজেলিয়া' দুটি চিত্রই দৃশ্যানুভূতিক ; আবার ফুলের সঙ্গে একটি গন্ধানুভূতিরও সম্পর্ক রয়েছে, ঝরে পড়া চেরি-ফুলের মধ্যে এবং হাসির মধ্যে আছে শব্দানুভূতির সুখৈশ্বর্য (সশব্দ হাসি না-হলেও মৌন হাসিতে আছে মাধুর্যের চিত্র, লাবণ্য, যা চক্ষু ও মন তৃপ্তিকর এবং এই সঙ্গে পেলাম ফুলের বর্ণের নয়নশোভন চিত্র)....অর্থাৎ কাব্যকলা সৃষ্টিতে দেখতে পাই ইন্দ্রিয়-নির্ভর করণ-কৌশল বা অভিজ্ঞতা। আবার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি থেকে আমরা অতীন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার রাজ্যে প্রবেশ করি কখনও কখনও—ইন্দ্রিয়জ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি, দুইই শিল্পী-সত্তার গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিতবাহী। একটি উদাহরণ সহযোগে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। [রবীন্দ্রনাথ]

এখানে 'পরাণ সখা বন্ধু' ইন্দ্রিয়োত্তর কোন পরাণপুরুষের ইঙ্গিতবাহী। আবার,

> আকাশ হতে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
> ঝরছে জগৎ ঝরণাধারার মতো
> আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত।
> [রবীন্দ্রনাথ]

এই পর্যায়ের চিত্ররূপে—আকাশ হতে আকাশ পথের হাজার স্রোতের ঝর্ণাধারায় কবির শরীর মনের ধারা একটি বহমান স্রোত। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর উদাহরণে আমরা দেখি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-নির্ভর কিছু দৃশ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি ইন্দ্রিয়াতীত আবেগে কবি মগ্ন, তৃতীয় পর্যায়ের চিত্ররূপে এসে অন্য এক অভিজ্ঞতা লাভ করি, এখানে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নয়, বরং এক দার্শনিক ভাবনায় বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ উপলব্ধিতে কবি আবেগায়িত। প্রথম পর্যায়ের দৃশ্যানুভূতি, দ্বিতীয় পর্যায়ের অতীন্দ্রিয়ানুভূতি, তৃতীয় পর্যায়ের দার্শনিক ভাবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ—এই ভাবাবলী ও রূপ নির্মাণ কাব্যের অবয়ব গঠনে যে বাক্‌গুচ্ছের অবলম্বন তাকেই বলা হচ্ছে বাক্‌প্রতিমা ; অর্থাৎ বাক্‌প্রতিমার প্রকাশরূপ কাব্যের ইন্দ্রিয়বেদীরূপকেই প্রকাশ করে।

এই বাক্‌প্রতিমান নির্মাণ বা কাব্যে তার অন্বেষণ শুধু আধুনিক কবি বা কবিতার আলোচকরাই প্রত্যক্ষ করেছেন এমন নয়, কবিতা আলোচনার সূত্রপাতেই এর প্রতি সমালোচকরা দৃষ্টি রেখেছেন। ভারতীয় সাহিত্য আলোচনায় বিশেষত সংস্কৃত কাব্যালোচনায় শাস্ত্রকাররা উপমা-রূপক তথা অলঙ্কারের বহুল আলোচনা করেছেন—বস্তুত, কাব্যের শিল্প বিচারে উপমা-রূপকের প্রয়োগ-নৈপুণ্যই অধিক মূল্যবান। হাজার বছর পূর্বের চর্যাপদের পদসমষ্টিও রূপকের মোড়কে আবৃত, বিবিধ অলঙ্কার চর্যাপদের কবিতাবলীকে করেছে আরও নিটোল আরও দ্যুতিময়। আরও দূর অতীতের, ঋগ্‌বেদীয় কৌষীতকি উপনিষৎ-এর একটি উদাহরণের বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি :

> "ব্রহ্মবিদ এসেছেন ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্ম বললেন বুদ্ধিরূপা অপ্সরাদের 'বিজরা নদী পার হয়ে এসেছেন ইনি; আমার যোগ্য সম্মান দিয়ে এঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আনো।' কুঙ্কমচূর্ণ, বসন, ফল, অঞ্জন,

পুষ্পমালা হাতে নিয়ে গেলেন পাঁচশো অপ্সরা। আগন্তুককে করলেন তাঁরা ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত। ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্রহ্মবিদ চললেন ব্রহ্মাভিমুখে।"

[অলঙ্কার চন্দ্রিকা : শ্যামাপদ চক্রবর্তী]

কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'অলঙ্কার' নামে সাহিত্যতত্ত্ব সৃষ্টি হয়নি, তবে পরবর্তী-কালে যাস্ক, পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি-র ব্যাকরণ-গ্রন্থে উপমা-অলঙ্কারের বর্ণনা আছে। শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেন,

"ঋগ্‌বেদ থেকে রামায়ণের ভিতর দিয়ে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পর্যন্ত আমরা অলঙ্কার পেলাম, উপমা এবং তার অঙ্গ 'উপমান' 'উপমিত' 'সামান্য' পেলাম; কিন্তু পেলাম না কাব্যতত্ত্বের অঙ্গীভূত পারিভাষিক অলঙ্কারকে এবং অন্যতম কাব্যালঙ্কাররূপে গৃহীত উপমাকে।"

[অলঙ্কার চন্দ্রিকা : শ্যামাপদ চক্রবর্তী]

পতঞ্জলির সমকালে রচিত হয় ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থ, সেখানে উপমা, দীপক, রূপক—তিনটি পেলাম, আর পেলাম তার শ্রেষ্ঠ অবদান 'রস'। ভরতমুনির পর এলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে আচার্য দণ্ডী। দণ্ডী অলঙ্কারকে বললেন কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক ধর্ম (**attribute**), তাঁর কাব্যাদর্শ আজও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বহুজনবন্দিত। সপ্তম শতাব্দীতে (দণ্ডী না ভামহ, কে কার পূর্ববর্তী এ-বিষয়ে মতান্তর আছে!) আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে আছে : রূপকাদি অলঙ্কার অন্যের দ্বারা বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে; প্রেয়সীর মুখ স্বভাবকান্ত হলেও বিনা অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য ফোটে না। অতঃপর এলেন অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন, রাজশেখর, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ (আরও বহু আলঙ্কারিক)—বিশ্বনাথ কবিরাজ শোনালেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম', অলঙ্কার সম্বন্ধে বিশ্বনাথের মত এই যে, এরা অত্যন্ত শোভন, রসভাবের উপকারী, শব্দার্থের অস্থির ধর্মী, নারীদের শোভাবর্ধক ভূষণের মতন। সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বললেন যে, সেই অর্থই রমণীয়, যা লোকোত্তর অর্থাৎ মাত্র সহৃদয় কবির এবং পাঠকের স্বানুভবসিদ্ধ আনন্দের জনকস্বরূপ (চমৎকৃতিময়) জ্ঞানের বিষয়ীভূত। তাঁর কাব্যসংজ্ঞা : 'রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক : শব্দ : কাব্যম'।

কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার দান থেকেও আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি—কাব্য অনাদি; রস সৃষ্টিই তার অন্তিম উদ্দেশ্য। আবার সেই কাব্যের রস-নিষ্পত্তিতেই সমালোচনার জন্ম।

অন্যদিকে, গ্রীক ও রোমান কাব্যপাঠকও উপমা ও রূপকের সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ করতেন—প্রাচীনকাল থেকেই সেখানে গড়ে উঠেছে কাব্য এবং কাব্য রসপিপাসু শ্রোতা-পাঠক।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রে বাক্‌প্রতিমার (**imagery**) কোন উল্লেখ নেই। তাঁরা (সংস্কৃত এবং গ্রীক-রোমক পণ্ডিতরা) মনে করতেন বাক্‌প্রতিমা অলঙ্কার মাত্র, অলঙ্কারকেই তাঁরা কাব্যের অবয়বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীরূপে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক কাব্যালোচকরা পূর্বসূরীদের সবকিছু মেনে নিয়েও ঐ আলোচনা পদ্ধতিতে তুষ্ট থাকেননি, কারণ তাঁরা জানেন ছন্দ যেমন অলঙ্কার নয় তেমনই নয় বাক্‌প্রতিমাও। কাব্য হচ্ছে ভাব, ভাষা ও ছন্দ। এই ত্রিগুণ সমাগমে রস গড়ে ওঠে, সুর জেগে ওঠে, অনির্বচনীয়তা ধরা দেয়; কিন্তু অলঙ্কার কাব্য হতে পারে না, কেননা মহৎ কাব্য অনেক সময় নিরলঙ্কার, নিরাভরণ ও অনাবৃত হতে পারে। বাক্‌প্রতিমা বা ইমেজ বা ইমেজারি তাই আধুনিক সমালোচকদের কাছে কাব্যদেহের লোভনীয় শোভনীয় আদরণীয় উপাদান বলে চিহ্নিত। এই প্রভেদ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে উনিশ শতকে, কাব্যের মায়াময় রাজ্য, বোদলেয়রের ফরাসী দেশে।

> "পোল ভালেরি লিখেছেন যে একদা চিত্রকর দেগা কবিতা রচনার চেষ্টায় কিছু মুশকিল বোধ করে মালার্মের উপদেশ চাওয়াতে কবিবর বলেছিলেন, **'You don't write poems with ideas my dear Degas, but with words'**—বন্ধু কবিতা লিখবে ভাব দিয়ে নয়, কথা দিয়ে।—ভাষা তো জড় পদার্থ নয়।"
>
> [সাহিত্যালোক : অমলেন্দু বসু]

এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-বিষয়ক ভাবনার কিছু কথা আহরণ করছি—

> "গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অন্বিষ্ট প্রজ্ঞান। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে; গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা, রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে-ছবি আঁকে, গোটা-কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যে এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ মাত্রেরই দুটো দিক আছে; একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের

সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যের শব্দগুলো চিন্তার আধার ; কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে, কাব্যের শব্দ আবেগবাহী। এর থেকে বোঝা যাবে কাব্য কেন অভিজাত সহানুভূতিকে ছেড়ে অন্ত্যজ দরদকে কোল দিয়েছে।"

[স্বগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

শব্দের এই রসপ্রতিপত্তির দিক যে অনির্বচনীয়তা সৃষ্টি করে তার নমুনার জন্য পূর্ববর্তী সেই উদাহরণটি আবার রাখছি—

পথে হল দেরী, ঝ'রে গেল চেরি,
দিন গেল বৃথা প্রিয়া;
তবুও তোমার ক্ষমাহাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

শব্দগুলি এখানে আর শব্দ নেই। তার অন্তঃশীল আবেগ, ধ্বনিবৈচিত্র্য, মাধুর্য এবং ছন্দের শোভন দোলা এই অনির্বচনীয়তা সৃষ্টির সঙ্গে এমনকি অরসিক পাঠককেও মাতাল করে তোলে। শব্দের এই অসীম দ্যোতনা (আর কিছুই নয়) সৃষ্টি করেছে ইন্দ্রিয়বেদী মোহনীয়তা—এই জন্য আধুনিক কাব্য-সমালোচকরা এই বাক্‌প্রতিমা নির্মিতি ও বিশ্লেষণকে এত গুরুত্ব দিয়ে কাব্যের প্রাণ অন্বেষণে তৎপর। এবং বাক্‌প্রতিমার সাহায্যেই কবির শিল্পকারুকলা, মানসভঙ্গি ও ভাবজগতের সন্ধান পাওয়া যাবে; শুধু এই একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ থেকেই কবির সৃষ্টিকর্মের তথা গূঢ় ভাবজগতের সঙ্কেত মিলবে—যদিও আমরা জানি শিল্পীর ভাবজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সৃষ্টি-কৌশল এক প্রকার অবিশ্লেষ্য, অবিভাজ্য; এবং যা অনির্বচনীয়। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে এই আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতিরও আছে চোরাগলি, চোরাবালি ও চোরাস্রোত। যে-শব্দ প্রাত্যহিক ব্যবহারে জীর্ণ ও ধারহীন হয়ে পড়েছে সেই শব্দই অভিধানে আশ্রয় নিয়ে তার আলঙ্কারিক মর্যাদা অর্জন করেছে, কবি সেই শব্দকে অভিধানের ব্যবহারিক অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন এক প্রাণ দান করেন তার সুমিত ও সুশোভন ব্যবহার-নৈপুণ্যে। এইভাবে শব্দগুলি যে বাগৈশ্বর্য সৃষ্টি করেছে তা কাব্যকারুতে মহার্ঘ ও মূল্যবান—এই কথা আধুনিক কাব্যরসিক দুর্মরভাবে বুঝতে পেরেছেন, এইজন্য বলা হয় কাব্যের প্রাণ ইমেজ সৃষ্টিতে। এই ইমেজ প্রয়োগ বা বাক্‌প্রতিমার মধ্যেই আবার যতদূর সম্ভব বিশ্লেষ্য

রীতিতে কাব্য-সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন সম্ভব। কেননা প্রতিটি সার্থক ইমেজ-প্রয়োগে মিলবে শিল্পীর সৃষ্টি-মুহূর্তের মানস-প্রক্রিয়ার উদ্ভাস, প্রতিটি বাক্‌প্রতিমা তাই কল্পনা মুহূর্তকে স্পর্শ করার স্বর্ণবিন্দু।

এই প্রসঙ্গে, বাক্‌প্রতিমা শব্দটির অর্থ কি প্রকাশ করে তা' পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। ইংরেজির ইম্যাজিনেশন শব্দটি বাংলায় কল্পনা, ইমেজ শব্দের অর্থ করা যায় বাক্‌প্রতিমা। আবার বহুদীর্ণ শিল্পী-সত্তাব গূঢ় রহস্য এক জাতীয় বাক্‌প্রতিমার স্বাক্ষর বহন করে না, আবার একই শিল্পী-মানস থেকেও সৃষ্টি হয় ভাব প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম। যেমন, একজন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, এমনকি গান ও চিত্রাঙ্কনে তিনি অবিরত নিজেকে প্রকাশ করেছেন নবনব উদ্ভাসে, নবনব প্রক্রিয়ায় —অথচ সকলই একই ব্যক্তিত্ব থেকে উৎসারিত। এই জন্য বলা হয়ে থাকে আধুনিক শিল্পী পরস্পর দ্বিধা-দ্বন্দ্বদীর্ণ সত্তাসমূহে বিচ্ছিন্ন, অস্থির, অব্যবস্থ, অসহিষ্ণু ও বিকলচিত্ত—তাঁদের বাক্‌প্রতিমাগুলি তাই সেই বিচ্ছিন্নতার সাক্ষ্য বহন করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ও নিবিড়ভাবে। এই ইমেজ বা ইমেজারি (**image or imagery**) তাই যেমন কাব্য-স্বভাবের ও শিল্পীর অতল রহস্যময় সত্তায় স্পর্শ রাখে তেমনি বাংলায় তার শাব্দিক অর্থও অন্বেষণযোগ্য। ইমেজ শব্দের বহুধাব্যাপ্ত অর্থ হচ্ছে— পঞ্চেন্দ্রিয়-নির্ভর অনুভূতি যা দৃশ্যমান শ্রব্যমান ঘ্রাণানুভূতিক স্পর্শানুভূতিময় এবং স্বাদানুভূতিলিপ্ত। তাই পূর্বসূরীরা ইমেজ বলতে চিত্রকল্প না-বুঝে ইমেজ অর্থের বহুভাবনা প্রসারতায় বাক্‌প্রতিমা শব্দটি গ্রহণ করেছেন, ফলে বাক্‌প্রতিমার 'প্রতিম' 'প্রতিমা' 'প্রতিমান' শব্দের মূল লাতিন অর্থের সাদৃশ্য-ভাবনা ও বহুব্যঞ্জনা দীপ্ত হয়ে ওঠে।

অতঃপর বাক্‌প্রতিমা-বিচার পদ্ধতি বা অন্বেষণ সম্পর্কে অবহিতি প্রয়োজন। গদ্যে শব্দের অর্থ যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার হাতিয়ার, পদ্যে শব্দ হচ্ছে রসের আধার। সেই রসনিষ্পত্তিতে শব্দমালা রচিত কবিতা আবার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত। এই বাক্‌প্রতিমা বিচার-পদ্ধতিতেও আছে ভিন্ন ভিন্ন পথ (পূর্বে একটি পদ্ধতি আলোচনা করেছি); বস্তুত, প্রত্যেকটি শৈল্পিক পদ্ধতিই শিল্পান্বেষণে বহুপথগা।

বাক্‌প্রতিমা বিশ্লেষণে একটি সহজতর পন্থা হচ্ছে বাক্‌সমন্বয়ে বা শব্দসমষ্টিতে যে-প্রতিমা পরিস্ফুট হল তার প্রণিধানে পাঠকের মনে কোন্ ইন্দ্রিয়জ শক্তির উদ্বোধন হল (যেহেতু কবিতা ইন্দ্রিয়বেদী)। শব্দের

মরমী অভিঘাতে কাব্যে যে সিদ্ধি আস্‌ল তা আমাদের কাছে কোন ছবিটি দৃশ্যমান করে তুলল, ঝঙ্কার তুলে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ে কি পরিমাণে তৃপ্তি বিস্তার করল, অথবা ঘ্রাণের যে অনুভূতির বিস্তার করেছে তার নাগাল কতটুকু পেলাম, কিংবা স্বাদ পেলাম কিনা অথবা স্পর্শের নিবিড় শিহরণ —অথচ কবির বাক্‌প্রতিমা-বিচারে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি কি আমরা পাই? রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়েই বিষয়টি পরিচ্ছন্ন করা যাক:

সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে, সমুখের পথ দিয়ে
ফিরে দেখা হবে না তো আর
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি—
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।।

[রবীন্দ্রনাথ]

'সমুখের পথ', 'ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালা' চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। সমুখের পথ দিয়ে যাওয়া, ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালা ফেলে দেওয়া, বিদায়ের বাণী ব্যক্ত করার মধ্যে (নীরব বিদায়ের বাণী যদিও) বিষণ্ণ শব্দমালা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে করে বিষাদগ্রস্ত। আবার 'ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকা'র আছে বাসি ফুলের গন্ধানুভূতি। 'সেই হবে স্পর্শ তব'-এর মধ্যে আছে প্রিয়াকে স্পর্শ করার পূর্বস্মৃতি (ম্লান মল্লিকার মালা স্পর্শসূত্রে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত)। এই উদ্ধৃত বাক্‌প্রতিমায় জিহ্বান্দ্রিয়ের স্বাদচিত্র নেই (নেই বলার মধ্যে এই কথাটি নিহিত নয় যে প্রত্যেকটি বাক্‌চিত্র পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর হবে বা হতে হবে)। আবার, জানি বিশ্লেষিত বাক্‌প্রতিমা শব্দসমষ্টির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্ত হয়েছে তবে তা ছায়াচিত্রের মত বা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের মত প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে নয়, ঘটনাটি বা অঘটিত ভাবনাপুঞ্জ ভাষার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বর্ণিতমাত্র, অর্থাৎ বাস্তবিকই কিছু দেখলাম না, শুনলাম না, ঘ্রাণ পেলাম না, স্পর্শ করলাম না—অতএব আমাদের অনুভূতিটি প্রত্যক্ষ নয়, অনুভূতির প্রতিমা মাত্র (যা ভাষার মাধ্যমে পেলাম), এই ইমেজটি তাহলে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলব? "ইমেজটি, বাক্‌প্রতিমাটি কি চিত্ররূপময়, ধ্বনিরূপময়, স্বাদরূপময়, স্পর্শরূপময় অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, ত্বগেন্দ্রিয়ের আওতায় পড়ছে? বাক্‌প্রতিমাগুলিতে আমরা তাদের সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতির শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করতে পারি, এবং এই

শ্রেণী বিশ্লেষণ থেকে জানতে পারি আমাদের লেখকদের সৃজনী-চেতনা কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অধিক অনুরক্ত।" (অমলেন্দু বসু)।

ইউরোপীয় সমালোচনা-পদ্ধতিতে সিনেস্থিসিয়া (Synaesthesia) বলে এক ধরনের বাক্‌প্রতিমার কথা উল্লেখিত আছে, অর্থাৎ এই জাতীয় প্রতিমা এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে অন্য ইন্দ্রিয়জ ধারণায় অনায়াসে গড়িয়ে পড়ে। যেমন কবি বর্ণিত বিষয়টি ঘ্রাণেন্দ্রিয়সাধ্য অথচ তা' প্রকাশ করা হল শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাষায়, অথবা যে-বস্তু দৃশ্যগ্রাহ্য তা আবার স্পর্শানুভূতিতে প্রকাশিত হল, অনুরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতিমা দৃশ্যমাধ্যমী করে তোলা হল --অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়সমন্বয়ী শক্তির সাহায্যে পূর্ণ প্রতিমাটি অঙ্কিত। ইংরেজ কবি শেলি ও স্যুইনবর্ণ, ফরাসী কবি বোদলেয়র ও র‍্যাঁবো, এলিজাবেথ-যুগের ইংরেজ নাট্যকার-কবিগণ এই সিনেসথিসিয়ার উজ্জ্বল অধিকারী। "'কবি-কল্পনায় যে-দৃশ্য আমি দেখছি সে তো স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখছি না, অথবা যে ধ্বনি শুনছি তাও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, আমার দেখা ও শোনা দুইই কল্পনার দেখা ও শোনা—"(অমলেন্দু বসু)। এইভাবে এক ইন্দ্রিয়জ অন্য এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হল, অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা অন্য এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় গড়িয়ে পড়ে প্রতিমারূপ ধারণা করল। যেমন,

যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;
ক্যাম্পে বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে ভেবে।
কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবার জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

[জীবনানন্দ দাশ]

প্রথম পঙক্তিতে শব্দরূপময় একটি চিত্র, দ্বিতীয় পঙক্তিতে এই মূল শব্দরূপময় চিত্রটি স্বাদরূপময় হয়ে গেল, চতুর্থ পঙক্তিতে তা হল পূর্বানুবৃত্তিতে চিত্রল, পঙক্তিগুলিতে ভাবের আধারে (অনুভূতির উচ্চগ্রামে) চিত্ররূপময় চিত্রগুলি ঘুরে ফিরে আসল, (এখানে পাঠকরা লক্ষ্য করবেন জীবনানন্দের প্রতিমা

ভাব ও মননের আধারে যে চিত্র অঙ্কন করে তা দৃশ্যময় বা অনুভূতিময় অথবা উভয়ই যুগপৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে)। কিন্তু বাক্‌চিত্রটির মূলে আছে শব্দরূপময়তা। অতঃপর ঐ মুখ্য চিন্তামণ্ডল (গুলীর মুখে হরিণের মৃত্যু) ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়েছে অনুভূতির চিত্ররূপময় জটিলতায়। বস্তুত, জীবনানন্দের বাক্‌প্রতিমাগুলি বিশ্লেষণে পৌঁছুতে গিয়ে এই সরল অথচ জটিলতর বাক্‌প্রতিমাগুলির অভিঘাতে সজ্জিত হতে হয়—যে হরিণ দোনলা বন্দুকের আঘাতে নিহত, পরবর্তী পঙক্তিগুলিতে সেই ভাবানুভূতি চিত্রল হয়ে আবার শেষ পঙক্তিতে হরিণের মত মৃত্যুতেই ডুবে যাচ্ছে সবকিছু। কিংবা আরও একটি উদ্ধৃতি আহরণ করা যায় :

নিবে গেল দীপাবলী; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্র কন্ঠে মরমী আহ্বান, জাগিল বিনম্র সুরে
কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ।

[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

'নিবে গেল দীপাবলী' একটি চিত্র। অতঃপর শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়ে স্তব্ধতা নেমে এল। ধীরে ধীরে বাদ্যসমবায় হতে নিঃসঙ্গ বাঁশরী বেজে উঠল, কম্পিত-উত্তর বেহালার মৃদু রণন জাগল, অর্থাৎ কবির দীপ নেভার আয়োজন সম্পূর্ণ হল পরবর্তী শব্দচিত্রের বহুল বিস্তারে—এইভাবে একটি চিত্র গড়িয়ে মিলে-মিশে একাকার হল পরবর্তী প্রতিমাবলীর মধ্যে। আবার বলতে গেলে ধ্বনিরূপ প্রবল কাব্যকারু একটি মাত্র দৃশ্যময় চিত্রকে প্লাবিত করে দিয়েছে, ভাসিয়ে দিয়েছে।

অন্য এক পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমা আহরণ করি এবার। ইংরেজিতে এই প্রতিমার নাম 'পার্সনিফিকেশন' এবং 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি', প্রাণবান এমনকি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যেও ব্যক্তিত্ব আরোপ করে কবি সৃষ্টির আনন্দে অবগাহন করেন। এই বাক্‌প্রতিমার নামকরণ হয়েছে মানবিক-চেতনা আরোপিত বাক্‌প্রতিমা, এই 'আরোপ' চিত্রায়িত প্রতিমাতেই বেশী মিলবে।

ক. এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি, [মধুসূদন]

খ. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে, (অবোধ আমি।) অবহেলা করি, [মধুসূদন]

গ. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালস সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা
[রবীন্দ্রনাথ]

ইংরেজ ও জর্মন লেখক-আলোচকরা **image cluster** নামক ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত একরকম বাক্‌প্রতিমার কথা উল্লেখ করেছেন। এর নাম প্রতিমা-পুঞ্জ। রবীন্দ্রনাথের জনতা-চিন্তা একটি বিলম্বিত ভাবনায় নানা কবিতায় নানা উপমানে বিস্তৃতি লাভ করেছে, আবার এই জনতা-ভাবনায় কাজ করেছে বিপরীত সংশ্লেষ অর্থাৎ নাটকীয় (**ambivalence**)। জনতা কখনও শান্ত সমাহিত, কখনও যুক্তি-পাগল, জনতা কখনও নির্বোধ, কখনও জনতা থেকে কবি দূরে সরে দাঁড়িয়ে নিভৃতে সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ করেছেন, কখনও জনতার মধ্যে আত্মলীন। এই জনতা-চিন্তা সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন কবির, হুমায়ূন আজাদ-এর কবিতায় নানা বর্ণ-বৈভবে সমুপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি বিখ্যাত জনতা পঙক্তিতে দেখি জনতা সংশ্লেষ। জনতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন কবি, ভিড়ের হৃদয় তাঁর নয়।

সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি। [সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনতার ভ্রাতৃশক্তি নতুন বাণী প্রচার করছে :

ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে। [সু-মুখোপাধ্যায়]

অথবা, জনতা চায় নির্ভীক নির্ভুল এক জননেতা—।

নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন ;
[সু-মুখোপাধ্যায়]

আর, আলাউদ্দিন আল আজাদের স্তব্ধ জনতা (স্বৈরাচারী শাসক স্মৃতির মিনার ভেঙেছে বলে) আশার বাণী শুনে পুনরায় দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করবে। আশার ও জাগরণের বাণীতে দীপ্ত প্রাক্‌প্রতিমা :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক।
একটি মিনার গড়েছি আমরা

চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, ভাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন,
যুগে যুগে সেই শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়,
তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে
সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।।

[আ. আ. আজাদ]

আবদুল গনি হাজারীর একটি জনতা চিন্তন প্রতিমা:

অজস্র লালে রঙ্ করা ঘাটের কাঠরায়
জনতার সুচিন্তিত স্তব্ধতা
অবিচল কিউ যৌথ প্রতিজ্ঞার পোষ্টার

[আ. গ. হাজারী]

নির্বোধ জনতার প্রতি নির্মলেন্দু গুণের উক্তি—

আপনারা কিছুই বোঝেন না, শুধু বিকেল
তিনটে এলেই
পল্টনের মাঠে জমায়েত, হাততালি, জিন্দাবাদ
রক্ত চাই ধ্বনি দিয়ে
একুশের জঘন্য সংকলন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কিনে নেন।

[নির্মলেন্দু গুণ]

সাহিত্য-জাতিগত প্রতিমা: এই জাতীয় প্রতিমা দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে পৃথিবীর যে-কোন কবি আপন স্বভাবের অধিকারে কাব্যে ব্যবহার করেন। এই অর্থে গ্রীক, ভারতীয়, এসিরীয়, মিশরীয় ইত্যাদি মিথের কাহিনী কিংবা ধর্মের চিরন্তন চিত্রাবলী থেকেও প্রতিমা নির্মিতি দেশকাল অতিক্রম করে যুগে-যুগে আহরিত হয়েছে। এই প্রাচীন উপকথা-

পুরাণ ইত্যাদি থেকে গৃহীত প্রতিমাকে প্রাচীনচারিতার নির্দশনও বলতে পারি; কিংবা ঐতিহ্য-প্রীতি।

ক. সাধ ছিলো বেঁচে থেকে দেখে যাবো জিরাফের গ্রীবা ॥

[রফিক আজাদ]

খ. তুষার ঝড় হয়ে গেছে; বুঝি ভূমিকম্পে মরে গেছে।

[মহাদেব সাহা]

গ. চেহারায় চেরীর ঝোপের আর [আবুল হাসান]

ঘ. তবুও সাধের আলবাট্রস রক্ত স্বেদে মুখ লুকায়।

[আবুল হাসান]

ঙ. বলুন ঈশ্বর
আপনিও রক্তাক্ত তবে? আপনারো হৃদয়
একটি উপমার জন্যে অনুপম ক্রুশবিদ্ধ হয়?

[আবু হেনা মোস্তফা কামাল]

'জিরাফের গ্রীবা', 'তুষার ঝড়', 'চেরীর ঝোপ', 'আলবাট্রাস', 'ক্রুশবিদ্ধ' বাংলা সাহিত্যে অতিথি প্রতিমা; কিন্তু আধুনিক কবিতায় বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার অবলীলাক্রমে চিত্রিত ও কলিত—উপরি-উদ্ধৃত বিদেশী প্রতিমাবলী বিশ্বসাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে বাংলা কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট; এইজন্য, এইগুলি সাহিত্য জাতিগত প্রতিমা, দেশকালের সীমা-সরহদ্দ অতিক্রম করে এমন বহু প্রতিমা বাংলা কাব্যে গৃহীত। এই সঙ্গে প্রাচীনচারী প্রতিমার নিদর্শন:

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)

[শহীদ কাদরী]

'ইস্রাফিল' আর 'ওঁ' মুসলিম এবং হিন্দু মিথের মিলিত আবহ। হয়তো কবি 'ওঁ' শব্দটি সাধারণ শব্দ অর্থেই বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু ওঙ্কার হচ্ছে আদি শব্দ, জগৎসৃষ্টি এই শব্দ থেকেই উৎপন্ন। এই সঙ্গে যীশু-খৃষ্টের জন্মস্থান বেথেলহাম আবদুল মান্নান সৈয়দের কাছে ধরা দেয়:

এই রাত্রিরা বেথেলহামকে ব্রথেলে পরিণত করে, করুণ কবাটের
মতো ঝোলানো বাড়ির দেয়াল থেকে লুটিয়ে থাকে যেন
ধর্ম কিংবা বিরুদ্ধ পদ্ধতি হাওয়ার—রূপালী চাবির অভাবে।

[আবদুল মান্নান সৈয়দ]

উদায়ী, ছন্দক আসে ত্রিপিটক থেকে; জন্ম-জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে সিদ্ধার্থ গৌতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন নির্বাণ-ফল লাভের জন্য, তারই একটি উদ্ধৃতি:

এই স্বাভাবিক হ'লো, পথে নেমে আসা
উদায়ী, ছন্দক, শোনো, বিদায় বিদায়
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ভীত আমি নেব প্রব্রজ্যা এবার

[আলতাফ হোসেন]

অন্য এক শ্রেণীর বাকপ্রতিমার নাম: প্রতিমাশৃঙ্খল বা **Chain imagery,** এই পর্যায়ে, এক একটি প্রতিমা বিশেষ ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রতিমায় নিয়ত ধাবিত হয়ে অন্য এক ইন্দ্রিয়-সংবেদনা জাগায়; এমনকি একই সঙ্গে বহু প্রতিমার সমন্বয়-সাধন দেখতে পাই। এই সমন্বয়ে দেখা যাবে কবি একটিমাত্র উপমায় স্থির না থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ গড়িয়ে উপমার ব্যবহার করছেন, এবং কবির গতিচঞ্চল কল্পনা ও আবেগ চিত্রে বর্ণে গন্ধে স্বাদে স্পর্শে, (বৈভবে) নিয়ত প্রবহমান—একটি ভাবনা পরিশেষে পূর্ণরূপ গ্রহণ করে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি বাকপ্রতিমা নির্মাণ করে আবেগায়িত হয়ে রইল। কবি একটি বিন্দুর পশ্চাতে বিন্যাস করছেন, এ-যেন সমুদ্রের সেই আদি একটি ঢেউ, অতঃপর ঐ একটি ঢেউয়ের পশ্চাতে অবিশ্রাম ঢেউয়ের সংঘাতমালা অথবা এ-যেন সেনাপতির নির্দেশে সৈন্যবাহিনীর অবিরাম যুদ্ধযাত্রা। শামসুর রাহমানের এমন একটি উজ্জ্বল কারুকৃতির দৃষ্টান্ত:

ঐ ভীমরতিভরা পিতামহ ঘড়ির কাঁটায়
বার্ধক্য-ঠেকানো ছড়ি, পানের বাটায়
গোটানো আস্তিনে দুমড়ানো পাৎলুনে
কাগজের নৌকো আর রঙিন বেলুনে
দুঃখ তার লেখে নাম।

কখনো না-দেখা নীল দূর আকাশের
মিহি বাতাসের
সুন্দর পাখির মতো আমার আশায়

হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়
দুঃখ তার লেখে নাম।

[শামসুর রাহমান]

এখানে দুঃখ হচ্ছে উপমেয়। 'দুঃখ' কবিতার এই শেষ দশটি পংক্তিতে এগারোটি বিভিন্ন (অর্থাৎ শ্রব্যমান দৃশ্যমান গতিমান স্পর্শমান-ভাব সমৃদ্ধ) উপমান বিধৃত। দুঃখ চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছে আর সেই উপমান (এবং বাকপ্রতিমা) কয়টি হচ্ছে : 'ভীমরতিভরা পিতামহ ঘড়ির কাঁটায়', 'বার্ধক্য-ঠেকানো ছবি', 'পানের বাটায়', 'গোটানো আস্তিনে', 'দুমড়ানো পাৎলুনে', 'কাগজের নৌকো', 'রঙিন বেলুনে', 'না-দেখা নীল দূর আকাশের' 'মিহি বাতাসের', 'সুন্দর পাখির মতো আমার আশায়' (আবার আশার উপমান সুন্দর পাখির মতো), হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়'। অর্থাৎ কবি একটি মাত্র উপমার সাহায্যে লক্ষ্যে পেঁছার অভিসারী নন, তিনি উচচকিত করে তোলেন তাঁর বেগচঞ্চল পাখনাকে—এইভাবে কবি অনুভূতি ও ভাবনাকে ভাষায় রূপায়িত করেছেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি :

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে ধাবমান খাকি
জিপের পেছনে মন্ত্রীর কালো গাড়ি,
কাঠগড়া, গরাদের সারি সারি খোপ
কাতারে কাতারে রাজবন্দী;
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় মিছিল থেকে না-ফেরা
কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ........

[শহীদ কাদরী]

ধাবমান খাকি জিপ, মন্ত্রীর কালো গাড়ি, কাঠগড়া, গরাদের সারি সারি খোপ, কাতারে কাতারে রাজবন্দী, মিছিল এবং মিছিল থেকে না ফেরা কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ—সাতটি বাকপ্রতিমা ছয়টি ছত্রে দৃঢ়পিনদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের অশুভ মূর্তিকে চিত্রল করেছে। এখানে চারটি শব্দমান ও গতিমান চিত্র, দু'টি স্থির চিত্র (চক্ষুগ্রাহ্য : কাঠগড়া এবং গরাদের সারি সারি খোপ) একটি পরিপূর্ণ বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছে। এই প্রতিমাপুঞ্জ বস্তুত রাষ্ট্রকে বর্ণময় রূপময় করে তোলার জন্যই—বস্তুত বহুধা বিস্তৃত উপমান-গুলি একটি উপমেয়কে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে প্রতিষ্ঠিত করতেই এর বহুপথে গমন। এই সূত্রে শামসুর রাহমানের 'দুঃখ' কবিতা এবং শহীদ কাদরীর 'রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট' কবিতা দটি সম্পূর্ণ পাঠ করতে হবে,

কারণ, দু'টি কবিতায় দুঃখ এবং রাষ্ট্র এই দুটি উপমেয়কে সূচীমুখ করে তুলতে দুই কবি অসংখ্য বৈভবমণ্ডিত উপমান আহরণ করেছেন।

নিহিত বাক্‌প্রতিমা, নিয়তাবৃত প্রতিমা বা **Submerged imagery**— আবহমান কালের যাবতীয় ভাষায় এই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমার সাক্ষাৎ মিলবে। আলোচনা করলে দেখা যায় শক্তিশালী কবির কাব্য-কৃতিতেও এই নিহিত বাক্‌প্রতিমার দুর্বল ব্যবহার লক্ষণীয় হবে, কিন্তু এই প্রতিমাবলী কোন কবির নিজস্ব সম্পদ নয়, কবি তাঁর কাব্যিক ঐতিহ্য সংগ্রহ করেন পূর্ববর্তী খ্যাত-অখ্যাত সকল কবি থেকেই—ভাষার ভাণ্ডার থেকে। শামসুর রাহ-মানের একটি উপমা উদ্ধৃত করছি :

> সুখের নিদ্রায় কিবা জাগরণে, স্বপ্নের বাগানে,
> অধরে অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যদিনে
> আমার নৈঃশব্দ্য আর মুখর আলাপে
> স্বাস্থ্যের কৌলীন্যে ক্রূর যন্ত্রণার অসুস্থ প্রলাপে
> বিশ্বস্ত মাধুর্যে রুক্ষতার সুতীক্ষ্ন সংগীনে
> দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়
> আসক্তির কানায় কানায়
> বৈরাগ্যের গৈরিক কৌপীনে....
>
> [শামসুর রাহমান]

এই খণ্ড-খণ্ড বাক্‌চিত্রগুলি কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত বলা যায় না। যেমন স্বপ্নের বাগানে, স্বাস্থ্যের কৌলিন্যে, আসক্তির কানায় কানায়, বৈরাগ্যের গৈরিক কৌপীনে ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্যে নতুনত্ব নেই কিন্তু কবির মনের পুঞ্জীকৃত ভাবনার বিস্তার আছে। অধরের অধীর চুম্বনে, সান্নিধ্যের মধ্যদিনে, স্বাস্থ্যের কৌলীন্যে, ক্রূর যন্ত্রণার অসুস্থ প্রলাপে, বিশ্বস্ত মাধুর্যে আর রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সংগীনে—এর মাধ্যমে কবির চিন্তার রাজ্যে আমরা পেঁছিতে পারি, অন্তরতম সান্নিধ্যে পেঁাছে এক অন্তহীন দুঃখের সমুদ্রে মজ্জিত মানুষের আর্ত হাহাকার শুনতে পাই। যদিও বৌদ্ধ দর্শনের সারাৎসার দুঃখবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উক্ত পঙক্তিগুলি— সামাজিক মানুষের বেদনা তথা কবির নিজস্ব যন্ত্রণার সর্বগ্রাসী রূপটি প্রত্যক্ষ হয়। দুঃখবোধ অবচেতন মনের সম্পর্কের ইঙ্গিত করে না কিন্তু

কবির মনের পরিচয় এখানে মেলে, কবিকে পাওয়া যায়। রফিক আজাদের একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি সংকলন করছি :

রাক্ষুসে এই রাত্রির গভীর গহ্বরে আমার উজ্জ্বল অধঃপতন থাবা
মেলে প্রতীক্ষায় আছে, আমার আত্মা যার পরম প্রিয় রুচি।
[ রফিক আজাদ ]

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই অবিস্মরণীয় দুটি চরণ :

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী।।
[ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ]

মৃত্যু আর যন্ত্রণা সম্পর্কিত প্রতিমা নতুন কোন ইঙ্গিত বহন করে না, সেই চিরায়ত ধারণাই এখানে কার্যকরী, কিন্তু বর্ণনার পরিপাট্যে ও ছন্দের শোভনতায় এই নিয়তাবৃত প্রতিমাও আশ্চর্য দ্যুতি বিকীর্ণ করছে।

ইংরেজি সাহিত্যে যাকে **Sublime** বলে, সেই ধরনের বাক্‌প্রতিমাকে বলা হয় দীর্ঘতর ও বিস্তৃততর বাক্‌প্রতিমা। এই প্রতিমাবলী মহৎ কবির কাব্যে, মহাকাব্যে পাওয়া যাবে। দীর্ঘ কাব্যে দেখা যাবে একাধিক গড়ানো প্রতিমা অবশেষে বিলম্বিত লয়ে, দীর্ঘ জটিল বিস্তৃত ব্যাপক সম্পৃক্ত গভীর উদাত্ত ভাবময় সংবেদনশীল সমৃদ্ধ প্রতিমা হয়ে সামুদ্রিক ধ্বনি-গাম্ভীর্যে এক মণিদীপ্ত দেশে পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী', 'বৈশাখ', 'শিশুতীর্থ', 'বসুন্ধরা'-য় এই ধরনের বাক্‌প্রতিমার সন্ধান মিলবে। সূক্ষ্ম সুনিপুণ রুক্ষ তীব্র অভিঘাতসমৃদ্ধ এইসব প্রতিমার নিবিড় সংযোজন আছে 'বৈশাখ' কবিতায়। এমন বর্ণবহুল ও চিত্রল প্রতিমার সাক্ষাৎ 'বর্ষশেষ', 'সমুদ্রের প্রতি', 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়ও পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ থেকেই উদ্ধৃতি আহরণ করছি :

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?
ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন ছিদ্র হতে ছুটে আসে।

কী ভীষণ অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর॥

[ রবীন্দ্রনাথ ]

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের উত্তরসুরী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর কোন কবির মধ্যে এমন ধ্বনিবহুল ব্যঞ্জনাময় চিত্রল বর্ণিল সঙ্গীতময় অভিঘাতপূর্ণ উদাত্ত বাক্প্রতিমা দুর্নিরীক্ষ্য।

দুইটি মহাযুদ্ধের সূত্রে বিকারের বিভীষিকা পৃথিবীকে গ্রাস করতে ছুটে আসতে থাকে, দুঃস্বপ্ন বাসা বেঁধেছে মানুষের মনে, অমাঙ্গলিক ক্রুর চক্র মানবিক শূন্যবোধকে নিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে, লালসায় অন্ধ হয়ে উঠেছে ভোগী মানুষ—অমঙ্গল-বিভীষিকার এই বাক্প্রতিমার কথা ধরা যাক্। কেননা, সভ্যতার সংকটে কবিদের স্পর্শকাতর হৃদয় সর্বাগ্রে দলিত-মথিত। শিল্পীরা সৌন্দর্যের প্রহরায় অনিদ্র থেকেও যেন আর রক্ষা করতে অপারগ তার লাবণ্যময় অঙ্গ—এমনকি শিল্পী নিজেও অবচেতন মনের বিভীষিকার শিকার। এই বোধ থেকে, অমঙ্গল বোধের প্রশ্নে সাম্প্রতিক কবিরা অভিযুক্ত—তারা প্রিয়ার অতুল অঙ্গের লাবণ্যে দেখতে পায় রক্তক্লেদ পুঁজ। শতাব্দীর অভিশাপ বহন করে সভ্যতার সংকটে চিরকালের মূল্যবোধ যখন ধ্বস্ত তখন কবির মনে জাগে ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বেদনা, সন্দেহ—প্রেম সৌন্দর্য স্বপ্ন বিনষ্ট, নেমে আসে অদ্ভুত আঁধার। এমন একটি উদাহরণ :

চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই। [ জীবনানন্দ দাশ ]

উদ্ধৃত প্রতিমায় পৃথিবীর খঞ্জ মানুষের, মন্বন্তর ও যুদ্ধ ডেকে আনা মানুষের অন্তহীন লালসায় মাতাল মানুষের, উত্তেজনালুব্ধ মানুষের, অবৈধ সঙ্গমে

লিপ্ত মানুষের, অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া মানুষের—এইসব নষ্টীকৃত মানুষের চিত্র এঁকেছেন কবি। এই চিত্রগুলি বিভীষিকার জিঘাংসার যৌন অত্যাচারের। এই প্রসঙ্গে বোদলেয়রের 'সুন্দর জাহাজ' কবিতার একটি আশ্চর্য স্তবক আহরণ করছি—

মহান জঙঘায় আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমাঘন এক পাঁচনে।

[বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ]

একটি নিটোল বাক্‌প্রতিমায় আটটি বাক্‌চিত্র ফুটে উঠেছে। মহান জংঘা, চলাকালীন পদযুগলের আন্দোলন, আঘাতপ্রাপ্ত আচ্ছাদনের শিহরণ, বক্ষে জাগা যাতনা (দর্শক-পাঠকের), অন্ধকার যৌন বাসনার আবেদন, দু'জন ডাকিনী (ডাইনীর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মায়াময় আহ্বান যুগপৎ স্মরণে আসে), একটি গভীর খল, কালিমাঘন পাঁচন প্রস্তুত করা ডাইনীদের : (ডাইনীদের রূপকে দুটি ঊরুর কথাই বলা হচ্ছে)—"অথচ উপমাটির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে তা কবির এই ধারণা যে যৌন কামনা যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয়, মদির ও মারাত্মক"—(বুদ্ধদেব বসু)। এই বাক্‌প্রতিমা পাঠে ডাইনীদের যৌবনরস প্রস্তুতির কাহিনী স্মরণে আসে; আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় আলোড়িত হয়, যুগপৎ গতিমান চিত্রও উদ্ভাসিত। বোদলেয়রের "বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ, কামোন্মাদ ও কামদ্রোহ, ইন্দ্রিয়বিলাস ও 'শয়তান পন্থা', দরিদ্র ও পতিতের জীবন, মৃত্যু ও দূরপ্রয়াণ—এইসব উত্তরাধিকার সূত্রে" (বুদ্ধদেব বসু) আমাদের কবিরা পেয়েছেন। আধুনিক কবিরা বোদলেয়রীয় চলোর্মী বেগে বিনষ্টির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিমাকে সিংহাসনে বসাতে দ্বিধা করেন না, এই উপলব্ধিও বস্তুত বোদলেয়র পেয়েছেন পূর্বসূরী উগো, গোতিয়ে, স্যাঁৎ-ব্যভের কাছে।

বস্তুধর্মী (স্থূল অথবা প্রমত্ত বেগবান) বাক্‌প্রতিমা থেকে বস্তুপুঞ্জ উচ্চালিত হয়েছে পরাবস্তুর পানে। আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার একটি বৃহত্তর অংশ এই পরাবস্তুর প্রতি প্রতিনিয়ত ধাবিত। প্রথমে বস্তুধর্মী বাক্‌প্রতিমার কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' কবিতায় দেখি বস্তুময়তার অভিঘাতে চিত্রিত হয়ে উঠেছে বৈশাখের ভয়াল ভীষণ রুদ্র-

মূর্তি, নটরাজ মূর্তির সম্মুখে আমরা ভয়ার্ত কম্পিত শিহরিত। বিশ্লেষণ না করলেও সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন এই উদ্ধৃতি :

দীপ্ত চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী॥

[ রবীন্দ্রনাথ ]

বস্তুময়তা ধীরে ধীরে উচচালিত হয় পরাবস্তুর পানে। হুমায়ূন আজাদ থেকে উদাহরণ আহরণ করছি :

আজ রাত্রে চিলেকোঠা থেকে নদী বয়ে যাবে
স্নানার্থীরা দলে দলে জমা হবে
ছাদে ছাদে ছাদে
হ্রদে রাজপথে কোনো লোক থাকবে না, কেউ যাবে না বাথরুমে
রাস্তায় কলের পারে পুকুরে নদীতে
সব স্নানার্থীরা জড়ো হবে ছাদে
আজ রাত্রে চিলেকোঠা থেকে নদী বয়ে যাবে

[হুমায়ূন আজাদ]

রাত্রি, চিলেকোঠা, নদী, দলে দলে স্নানার্থীর জমা হওয়া, ছাদ, হ্রদ, রাজপথ, বাথরুম, রাস্তায় কলের পাড়, পুকুর ইত্যাদি সবকিছু লৌকিক। কিন্তু চিলেকোঠা থেকে যখন নদী বয়ে যায়—কবির এক বিশেষ মনোভঙ্গির অলৌকিক রাজপাট খুলে বসে, নদী হয়ে ওঠে চিলেকোঠা থেকে প্রবহমান। একখানে নগরের শতবেষ্টনে আবদ্ধ কবি-চিত্ত নদীর মতো বহমান —সমুদ্রের মহাসঙ্গমে। এই নদী প্রতিমার আবেগময় পথে বহু কবি বাক্‌সিদ্ধির তুঙ্গে নিয়ে চলেছেন ভাবনাকে, কবি হয়ে ওঠেন সমুদ্রাভিসারী গতিমান।

কবির সচেতন-অবচেতন-অচেতন মনে ছত্রে-ছত্রে প্রতিমা নির্মিতি অব্যাহত বেগে চলে। বস্তুত সার্থক আধুনিক কবি, অন্তরঙ্গ নিষ্ঠায় বাগৈশ্বর্য নির্মাণ করেন, কখনও তিনি সিদ্ধির অমর লোকে পৌঁছেন, কখনও পথ হারিয়ে পথের ধারে স্তূপীকৃত ও ব্যর্থ, কখনও সংকটের অভিঘাতে পরিণামহীন ভাসমান—কিন্তু কবির চলা বিরতিবিহীন, অন্তত

অবিরাম। আর, সাম্প্রতিক কবিতার বাগৈশ্বর্যে মননের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবনাপুঞ্জ যখন একাকার হয়ে যায় তখন সে-সব বাক্‌প্রতিমা প্রায় অবিশ্লেষ্য হয়ে ওঠে আবার কখনও একেবারে নিরাভরণ বিরল স্বচ্ছ সংক্ষিপ্ত একক প্রতিমাবলী পাঠককে অভিভূত ও নির্বাক করে রাখে। বাহুল্যবর্জিত নিরলঙ্কার এই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনায় অজস্র। ইংরেজিতে যার নাম **Poetry of statement**—বিরল ভাষায় বাক্যকারুতে শুধু তথ্যের উল্লেখ করে ঘটনা বা বস্তুকে বর্ণনা করে যাচ্ছেন কবি, অভিজ্ঞতার তুঙ্গে পৌঁছে কবি তাঁর তুরঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন লক্ষ্যের পানে, সিন্ধুপারের রাজকন্যার কাছে অভিসারগামী স্বপ্নের শুভ্র অশ্ব এ নয়, কিংবা নয় দিগ্‌বিজয়ী সেনাপতির বর্ণবিচিত্রশোভন তুরঙ্গম। যেমন—

আমি বন্দী নিজ ঘরে। শুধু
নিজের নিঃশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠায় ব'সে আছি
সেই কবে থেকে। আমি, মানে
একজন ভয়ার্ত পুরুষ,
সে, অর্থাৎ সন্ত্রস্ত মহিলা,
ওরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক-বালিকা—
আমরা ক'জন
কবুরে স্তব্ধতা নিয়ে বসে আছি।

এখানে, যুদ্ধচলাকালীন সময়ে অত্যাচারী সামরিক বাহিনীর ভয়ে ত্রস্ত মৃত্যুভীত কবি ও কবির স্ত্রী-পুত্র-কলত্র সঙ্গে ভয়ার্ত সময় ক্ষেপণের বর্ণনা। একটি সম্পূর্ণ কবিতার অংশ হলেও একটি পূর্ণ চিত্র এখানে পরিচ্ছন্ন ও নিটোল। নিজের নিঃশ্বাসপতনের শব্দ শোনা যায় এমন স্তব্ধ গৃহ, অতি মৌন বালক-বালিকা, কবুরে স্তব্ধতায় বসে থাকা—মাত্র এই তিনটি সাধারণ প্রতিমা ছাড়া গড়িয়ে পড়া কোন প্রতিমা নেই। নিজের নিঃশ্বাস শোনা যায় এমন 'স্তব্ধতা', বালক-বালিকারা 'অতি মৌন', 'কবুরে স্তব্ধতা'—তিনটি মাত্র অতি সহজ বিশেষণ, আর কোন কারুকলা নেই। কবি কাব্যচর্চার এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে এমন নির্মোহ হয়ে যান—কৈশোর-যৌবনের কাব্যকৃতির সঙ্গে এর ব্যবধান দুস্তর।

বাক্‌প্রতিমা আলোচনায় মাত্র কয়েকটি পদ্ধতির আলোচনা করা গেল, বা মাত্র কয়েকটি পদ্ধতির আভাস দেওয়া গেল—পূর্বে স্বীকার করেছি একাজ দুরূহ, জটিল ও চোরাস্রোতে ভরা, কারণ প্রচলিত পদ্ধতির অতীত এমন কিছু কবিতা মহৎ কবির হাতে সৃজিত হতে পারে যার জন্য নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এমন নিরাভরণ ও প্রজ্ঞায় অন্তর্লীন আবেগে কবিতা রচিত হয়েছে যা সমালোচনার পরিধির অতীত। এইজন্য বলা হয়, সাহিত্য সম্পর্কে কখনও শেষ কথা বলা যায় না. এমনকি সংজ্ঞাও বেঁধে দেয়া যায় না—সৃষ্টির রহস্য দুর্জ্ঞেয় ও জটিল।

যেমন :

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

[ রবীন্দ্রনাথ ]

অথবা :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর॥

[রবীন্দ্রনাথ]

এইভাবে বাগবৈভব জীবনদর্শন ও বিরল বাক্‌প্রতিমা কবিতায় যখন বিমূর্ত হয়ে ওঠে, পাঠক সমালোচক তখন শুধু সেদিকে লক্ষ্য করতে পারেন মাত্র,

সৃজনশক্তির দুরূহ স্তরের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে পারেন মাত্র, অথবা দূর থেকে রস উপভোগ করতে পারেন শুধু—সমালোচনার সব পদ্ধতি এখানে হার-মানা-হার গলায় ধারণ করে শুধু। অসচরাচর মহৎ কবিদের হাতে জীবনের কোন এক পর্যায়ে এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হয়, হয়ত কেহ-কেহ কবিতায় তত্ত্বের প্রকাশ বিরোধী-স্বার্থ প্রকাশ করছে বলবেন; জানি, কিন্তু সাহিত্য-সংস্কার ছক কাটা অপ্রশস্ত পথ মহৎ প্রতিভার জন্য নয়, কারণ তিনি নিজেই মত ও পথের সৃজন-শক্তি—তাই আলোচনা পদ্ধতি কোন-কোন সময় প্রাচীন হয়ে যায়, এবং নব-নব রীতির প্রবর্তনা তখন হয় অপরিহার্য।

## প্রথম অধ্যায়

কবি হিসেবে আহসান হাবীব বাংলা কবিতার ধারায় একটি নিজস্ব আসন নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'রাত্রিশেষ', 'ছায়া হরিণ', 'সারা দুপুর', 'আশায় বসতি' গ্রন্থ-চতুষ্টয় আমাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায় আকৃষ্ট করে। শহর এবং গ্রাম—এই দুয়ের সংঘাত তাঁর কবিতার প্রতিমা নির্মাণের ভূষণ—তাঁর চিত্ররূপ প্রতিমাবলী চক্ষু বিনোদনকারী, শব্দমান প্রতিমারা শ্রবণ সুভগ, তেমনি আমোদিত ও গন্ধবাহী প্রতিমারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, আবার বর্ণিল ও অন্তর্মুখী কিছু প্রতিমা আমাদের ভাবনায় চালিত করে—অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় অত্যন্ত মৃদু নাদে চিত্রগুলো ভেসে ওঠে। 'ছায়া হরিণ'-এর পাশাপাশি 'সারা দুপুর' এবং তার পাশে 'আশায় বসতি' গ্রন্থ রাখলে পার্থক্য যদিও ধরা যাবে—একটি অন্তঃশীল এমনকি বাহ্যিক রূপাবয়বেও মিলটুকু রক্ষিত এবং লক্ষিত থাকে, কেননা প্রতি ঘাটে-ঘাটে পথ-পরিবর্তন আহসান হাবীবের স্বভাবধর্ম নয় ('রাত্রিশেষ' গ্রন্থটি আমি দেখার সুযোগ পাইনি)।

তাঁর কাব্য-ভাষা মৃদু-নাদী নির্বিবাদী—চমকপ্রদ কিছু একটা হঠাৎ করে ধরা পড়ে না, হঠাৎ করে বাঁক নেয়া চোখে পড়ে না ; ধীরে-ধীরে উত্তরণ হয় তাঁর চিন্তাধারায়, মিত পদক্ষেপে তিনি মঞ্চে আরোহণ-প্রয়াসী, বিশ্রাম সুখ-সেবা দিতে তাঁর কবিতা শ্রমণশোভন বীজনের মতো নেমে আসে—কিন্তু পথ পরিক্রমা দুর্মরভাবে ধরা দেয় না, অন্তঃশীল যাত্রাও উচ্চকিত হয়ে লক্ষণীয় নয়। এসব কথা তাঁর কবিতার বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণে পূর্বশর্ত হিসেবে মানতে বলছি না, বরং বাক্‌প্রতিমার আলোকে দেখা যাবে আহসান হাবীব কোন্ পথে কি-ভাবে যাত্রা করেছেন কিংবা করতে চান, কিংবা কী মননশীল বেদনা-আনন্দ সৌন্দর্যে কবিতা ইন্দ্রিয়বেদী করে তুলতে পেরেছেন। বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে তিনি এমন কিছু চিত্র এঁকেছেন যা তাঁর সকল কাব্যগ্রন্থ জুড়ে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে ব্যাপ্ত। যেমন আত্মা এবং আত্মার উদ্বোধন, অন্ধকার থেকে উষার আবির্ভাব, সমাসন্ন আগামী দিন, পিপাসার তৃপ্তি—আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আশা কিংবা চিরন্তনই একমাত্র উজ্জীবনী শক্তি। তিনি বিদেশী শাসন দেখেছেন, স্বদেশে বিদেশী

শত্রুকে সিন্ধুবধ দৈত্যের মতো শাসন করতে দেখেছেন—এই সকল ভাবনা-বিষয়-অনুষঙ্গ তাঁকে অন্তর্মুখী করেছে, কিন্তু ভাবময়তা থেকে সর্বৈব মুক্ত হতে পারেননি, এমনকি কখনও কখনও তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বমুক্ত হতে পারেননি—সবকিছু সত্ত্বেও তাঁর কবিতার বিষয় ও বাক্‌চিত্র, কবিতার চরণ, আবেগ-বাহী শব্দের পঙক্তি নিয়ে আমাদের উন্মন ও উন্মুখ করে; দীক্ষিত করে।

অনেক স্খলন-পতনের মধ্য দিয়ে যাত্রা—এই পথেই শিল্পীর অমরতা আসে, শিল্পের মায়াবী দরজার উন্মোচন হয়। যেমন একটি বাক্‌প্রতিমা :

> কখনও নিজের কথা বলে না ও
> আর আজীবন সমস্ত মেঘের ভার বুকে নিয়ে
> চেয়ে থাকে রোদের পথের দিকে। যদি
> তোমার শিখায় তুমি দেখো ওকে
> দেখতে পাবে
> রোদে-মেঘে মাখামাখি হলে
> আকাশ বিচিত্র হয়
> এবং বিশাল

[রোদে-মেঘে : সারা দুপুর]

কবিতাটির পট-বিধৃত সময় বিষণ্ণ সন্ধ্যা। চিরকালের বাংলার বর্ষার মেদুর সন্ধ্যা মানুষের মনকে কেমন উদাস-উদ্ভিন্ন-উন্মন করে দেয়—কবি চিত্তের মতো এই বিধুর সন্ধ্যাও রোদের প্রত্যাশী, আর হঠাৎ যদি রোদের ঔজ্জ্বল্য ক্ষণিকের জন্যও দেখা দেয় তখন এক বৈচিত্র্য-রভসে অসীম আকাশ আরও অসীম হয়, আরও অনন্ত হয়। বাক্‌চিত্রটি দৃশ্যময় এবং মননজাত, আর কবিসত্তা সমারূঢ় হয়েছে মেঘের আকাশে এবং আলোকের ঝর্ণাধারায় বর্ণবিভার আকাঙ্ক্ষায় কবিচিত্ত উধাও-নির্ভার—অতি বড় গাদ্যিক হৃদয়ও অন্যমনা হয়ে যায় এই দৃশ্যময়তায়; উচ্চালনে। লক্ষণীয়, এই মেঘের ভার বুকে নিয়ে অপেক্ষমান মানুষটি কখনও কারও প্রতি অনুযোগ রাখেন না, নিজেকে গোপন করে রাখেন, এবং শুধু সূর্যের আলোক পথের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন—এই আলোর পথ চাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। আর 'যদি তোমার শিখায় দেখো ওকে' বলে পাঠককে তিনি নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেন। বাক্‌প্রতিমাটি উজ্জীবনের।

এখন 'ছায়া হরিণ' থেকে দু'টি উদ্ধৃতি আহরণ করছি, ভিন্ন-ভিন্নধর্মী এই চিত্রাবলীতে একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যাবে, একটি সুবিন্যস্ত ধারা এই গ্রন্থ থেকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে প্রবাহিত দেখা যাবে—পরবর্তী গ্রন্থের পটভূমি এইভাবে নির্মিত হয়, নিগূঢ় ও ব্যঞ্জনাধর্মী এক আত্মার রূপরহস্যের ধারার বোধন হয়। যেমন:

তাকিয়ে দেখি একটি অমর আত্মা!
যদিও বিষণ্ণ আর ভীরু
তবুও অপার বিশ্বাসে তখন মিনতি রাখি আমিও
এবং বলি:
দেখো দেখো তোমার আত্মার অন্ধকারে
কে যেন হীরের কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে
ডাকে শোনো।

[যৌবনে জীবনে তুমি: ছায়া হরিণ]

পৌষের ধানের ক্ষেতে দেখো দেখো রিক্ততাকে
করেছে আড়াল
কয়েকটি ছড়ানো ধান, গোধূলির গলানো সোনায়
এখনও ঝলমল করে জীবনের গন্ধ দেয় কিছু এখনও আদিম
তৃষ্ণায় আকন্ঠ জ্বলে কয়েকটি মানব-আত্মা, দেখো
বিষণ্ণ আলোর খোঁজে কিছু রৌদ্র আর কিছু হাওয়া।

[ফুটবে ফুল: ঐ]

প্রথম উদ্ধৃতিতে পাই একটি বিষণ্ণ অমর আত্মা (আত্মাটি বিষণ্ণ হলেও অমর) এই বিষন্নতা ও ভীরুতার মধ্যে আছে অপার বিশ্বাস, বিশ্বাসের ঋদ্ধ জগৎ আছে বলেই আত্মার অন্ধকারভেদি সুসমাচার আসে পরমাত্মার হীরের অনির্বাণ কুচি-কুচি দ্যুতিতে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখি পৌষের রিক্ত মাঠ একেবারে নিঃস্ব নয়, তার সাময়িক রিক্ততাকেও আড়াল করে আছে অবহেলায় ছড়িয়ে পড়ে থাকা কিছু ধান, একদিন বর্ষণ শুরু হলে সেই জড়ানো ধান অঙ্কুর উদ্‌গম করবে। আর পৌষের গোধূলি সন্ধ্যা শীতের মৃত রাত্রিতে মিশে যাওয়ার পূর্বে কিছু রৌদ্রের গন্ধ স্মৃতি স্বরূপ মনে রেখে দেবে। আর মানবাত্মার কন্ঠেও আছে অমরত্বের আদিম তৃষ্ণা, যে আত্মা পৌষের গোধূলির বিষণ্ণ আলোতেও খুঁজে পায় কিছু

রৌদ্র আর হাওয়া। দুটি উদ্ধৃতিতেই জানতে পারি বিষণ্নতা গোধূলি শীত রিক্ত-মাঠ অন্ধকার প্রভৃতির পাশে আছে রৌদ্র হীরে ধান সোনা অমর-আত্মা বিশ্বাস।

শুধু ঐ দু'টি উপমা নয় এমন অনেক কথা আছে যা স্তবকে-স্তবকে বিন্যস্ত করা যায়, এমন আরও দু'টি উদাহরণ : 'নতুন সূর্যের তাপে উষ্ণ হবে পৃথিবীর বুক/এবং আমার/মৃত্যুও মহৎ হবে।' অথবা, 'সুরের সঞ্চয় তুলে অভীপ্সার আলো দিয়ে এঁকে/অতঃপর জ্বেলে নেবে জীবনের নতুন সবিতা'—এখানেও সূর্য, উষ্ণ পৃথিবী, মহৎ মৃত্যু, সুরের সঞ্চয়, অভীপ্সার আলো, জীবনের নতুন সবিতা প্রভৃতি আশার বাক্‌চিত্র। এবং 'সারা দুপুর' কাব্যে সেই বাক্‌চিত্রাবলী, সেই 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান' উর্ধ্বে উডডীন প্রত্যাশী আত্মা প্রীচীন বিশ্বাসকে আরও অনিষ্ট করে তোলে জীবনে। যেমন :

ঘাটের
নিবেছে সমস্ত আলো
মরা নদী
নির্জনতা। আর
বিষণ্ন সন্ধ্যায় একা আমি।

নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগাবে এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে।

[উত্তীর্ণ প্রহরের গান : সারা দুপুর]

এখানেও অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস বা অন্ধকার থেকে আলোর বাক্‌প্রতিমা গড়ে উঠেছে। আলোহীন ঘাট, মরা নদীর নির্জনতা, বিষণ্ন সন্ধ্যার একাকিত্ব, পরিশেষে নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদীকে জাগিয়ে তোলার এবং আঁধার নির্জন ঘাটে আলো জ্বলার আশ্বাস বয়ে আনে—বিশ্বস্ত জীবনের স্বাদুরূপ ফুটে উঠেছে। অন্য একটি উদ্ধৃতি একই গ্রন্থ থেকে আহরণ করছি :

হিমে ও বর্ষায়
সূর্যের প্রহরা পাই
প্রশান্তি চাঁদের;

নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের
পরিচর্যা পাই নিত্য
জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদী তীরে।

[শেষ সন্ধ্যা—প্রথম উষা : ঐ]

হিম-বর্ষা পৃথিবীকে সিক্ত প্লাবিত করে কিন্তু সূর্য ও চাঁদের আলোর ক্ষান্তি কোথাও নেই; কারণ এই জীবনের ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদীতীরে নদীর সুশ্রব ও চক্ষু-বিনোদন দৃশ্যাবলী রয়েছে, নদীর ফলদ পলির উর্বরতা আছে, আর আছে সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্ন (জীবনের উদ্দামতা) এবং স্বপ্নের পরিচর্যায় লালিত জীবন। এখানে ঋতু সূর্য ও চাঁদের বর্ণবিচিত্র শোভমান প্রতিমা আছে যা যুগপৎ স্পর্শেন্দ্রিয় ও চক্ষুন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, আবার বর্ষা নদী-সমুদ্রের ঢেউ চক্ষু ও কর্ণকে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে স্বপ্নের বাস্তব-অবাস্তবতা ক্লান্ত-জীবন পরিচর্যার মননে বিধৃত হয়। এইভাবে বাক্‌প্রতিমাটি পূর্ণতা পায়।

আহসান হাবীব তিনটি কাব্যগ্রন্থে সন্ধ্যা অন্ধকার পিপাসা মৃত্যু শব আত্মা সকাল দুপুর গোধূলি বিষাদ নদী আকাশ আলো এমন শব্দ সহযোগে প্রতিমা গড়েছেন—সমস্ত কিছুর শেষে তিনি 'যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছবো' বলে বিশ্বাসী; যদিও কখনও পাই :

একটি বার বাস্‌-এ চড়ে
যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছবো। আর যথাযথ সময়ে। কেবল
এই আশা নিয়ে
কেটে গেছে সমস্ত যৌবন, সমস্ত জীবন, আহা
অসীম অনন্তকাল যেন। তবু বাস্‌
হায়, সেই যোজন বাহন
কি নির্মম বিদ্রূপের ঘন্টা নেড়ে চলে গেলো দূরে বার বার
আমাকে নিলে না।

এই ক্ষেত্রে আশা-হতাশার রূপ করুণ; এক একটি চরণের মধ্যে সংহত হচ্ছে আশা-নিরাশার কথা। কবিতার পঙক্তি সজ্জায় দৃশ্য নির্মাণে কবির অভিপ্রায়-ঈপ্সা প্রকাশ পেয়েছে; দৃশ্য রূপটি হচ্ছে বাস-এর গতিমান চিত্রময়তা ও শব্দমান প্রতিমা, এবং জীবনের কালহরণের কথা, এবং পরিশেষে বাসের ঘন্টাধ্বনিতে শুনি সেই আশাভঙ্গের বর্ণনার রূপ, বিদ্রূপ-

ভরে বাসটি যখন চলে যায়, পথের ওপর কবি পড়ে থাকেন—ব্যর্থতার হাহাকারমণ্ডিত রূপ প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ড।

এই ভাবধারার পাশাপাশি দেখি এমন কিছু চরণ যার গভীরে আশ্বস্ত মানুষের শোক-বর্জন, শোক-পরিহার করা মানুষ:

শুধু শোক যখন আমার
অস্তিত্বকে ঢেকে দেয়

তখন কেবল
তখন কেবল এই কালো ফিতে বড়....বড় আরো বড় করে
একটি বড় কাফন বানাই
শোকের কাফন।
সারা শোক কাফনে আবৃত করি এবং ঘুমাই
শান্ত হয়ে। যেমন দেখেছি
মৃতের গলিত শব শ্বেতবস্ত্রে নিজেকে লুকিয়ে
লোকালয় আর সব কোলাহল থেকে
দূরে সরে নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

শোক শব্দমান দৃশ্যমান অনুভূতি-সঞ্জাত প্রতিমা। শোক মানবজীবনের অত্যাজ্য সঙ্গী, কিন্তু শোক পরিহার করতে হয়, শোককে কাফনে আবৃত করে লোকালয় বহির্ভূত করে দিতে হয়, হবে। এখানে গতিমান শব্দমান স্পর্শমান এবং দৃশ্যমান প্রতিমা যুগপৎ সৃষ্টি হয়েছে—সবচেয়ে বড় কথা শোক পরিহার করে একটি আত্মা ধীরে ধীরে ঘুমের কোলে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে.... এই ঘুম না-জাগা ঘুম নয়, দেহের সঙ্গে আত্মার ক্ষণিক বিশ্রাম মাত্র। এই ক্ষণিক বিশ্রাম আবার উপমিত হয়েছে আরেকটি দৃশ্যের সঙ্গে, দৃশ্যটি সভ্যতার সংকটজাত; যুদ্ধ মহামারী-বন্যা মানুষের অর্থাৎ মানবতার শত্রু, আবার বিপরীত দিক থেকে চিত্রটি দৃশ্যমান হয়েছে—কারণ গলিত শব নিজে নিজে শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হয়ে লোকালয় ও কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে কবরে বিশ্রাম নিচ্ছে। গলিত শব যখন নিজে-নিজে কবরের দিকে যাত্রা করে তখন ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়ে ওঠে, গলিত শব এই অর্থে প্রাণবান।

পরিশেষে একটি বাক্‌প্রতিমার উদ্ধৃতি রেখে বলতে পারি কবির কাছে মানবাত্মার পরাজয় অসহ্য, বেদনাকর, দুঃখের আকর—মানবাত্মার পরাজয় মানুষই ডেকে আনে, কেননা মানুষই মানুষের পরাজয় তরান্বিত করেছে,

কেননা মানুষ মূলত লোভী; যদিও প্লাবন, দুর্ভিক্ষ-মড়ক মানুষকে অশেষ লাঞ্ছনায় ঠেলে দেয়, যদিও কবির অক্ষমতা, নিষ্ফল আর্ত-চীৎকার করে তবুও তিনি আত্মার শুশ্রূষায় অবিরাম প্রসারিত হস্ত। এখানে মনন-সঞ্জাত প্রতিমার প্রকাশরূপ দেখি, আত্মার বহমান ধারাটিকে দার্শনিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে অভিলাষী, এখানে দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য বাকপ্রতিমাটি হচ্ছে আত্মার জন্য আত্মার বেদনার ভাষা। এখানেও কবির মনের মধ্যে সভ্যতার সংকটজাত ভাবনার ভাষারূপ পাই—গলিত শবের দুর্গন্ধ (লক্ষণীয় দুর্গন্ধটি 'পবিত্র' আখ্যায়িত করা হয়েছে, কেননা ধ্বংসের মধ্যেও কবি পুষ্পচন্দ্রের মতো পবিত্রতা খুঁজে পান) সভ্যতার সংকটজাত প্রতিমা, কিন্তু রুগ্ন আত্মার শুশ্রূষা করে তাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে, বস্তুত বর্তমান জগতের অসুস্থ মানসিকতার বা আত্মার শোধন ক্রিয়ার প্রয়োজন বলে কবি মনে করেন। এখানেও 'আমার অক্ষমতা' বলার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ব্যর্থতার হাহাকার শুনতে পাই, এই ব্যর্থতাবোধ কবিকে ম্রিয়মাণ করে রেখেছে। এই ব্যর্থতাবোধ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, যখন এই ব্যর্থতা-বোধের উপর তীব্র আঘাত আছড়ে পড়ে তখন কবি আর নিজেকে সংযত করতে পারেন না। 'আমার এ অক্ষমতা/ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি', এই 'ক্ষমাপ্রার্থী' হয়ে ভিক্ষা করার মধ্যেও এক ধরনের দীনতা লজ্জা-বেদনা কাজ করছে। উদ্ধৃতিটি নিম্নে সন্নিবেশ করছি :

> আমার এ অক্ষমতা,
> ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি
> মৃত আর মৃতপ্রায়
> এই সব মথিত আত্মার কাছে
> গলিত শবের
> পবিত্র দুর্গন্ধ কিছু গায়ে মেখে
> রুগ্ন এ আত্মার শুশ্রূষায় রত হতে
> পারি।

কবিরা, বিশেষত আধুনিক কবিকুল বর্ণনা করে একটি বিষয় বা একটি দৃশ্য কিন্তু তাঁদের অন্তিম লক্ষ্য ভাবকে ফুটিয়ে তোলা, এইজন্য বস্তুময় বর্ণনা কখনও শুধুমাত্র বস্তুর বর্ণনা নয়; এমনকি ইসারা-ইঙ্গিতে, আভাসে-ভাবনায় কবি গন্তব্যে পৌঁছতে চৌষট্টি কলা পারদর্শী মোহিনী নারীর

মতো ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলত কবিতায় দৃশ্যত যদিও আছে একটি সাধারণ বর্ণনা, যদিবা এর শিল্প গরিমা বিন্যস্ত হয়েছে (এক রকম) বর্ণাঢ্য বিস্তারে, অবশেষে বুঝতে পারি কবি সমাপ্ত করেছেন অন্য একটি কথা এবং পরিশেষে সমাপ্ত করে অতৃপ্তই থেকেছেন তিনি। এমন রূপাবরণের মধ্যে সাম্প্রতিক কবিরাই অধিক বেশী সিদ্ধ হস্ত। আহসান হাবীবের 'বাস নেই' বা 'যতবার এবং এবার' কবিতার প্রতিমা সম্পর্কে এই কথা বলা চলে—এই রূপাবরণের ছলে বর্ণিত কিছু কবিতার ব্যাখ্যা অন্যত্রও পাওয়া যাবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

ছন্দোবন্ধে ও বাক্-ব্যঞ্জনায় ফররুখ আহমদের কবিতা বাংলা কবিতার ধারায় বিশেষ পথ-রেখা নির্মাণ করেছে—এইরূপ নির্মাণে তাঁর কবিতা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন সৃষ্টি করে যে অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয় তা ঐতিহ্যের এক বিশেষ মূল্যবোধে উজ্জীবিত। ঐতিহ্যের এই স্বাভাবিক জগৎ আরব্য উপন্যাস, ইরান-আরবের সংস্কৃতি এবং কোরাণের কাহিনী এবং সেই প্রেক্ষিতে মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানই তাঁর কাব্যচর্চার মৌল প্রেরণা। এই পটভূমিতে তাঁর বাক্প্রতিমার চিত্রময়তা, ধ্বনিরূপ প্রবলতা এবং স্বাদলিপ্ততা এক বৈভবমণ্ডিত সম্পদ। শুধু উপরোক্ত রকমের বাক্প্রতিমাই তাঁর কবিতার অবয়ব বললে কম করে বলা হবে, আমি সূত্রাকারে আরও কিছু প্রতিমার সন্ধান দিতে সচেষ্ট হব; দেখা যাবে তিনি কখনও কখনও পরাবস্তুর পানে ছুটছেন, কখনও প্রতিমাপুঞ্জ গড়ে তুলছেন নিবিড়ভাবে, অথবা সভ্যতার সংকটজাত প্রতিমা তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। তাঁর বাক্চিত্রাবলীর দৃশ্যময়তা কখনও কখনও এমন আচ্ছন্নতা নিয়ে উপস্থিত হয়, আবার স্পর্শের এমন নিবিড়তায় ডুবিয়ে রাখে....ফররুখ আহমদের বাক্প্রতিমা বাংলা কবিতার নতুন সংযোজন, কাজী নজরুল ইসলামের পর এমন সার্থক প্রতিমা নির্মাণ বাংলা কবিতায় আর কেউই করতে পারেননি তাঁর প্রথম দিকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করছি। যেমন,

> ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
> হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলাদৃঢ় আব্লুস,
> পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
> নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

[সিন্দাবাদ : সাত সাগরের মাঝি]

সিন্দাবাদ নাবিক কবির নিকট বীরত্ব ও নতুন প্রেরণা সৃষ্টিকারী প্রতীক-মানব—মুসলমান জাতিকে নব-জাগরণের বাণী শোনাতে পারে এমন নির্ভীক মানবই। সাত-সাগর পাড়ির নতুন আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে।

চিত্রগুলি হচ্ছে ঘন-নিবিড় কাপুরের বন, দিল, হাতীর দাঁত, শিলাদৃঢ় আব্‌লুস, পিপুল বন, ঝাঁঝালো হাওয়া (হাওয়া দৃশ্যমানও বলা যায়), ঘুম নামা চোখ, সিন্ধু ঈগল এবং দরিয়ার হাম্মাম। আবার কাপুর বন, পিপুল বন, দরিয়া গন্ধ-বিস্তারী প্রতিমা ; হাতীর দাঁত বা হস্তি যুগপৎ শব্দমান ও গতিমান প্রতিমা নির্মাণ করছে; হাওয়া, ঈগল ও সমুদ্র করে শব্দমান গতিমান স্পর্শ সুখকর প্রতিমার উৎসার ; হাতীর দাঁতের দৃঢ়তার ও শুভ্রতার সঙ্গে উপমিত হয়েছে শিলাদৃঢ় আবলুস কাঠের (লক্ষণীয় আবলুস কাঠ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; এখানে হস্তী-দন্তের শুভ্রতার সঙ্গে বৃক্ষের কৃষ্ণ বর্ণ কাঠের প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রময় বাক্‌বিস্তার নিবিড় বৈভবমণ্ডিত বলা যায়); অবশেষে বলা চলে এই শ্রেণীর বাক্‌বৈভব নির্মাণে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন তুল্যমূল্যরূপে। অথবা, আরও একটি চিত্রধর্মী ও ধ্বনিময় দৃষ্টান্ত আহরণ করছি (এই কবিতায় এমন উল্লেখযোগ্য পঙক্তিমালা অনেক) :

> কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
> শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
> ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
> পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;
> নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ !

[ ঐ : ঐ ]

'সিন্দাবাদ' কবিতার গতিমান-চিত্রময় বাক্‌প্রতিমার সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা চলে না। এই কবিতার স্তরে-স্তরে যে ধ্বনিবহুল শব্দের কারুকার্য চলেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য যুক্ত হয়ে চক্ষুমান প্রতিমাবলী যে তৃপ্তি দেয়, কোন কোন চিত্রের স্পর্শ সুখময়তা এমন নিবিড়, সমুদ্রের নোনা স্বাদ এমন মুগ্ধকর, সমুদ্রের-দাঁড়ের শব্দ এতই শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর—ফররুখ আহমদের কাব্যাবলীতে 'সিন্দাবাদ' একটি শ্রেষ্ঠ পুষ্প বলে বিবেচিত হবে। অথবা 'দরিয়ার শেষ রাত্রি' কবিতার পঞ্চম মাল্লার মুখে শুনি বাক্‌বৈভবময় উক্তি :

> সাত সাগরের সাথী তুমি জান পাথরে গড়া এ মুঠি,
> বেদনা-নিসাড় দোলনার সুরে প'ড়েছিল পাশে লুঠি'
> বেহুঁশ হালতে খুঁজেছি আঁধারে দু'খানা কোমল ডানা
> কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার শুনব না আর মানা।

[ দরিয়ার শেষ রাত্রি : ঐ ]

মনন-যুক্ত এই স্মৃতিময় চিত্রগুলি গ্রথিত হয়ে শেষ পঙক্তিতে এসে তীব্র এক অনুভূতির মুখে দাঁড়াই। 'কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার' বলার সঙ্গে সঙ্গে যে গতিশীল চিত্রটির সাক্ষাৎ পাই, যে মানসিক শক্তিটি অনুভবযোগ্য হয়, আসলে তখনও কিস্তির মুখ ঘোরেনি কিন্তু পাঠকের চোখে 'ঘোরাও' বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি প্রত্যক্ষবৎ হয়। কবির বাকবিন্যাস-নৈপুণ্য এইভাবে সার্থকতা লাভ করে। আবার ৬ষ্ঠ মাল্লার বক্তব্য :

কাল মাস্তলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে,
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভূর কূলে কূলে,

[ঐ : ঐ]

'মাস্তলে ঝড়ের কান্না শুনেছি' শব্দমান প্রতিমার উদাহরণ নয় শুধু, ঝড়ের কান্না শ্রবণেন্দ্রিয়কে উদ্বোধিত করছে না শুধু—এই শব্দমান প্রতিমা যেন দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে, কেননা মাস্তল ঝড় দৃশ্যমান কিন্তু এখানে দুটি দৃশ্যময় চিত্র চক্ষুকে তৃপ্ত করলেও ঝড়ের কান্নাটি বর্ণনার সৌষ্ঠবে দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা। পরবর্তী পঙক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু এই চিত্রটিতে একটি বিষাদময়তা অতিমাত্রায় উত্তাল হয়ে ওঠার ফলে পূর্বোক্ত গতিময়-শব্দমান বাক্‌চিত্রটি থেকে এঁকে একটু পৃথক চোখে দেখেছি (যদিও প্রথম পঙক্তিতেও কান্নার বেদনা-বিষাদ আছে তা' পরবর্তী চরণের মতো হাহাকারমণ্ডিত নয়, পরবর্তী চরণে মরুভূমির ধূ ধূ বিস্তার শূন্যতার মননশীল প্রতিমার সংযোজনে বেশী হাহাকারমণ্ডিত হয়েছে)।

তাঁর কবিতায় ধ্বনিরূপময় বাক্‌প্রতিমার সন্ধান মিলবে চিত্ররূপময় প্রতিমার পাশাপাশি, দুই ধরনের বাক্‌প্রতিমায় তাঁর সিদ্ধি ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে। এমন কয়েকটি উদাহরণ রাখছি :

একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব
তোলে মসিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব
অস্ফুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

[পাঞ্জেরী : ঐ]

আজকে কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে দ্বারে কশাঘাত,
সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত,
প্রবল পুচ্ছ আঘাতে তোমার রঙীন মিনার ভাঙে।

[ সাত সাগরের মাঝি : ঐ ]

ঘুম ভাঙলো কি হে আলোর পাখী? মহানীলিমায় ভ্রাম্যমাণ
রাত্রি-রুদ্ধ কন্ঠ হতে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান?

[ সিরাজাম মুনিরা......সিরাজাম মুনিরা ]

জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর

[ নৌফেলা ও হাতেম : নৌফেলা ও হাতেম ]

ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হাওয়ায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,

[ কাফেলা : কাফেলা ]

সামান্য বিন্দুর আকারে
দেখা দেয় যে বৈশাখী ঝড়ের মেঘ
সারা আসমানে সে ছড়িয়ে পড়ে অবলীলাক্রমে,
ইসরাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি
যখন আমরা শুনতে পাই মেঘের বজ্রকন্ঠে,
আর অনুভব করি
ভাঙা গড়া,
ঝড় ঝাপট,
বৃষ্টি বাদলের এক নতুন অধ্যায়।

[ গদ্য পৃথিবী : সংখ্য ২৯ ]

তাঁর কবিতার এই প্রবল ধ্বনিময় বাক্‌প্রতিমা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও কাব্য গ্রন্থের তুলনামূলক ক্রমাবনতিতে এইভাবে আছে—'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনিরা' ও 'নৌফেল ও হাতেম'। নিঃসন্দেহে বলা যায় বহু কবিতার মধ্যে 'সিন্দাবাদ', 'দরিয়ার শেষ রাত্রি', 'বার' দরিয়ায়' তিনটি কবিতা প্রবল ধ্বনিরূপময় বাক্‌প্রতিমা-সমৃদ্ধ।

ফররুখ আহমদের কবিতায় সমুদ্র (এই অনুষঙ্গে জাহাজ, ঢেউ, বন্দর, ঝড়), মরুভূমি (কাফেলা, উট, মৃগতৃষ্ণিকা ইত্যাদি), অরণ্য, শিরাজী, সূর্য, পাখি (ঈগল), চাঁদ, বৈশাখী ঝড় ইত্যাদি শব্দ ও চিত্রাবলী প্রবল আবর্তনশীল হয়ে বারবার এসেছে (আমার প্রথম দৃষ্টিতে এই সকল শব্দই বেশী চোখে পড়েছে)। অথবা ফররুখ আহমদকে বুঝতে হলে সমুদ্র ও মরুপুরাণের তীব্র ও ঝাঁঝালো উপাদান দু'টি বিশ্লেষণ করলে সঠিক উত্তর মিলবে, তিনি এই দুটি বিষয়ের অনুষঙ্গে আর-আর বাকি সবকিছু আহরণ করেছেন কিংবা বলা যায় আবর্তন সৃষ্টি করেছেন—বাক্‌প্রতিমান্বেষণেও এই পথে নতুন-নতুন উল্লেখনীয় বিষয়ের অবতারণা অনুভব করা যাবে। মননশীল প্রতিমাবলীর মধ্যে ইনসান, মঞ্জিল, তোরণ, আলো বা মুক্তি এবং এই শ্রেণীর অনুগামী প্রতিমা বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। অন্যদিকে মৃত্যু বাক্‌প্রতিমা বারবার উচ্চারিত হলেও বুঝতে হবে জীবনের উল্লাস বা নব-জীবনের প্রতিষ্ঠার আলোকেই এর আবর্তনশীল উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা। ফররুখ আহমদ নব-জীবনের উদ্বোধক ও আশার বাণী বিন্যাসকারী কবি—ঘুমন্ত জাতির আয়েশী শরীরে তিনি যাযাবরের গতিবেগ সঞ্চারকামী, 'এক দিগ্বিজয়ী মানবগোষ্ঠীর সমরজিৎ শোণিত-স্রোতের নির্দেশক'। এই জন্য অরণ্যের ঝড়ের সঙ্কেতের সমান্তরালে ভেসে আসে নতুন মাটির ঘ্রাণের প্রতিমা :

> আরণ্য ঝড়ের শব্দ শোনা যায় সেই পদক্ষেপে
> মাটির নতুন ঘ্রাণ ভেসে আসে সে ঝড় মৌসুমে
> যে ঝড় (বিশীর্ণ-শ্রান্তি) চলেছিল দীর্ঘ পথ মেপে
> মৃত্যুর মর্সিয়া হয়ে, রূপ নিল আজ সাইমুমে।
> সসাগর পৃথিবীর আদিগন্ত স্নায়ু ওঠে কেঁপে
> রাত্রি-শ্রান্ত প্রেসম্যান স্বপ্ন দেখে পরিপূর্ণ ঘুমে।।
>
> [ প্রেসম্যান : হে বন্য স্বপ্নেরা ]

এখানে আরণ্য ঝড়ের প্রতিমা মাটির নতুন ঘ্রাণ বহন করে আনছে, আবার সেই ঝড় মৃত্যুর মর্সিয়ার বাক্‌চিত্র অঙ্কন করলেও কিংবা সসাগর পৃথিবীর স্নায়ু কেঁপে তোলার প্রতিমা গড়লেও পরবর্তী পদক্ষেপে দেখি রাত্রি-শ্রান্ত প্রেসম্যান পরিপূর্ণ ঘুমে আশার স্বপ্ন দেখছে (এই নাগরিক মানুষ হেমিংওয়ের বৃদ্ধের বাঘের গর্জনের স্বপ্নকে স্মরণ করায়)। এই মননশীল বাক্‌প্রতিমাটি

ফররুখ আহমদের মানসিকতাকে ধারণ করেছে। এখানে ঝড়, মরুভূমির সাইমুম, সাগর, মৃত্যু ও উজ্জীবনের স্বপ্ন প্রভৃতি বাক্‌চিত্রগুলি একটি পূর্ণ বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছে এবং ফররুখ আহমদের মানসিকতা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে বলতে পারি। অথবা :

ঝড়ের শিখরে জাগায় প্রবল হ্রেষা
গতি আবর্তে সুদৃঢ় তার নেশা
ভাঙে না বাধার কুটিল ব্যঙ্গস্বরে
চোখের পলকে সে আরবী তাজী উধাও দেশান্তরে।
কেঁপে ওঠে তার সজীব খুরের আঘাতে মৃতের ঘর,
জেগে ওঠে তার প্রবল গতির ঝড়ে মৃত প্রান্তর।

[ ইশারা : সিরাজাম মুনিরা ]

ঝড়ের তাণ্ডবে অশ্ব হ্রেষা ধ্বনি তোলে এবং সেই তাজী এখনই দিগ্‌বিজয়ে ছুটবে, আর সত্যই যখন যাত্রা শুরু করল দেখলাম তার খুরের প্রবল আঘাতে মৃতের ঘর-বাড়ি বিলোপ হতে শুরু করেছে এবং পরিশেষে শুনতে পাই অশ্বের খুরের আঘাতে দীর্ণ কাঁটাময় মৃত প্রান্তর সজীব হয়ে উঠছে—ফররুখ আহমদের বাক্‌প্রতিমায় বক্তব্য স্ফুরিত হয়ে উঠল। উপরোক্ত দুটি বাক্‌বন্ধে লক্ষ্য করা যায় গদ্যের একটা টান, এই মেজাজটি খুব জোর-কদম নিয়ে তীব্র গতিশীল নয়, কিন্তু শ্রুতিশীল। আরও লক্ষণীয় দু'টি বাক্‌প্রতিমায় তাঁর ধ্বনিময় বৈভব দীপ্ত হয়ে উঠেছে। একটি উৎকৃষ্টতম ধ্বনিরূপপ্রবল বাক্‌প্রতিমা :

বাজে অনন্ত জলতরঙ্গ মৃদঙ্গ অম্বরে
সারং রবাব একাকার হ'ল যন্ত্রীর মন্তরে।

[ আলী হায়দার : সিরাজাম মুনিরা ]

সভ্যতার সঙ্কট-জাত বাক্‌প্রতিমা নিদর্শন তুলে ধরছি এবার। একদিন বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুধার হাহাকার উঠেছিল, সেই একদিনের ইতিহাস ১৩৫০ সালের মন্বন্তর, সেই দিনের ফররুখ আহমদ কলকাতা নগরের এবং বাংলার দুঃস্বপ্নকে ধরেছেন এইভাবে :

অন্ধকার। গূঢ় অন্ধকার—
ভয়ঙ্করী এ রজনী বাহুতে জড়ায় কাল সাপ

মানুষী বিবেকে শুধু পড়িতেছে শয়তানী চাপ
পাশব প্রতাপ।

.... .... .... .... .... .... .... .... ....

গলিত শবের মুখে এই প্রশ্ন এ সংশয় আশঙ্কা-কুটিল
বহু রাত্রি পার হয়ে স্খলিত পথের প্রান্তে শংকিত নিখিল
আজো স্বপ্ন দেখে;
আজিও শবের পিছে পার হয়ে যাত্রীদল চলেছে অনেকে।

[ নাম কবিতা : হে বন্য স্বপ্নেরা ]

এ পাশব অমানুষী ক্রুর
নির্লজ্জ দস্যুর
পৈশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব-সত্তা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার,
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,
মানুষের হাড় দিয়ে আজ গড়ে খেলাঘর;
সাক্ষ্য তার প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর 'পর।

[ লাশ : সাত সাগরের মাঝি ]

'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামক অগ্রন্থিত কাব্যের নাম-কবিতাটি থেকে নেওয়া প্রথম উদ্ধৃতির এই ছত্র কয়টি। ফররুখ আহমদের রোমান্টিক মন একদিন সভ্যতার সঙ্কট দেখে বিমূঢ় হয়ে এই পঙক্তি নিয়ে রচনা করেছেন, এমন আরও কবিতা আছে ('সিরাজাম মুনিরা'-র 'এই সংগ্রাম' কবিতায়ও এই সংকট প্রকাশ পেয়েছে)। ফররুখ আহমদ যেখানে আতর লোবানের গন্ধই বেশী শুঁকতে ভালোবাসেন সেখানে পাই এই লাশের তীব্র গন্ধ, এই দুটিই ঝাঁঝালো অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ময় বাক্‌প্রতিমা।

যে-সকল মননশীল ও সাধারণ অর্থ-প্রকাশক প্রতিমা ফররুখ আহমদের কাব্য দেহ গঠন করে, যাদের সঞ্চরণ তাঁর কাব্যে বহুগুণিত তেমন একটি স্তবক আহরণ করছি। শব্দগুলি ঘুম, সুবে সাদেক, তারকা, মিনার, ঝড়, ঈগল, দিগন্তে সোনালি বান, তিমির-শিকল উটের সারি, যাত্রীদল প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্টতাজ্ঞাপক মননের :

তাদের চলার তালে ঘুম ভাঙে, দুই চোখে নেমে আসে ঘুম,
সুবে সাদেকের শুভ্র পথে এসে তারকারা নীরব নিঝুম....
দীর্ঘ মোরাকাবা শেষে অকস্মাৎ প্রভাতের রঙিন মিনার
চূড়া তোলে তার............
প্রবল গতির ঝড় বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উড়িছে ঈগল,
দিগন্তে সোনালি বানে খুলে গেছে শর্বরীর তিমির-শিকল,
উটের সারির পাশে জমা হ'ল একে একে দৃঢ় অচপল
দূর যাত্রীদল।

[ কাফেলা : কাফেলা ]

# তৃতীয় অধ্যায়

তাঁর কাব্যে বাগ্‌বৈভব অগুনতি, দু'হাতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন চিত্র-রূপময় বাগৈশ্বর্য; বিশেষত 'সহসা সচকিত' কাব্যগ্রন্থ দৃশ্যমান ও স্পর্শানুভূতি উদ্রেককারী বাক্‌প্রতিমার নিবিড় ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অকুন্ঠ। সৈয়দ আলী আহসান এমন একজন কবি যাঁর কবিতা উপমায় উৎপ্রেক্ষায় অলঙ্কারে রূপকে শব্দের ঐশ্বর্যে একটি বিশেষ আবহ সৃষ্টি করতে সমর্থ; সক্ষম। বাক্‌প্রতিমা বা ইমেজ নির্মাণে তিনি বারবার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন, প্রাচীনকালের চিত্রধর্মী প্রতিমাবলী অনবরত আহরণ করে সেই সঙ্গে মননশীল প্রতিমার যোজনা করেছেন—বলা যায় তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সেই সকল প্রতিমার নবমূল্যায়ন প্রয়াসী। এই পথে সিদ্ধি এসেছে নিটোল শব্দ চয়ন করে, নিরবচ্ছিন্ন অলঙ্করণ পদ্ধতিতে পংক্তির পর পংক্তি সজ্জায়, বাহ্যিক রূপাবয়ব অঙ্কনের ছলে কবিতার অন্তর-প্রকৃতির উদ্বোধনে—এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কবিতা অমল মাধুরী বিস্তার-পারঙ্গম। শব্দকে তিনি বরাবরই কবিতার প্রধান এবং অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন, বস্তুত শব্দের শোভাযাত্রায় ও সৌকর্যে কবিতার অবয়ব গঠনে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে-ছবি আঁকে, গোটা-কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ মাত্রেরই দুটো দিক আছে; একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক এই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে; কাব্যের শব্দ আবেগবাহী'। সৈয়দ আলী আহসানও শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে কাব্যের মরমী সিদ্ধিতে পৌঁছার প্রত্যাশী; কিন্তু তাই বলে শব্দের অনুশাসন সর্বক্ষণ মেনে কবিতাকে সঙ্গত শাসনে অনুক্ষণ বেঁধে রেখেছেন বা রাখতে প্রয়াসী এমন নয়।

তাঁর অনেক বাক্‌প্রতিমা (এবং কাব্য ভাবনা) ভালোবাসার স্বরূপ প্রকাশে, অন্তরের আবেগ উদ্বোধনে ও প্রেমের ভুবন রচনায় আবর্তিত; আন্দোলিত। 'সহসা সচকিত' গ্রন্থের কবিতাবলী এবং 'উচ্চারণ'-এর অনেক কবিতা প্রেমের অস্থিরতা-প্রশান্তি, বহির্দৃষ্টি-অন্তর্প্রকৃতিপ্রবণতার ভাবনায় কৌতূহলী। 'উচ্চারণ' গ্রন্থের ৪৩ সংখ্যক রচনায় লিখেছেন, 'আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি চিরকালের আকাঙক্ষাকে জাগ্রত দেখতে চেয়েছি—সে আকাঙক্ষা হল একটি অসম্ভব প্রেমের মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করা......।' প্রথমে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করা যাক, প্রথমে এই ভাবজাত বাক্‌প্রতিমার অনুজ্জ্বল ও সচরাচরিক কয়েকটি বাক্‌প্রয়োগের উল্লেখ প্রয়োজন। যেমন :

যদি ফুল হও, যদি পাখী হও,
নদীর প্রবাহে যদি বা উধাও,
যদি আকাশের অঞ্চল হ'য়ে
আবরণে ঢাকো আমারে—

[ সহসা সচকিত : সংখ্য ২ ]

যৌবন যদি ভরা নদী হ'য়ে
বেতসের মতো কম্পিত

[ ঐ : সংখ্যা ৯ ]

হরিণী-গঠন বাহু সঙ্গতি—
গ্রীবায় জড়ায়ে যেন লতা,

[ ঐ : সংখ্যা ১৮ ]

দেখেছি প্রথমে নাকে হীরাটি
কানে কুণ্ডল লীলাভরণ,
কত না বর্ণ শাড়ীর আঁচল
কত বিচিত্র দেহাবরণ।
গতি-বিভঙ্গে কত কৌশল
তির্যক চোখে কত ভাষা,
কৌতুক নিয়ে মধুর খেলায়
আনন্দ আর কত আশা।

[ ঐ : সংখ্যা ২৩ ]

উজ্জ্বল আলোড়িত দীপ্তিময় বাক্‌প্রতিমার নিদর্শন নয় এই সকল উদ্ধৃত ছত্র, সহজ-সাধারণ বর্ণাঢ্য বর্ণনা মাত্র। ফুল, পাখি, নদী, আকাশ-এর মতো নায়িকা ও নায়িকার অঙ্গাভরণ; বেতসের মতো কম্পিত যৌবন; হরিণী-গঠন বাহু ও গ্রীবায় জড়ানো সেই বাহু লতা; নাকে হীরার নাক-ছবি, কর্ণে লীলায়িত কর্ণকুণ্ডল, বহুবর্ণ শাড়ির আঁচল এবং বিচিত্রবর্ণ অন্যান্য দেহাভরণ, নায়িকার কুশলী গতিভঙ্গি, তীর্যক চোখের বিচিত্র ভাষা, আনন্দ-কৌতুক দোলায় গতিময়ী নায়িকার আনন্দরূপ আশা—নায়িকার এমন রূপ সহজ-সাধারণ ভাষা প্রয়োগে বর্ণিত এহেন রূপ-বর্ণনা ও গুণা-রোপ কোন তীক্ষ্ণ-তুমুল ইন্দ্রিয়বেদিতার পরিচয়বাহী নয়, অথবা নয় নতুনত্বে হৃদয়দ্রবকারী। ভরা নদীর যৌবন, বেতসের মতো কম্পিত যৌবন, হরিণী-গঠন বাহু বাক্‌চিত্রাবলী প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে বহুবিধভাবে বহুবার বহুব্যবহৃত হয়ে তাঁর হাতে এসেছে—যৌবনের বেদনার গান এখানে নব্য-কাব্যকলা রীতি অনুসরণে অনুসৃত হয়নি, অথবা নব-নব অন্তরঙ্গ বাক্‌বৈভব এখানে অনুপস্থিত। আরও, একটি উদাহরণে দেখতে পাই প্রাচীন (সংস্কৃত ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের) কাব্যকলার প্রতি প্রীতির অকুন্ঠ স্বীকৃতি। যেমন :

শুধু বিস্ময়—এখনও যখন
অবগুন্ঠন উন্মোচন
নিটোল দ্রাক্ষা তোমার কপোল
এবং বক্ষে উদ্বোধন—
উপাধান যেন চিরাশ্রয়ের
তরঙ্গ যেন বরণীয়,
একাকী আমার আশা-নিরাশার
প্রাচীন কাব্য স্মরণীয়॥

[ঐ : সংখ্যা ১০]

'উচ্চারণ' গ্রন্থে কবি স্বীকার করেন :

তার দেহ আমার কাছে মধ্যযুগের কাব্যের বরতনু। স্পর্শের নির্ণয়ে বিগলিত পাথরের মতো। প্রতি অঙ্গেই যেন হৃদয়ের উপক্রমণিকা। .............তার সমগ্র দেহ একটি প্রসন্ন সময় উদ্‌যাপনের নিভৃত কৌতূহল। প্রতিদিনের ব্যবহারে পৃথিবীর সময় যখন অনবরত ক্ষয় হচ্ছে, অথবা

প্রচুর বিষণ্ণতায় শীতে প্রকৃতি যখন নিস্তব্ধ, তখন তার অনাবৃত দেহ অশেষ উপলব্ধির মতো এবং উষ্ণতায় নিশীথে বিপুল অন্ধকারে একটি-মাত্র প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার মতো। আমার করাঙ্গুলী তার দেহকে স্পর্শ করে কামনার উদ্‌ঘাটন করে নি কিন্তু হৃদয়কে উন্মোচিত করেছে। এ স্পর্শের অবক্ষয় নেই। [ সংখ্যা ১৩ ]

মধ্যযুগের ধারা বহমান ঐতিহ্যে আধুনিক কালে পেঁৗছেছে, কবি ঐতিহ্যের আনুগত্যে অকুন্ঠ। এই সকল ত্বগেন্দ্রিয় ও চক্ষুন্দ্রিয় তৃপ্তিকর প্রতিমাবলী তাঁর কবিতায় এক নিবিড় বৈভব এনে দিয়েছে, সমসাময়িক বা পরবর্তী কবিদের মধ্যে আল মাহমুদের 'সোনালী কবিন' গ্রন্থেই যা এমন বাগৈশ্বর্য সৃষ্টি করেছে। সৈয়দ আলী আহ্‌সানের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সংস্কৃত ও মধ্যযুগের বাংলা–সাহিত্যের পরিচিত আবহকে আমাদের কাছে তুলে ধরে পুনরায় সেই স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দৃশ্যমান বাক্‌প্রতিমাগুলি বরাবরই স্পর্শেন্দ্রিয়কে বিহ্বল করে, আবার স্পর্শে-ন্দ্রিয়কে তিনি যখন প্রতিমাবিধৃত করেছেন তখনও দৃশ্যময়তা তূল্যমূল্য রূপে সঞ্চরমান--এই সফলতা ন্যূন নয়। আবার সমস্তকিছু উৎসর্জ্জন করে পরক্ষণেই আমরা পেঁৗছে যাচ্ছি অন্য এক রাজ্যে। তাঁর কবিতায় এমন অনেক-অনেক বাক্‌প্রতিমার সন্ধান মেলে যেখানে মনন-মিশ্রিত বাক্‌প্রতিমা-বলী উদ্বেল, এবং এই পথে তিনি লক্ষ্যাভিসারী। সংস্কৃত কাব্যে (ও মধ্য যুগের বাংলা কবিতায়) বিরহ ও মিলন বাস্তব সম্ভবপরতার মধ্যে আবদ্ধ, আর সৈয়দ আলী আহসানের মিলনোল্লাস (একটি ভাবচ্ছবি অঙ্কিত করেও) আধুনিক কবির ব্যক্তিস্বরূপের বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব হয়।

১. অর্থবিহীন তোমার কথায়
বিপুলা পৃথ্বী মেঘ হ'য়ে যায়
সব মুছে দিয়ে শব্দের মোহে
চিত্ত সহসা মূর্ছিত—
বিশ্রামহীন তোমার কাকলী—
আমার হৃদয়ে সচকিত॥

[ সহসা সচকিত: সংখ্যা ৪ ]

২.　গোপন রেখায় যেখানে কথার
　　　হৃদয়ে সজল আর্তনাদ—
　তোমাকে সেখানে কামনা করেই
　　　ছড়া গানের কত প্রমাদ—
　আশ্রয় ভুলে কথার পাখায়,
　অবিরল যেন বৃষ্টি ধারায়,
　অসম্পূর্ণ আকুল ভাষার
　　　অভিসার যেন অকস্মাৎ ॥

[ ঐ : সংখ্যা ৮ ]

৩.　কিন্তু এখানে আমার আকাশ
　মেঘ আর ছায়া এবং বাতাস
　　　সর্ব সময়ে সময় হারিয়ে
　　　　　শুধু অবিরত চিন্তিত,
　কি ক'রে জীবনে অর্থনীতির—
　আয় আর ব্যয়, ক্ষয় ও ক্ষতির
　　　করপুটে ভরি দান-সামগ্রী
　　　　　একটি হিসাবে নির্ণীত।

[ ঐ : সংখ্যা ৯ ]

৪.　চঞ্চল হৃদয় নিয়ে
　অবিরল কয়েকটি পাখী—
　　　এক সঙ্গে ডানা মেলে
　　　　　যেন এক পুষ্পের কোরক ॥

[ ঐ : সংখ্যা ১১ ]

৫.　পাখীর চোখের ঘুমের সঙ্গে,
　তোমার জন্য নব আনন্দে,
　　　পাথরের মতো নগ্ন ছায়ায়
　　　　　দেহ প্রান্তর সাগর হয় ;
　ভাগ্য-কুশল সন্ধান ক'রে
　　　হৃদয়ে হৃদয় নীরব হয় ॥

[ ঐ : সংখ্যা ১৮ ]

৬. তুমি তোমার কুন্ঠাহীন শুভ্রতা নিয়ে,
নিরাভরণ ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে,
বন-পথে আমার দৃষ্টিতে,
চোখের পলক ফেলায়,
বাষ্প হয়ে, আবরণ হয়ে,
সমস্ত দেখার লীলাভূমি হলে।

[ উচ্চারণ : ২৮ ]

প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখি প্রিয়তমার অর্থহীন কথায় বিপুল পৃথিবীর অস্তিত্ব চলিষ্ণু মেঘের অস্থিরতায় পর্যবসিত (মেঘ তৃষ্ণা নিবারণকারী জল বহন করে, মেঘ-বারি পৃথিবীকে শ্যামল ও উর্বর করে, মেঘ কালিদাসের যক্ষের প্রাণরক্ষাকারী বার্তাবহ, মেঘ গতিশীলতার প্রতীক), মেঘ মুছে শব্দ হয়, সেই শব্দ কবির হৃদয়কে করে মূর্ছিত এবং পুনরায় মূর্চ্ছা ভেঙে সেই শব্দাবলী কবিকে করে সচকিত। অর্থাৎ বুঝতে পারি প্রিয়তমার প্রেম কবিকে ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত করে নব-নব আবহে সৃষ্টিতে সৌকর্যে। এখানে আর, পূর্বের মতো, প্রিয়তমার রূপ-বর্ণনায় সচরাচরিক গতানুগতিকতা নেই, অর্থাৎ প্রিয়তমার বাহ্যিক রূপের অন্তরঙ্গ বিবর্তন ঘটেছে। এই ভাবনার প্রকাশ উচ্চারণ গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতায়, '....প্রেমের দীপমালা জ্বালিয়ে/পুরুষ এবং রমণী যুগ যুগ ধরে মুক্তির সন্ধান করেছে এবং মিথুনের সম্মোহনে/দ্বৈতবোধের অপসারণ ঘটিয়ে অন্তহীন আনন্দের উপঢৌকন এনেছে।/এ-ভাবেই অনবরত নতুন নতুন জন্মের উৎসব; এ-ভাবেই জীবনের উত্তাপ/জাগে আমাদের শরীরে, প্রকৃতিতে এবং সর্বত্র;.......।' বুঝতে দেরি হয়না এই বাগৈশ্বর্য প্রেমের গভীর অর্থময়তা অণ্বেষণ তৎপর, মনন যুক্ত হয়ে এই বাক্‌প্রতিমা পরিণতির দিকে অগ্রসরমান। সহসা সচকিতের উপরোক্ত উদ্ধৃতির 'কথা'র শব্দপ্রতিমা চলিষ্ণু মেঘের চিত্রময় ও গতিমান প্রতিমায় রূপান্তরিত, কখনও শব্দগুলি মূর্ছিত চিত্তের মতো স্থির হয়ে নতুন গতি সঞ্চারের জন্য আবেগ সঞ্চয় করছে। লক্ষণীয় কবির বাক্‌প্রতিমা এখন (পূর্বের গতানুগতিকতার জাল ছিন্ন করে) অন্তর দীর্ণ আবেগে উৎসারিত। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পাই প্রিয়তমার কথার। হৃদয়ের অশ্রু নিনাদিত করে (লক্ষণীয় হৃদয়ের অশ্রু প্রতিমাটি), আর তাই কবির মনে উৎসারিত হয় ছড়া ও গানের বিপুল ঝর্ণাধারা, এবং অবিরল

কথার পক্ষপুট বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে সৃষ্টির অভিসারে উন্মত্ত। এখানে প্রিয়তমার কথা 'হৃদয়ে সজল আর্তনাদ'-এর মতো চক্ষুগ্রাহ্য (অর্থাৎ 'সজল' শব্দের চক্ষুগ্রাহ্যতা) অনুভূতিক ও শব্দমান বাক্‌চিত্র নির্মাণ করছে; আবার 'হৃদয়ে সজল আর্তনাদ' বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য শ্রুতিমান ও মননশীল ভাবের উদ্বোধন হয়; আর পরবর্তী 'কথার পাখায়' 'বৃষ্টি ধারায়' পাঠে শব্দময় ঘ্রাণযুক্ত চিত্ররূপময় এবং অনুভূতিশীল প্রতিমার উদ্বোধন হয়; সর্বশেষে 'অসম্পূর্ণ আকুল ভাষার/অভিসার যেন অকস্মাৎ' (দৈহিক অভিসার নয়) বলার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয় আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে এক তীব্র-মধুর-হার্দ্য যন্ত্রণায়। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে কবির বর্ণনা আকাশ মেঘ ছায়া ইত্যাদি চক্ষুগ্রাহ্য প্রতিমা নিয়ে (বাতাস চক্ষুগ্রাহ্য না-হলেও বস্তুবাচক), কিন্তু এইসব দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুপুঞ্জ হৃদয়ের আকুল আবেগ প্রকাশকারী কথার জন্যই ব্যয়িত। আবার, পরবর্তী স্তবকেও জীবনযাত্রার আয়-ব্যয়ের কথা যতই সোচ্চার ভাষায় বর্ণিত হোক তার অন্তরালে ও পাশাপাশি সনির্বন্ধ হয়ে উঠেছে ভালোবাসার অকুন্ঠ উপহার অর্পণ। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে হৃদয়রূপ চঞ্চল পাখির সঞ্চরমান ডানা গতিশীল প্রতিমার উদ্বোধন করে, পুনর্বার, পুষ্পের কোরক সেজে মুহূর্তের মধ্যে স্থিরচিত্র এবং গন্ধ-বিস্তারে ব্রতী হয়ে উঠল (ভুলছি না পাখির পক্ষপুট রৌদ্র-বৃষ্টির ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম গন্ধস্রাবী)। এখানে হৃদয়ের গতিমান প্রতিমা স্থিরধর্মী পুষ্প কোরকের সঙ্গে উপমিত হয়ে একটি আবর্তনশীল সম্পূর্ণ বাক্‌প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। পঞ্চম উদ্ধৃতি : পাখির ঘুম-চোখ ও পাথরের নগ্ন ছায়ার মতো প্রিয়তমার স্থিরধর্মী শরীর একসময় সমুদ্রের মতো কল্লোলিত ও গর্জনশীল হয়ে ওঠে, সেই হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে আরেকটি আবর্তনধর্মী হৃদয় নিথর-নিস্তরঙ্গ হয়—দেখতে পাই স্থিরচিত্র একবার গতিমান হয়ে পুনর্বার স্থিরচিত্তে অবসিত হচ্ছে, অর্থাৎ প্রয়োগরীতির বৈশিষ্ট্যে এখানে বাগবৈভব নবতর হচ্ছে। (হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ হয় ভাগ্য-কুশল অণ্বেষণের জন্য)। ষষ্ঠ উদাহরণে 'কুন্ঠাহীন শুভ্রতা' বাক্‌চিত্রটি অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের এক আন্দোলিত অনুভূতির কোলাহলের জন্ম হয়। এই উদ্ধৃতির বাক্‌চিত্রাবলীও অনুভূতি-সঞ্জাত, মধ্যযুগের মতো রূপবর্ণনায় বস্তুময়তার প্রাধান্যের পরিবর্তে বস্তুবিধৃত গুণাবলী শীলিত হয়ে উঠেছে। এই ছয়টি উদ্ধৃতি পূর্ববর্তী উদাহরণ থেকে ভিন্নধর্মী, এবং এখানেই সৈয়দ আলী আহ্‌সানের বাক্‌প্রতিমার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি।

প্রেমের পূর্ণতা কি মৃত্যুতে, অথবা জীবনে? প্রেমের গভীরতায় মানুষ যখন অবগাহন করে তখন মৃত্যু তার কাছে তুচ্ছ। বিরহের দশমী দশায় মৃত্যু হয়, আবার প্রেমের বঞ্চনাও মৃত্যু ডেকে আনে। 'সহসা সচকিত' গ্রন্থ মিলনের, উল্লাসের—মৃত্যু এখানে তার চির-অন্ধকার হাত প্রসারিত করতে পারে না, আবার মিলনের গভীরতায় সমাহিত হওয়াও এক ধরণের মৃত্যু। 'সহসা সচকিত' গ্রন্থে মৃত্যু প্রতিমা একবার চকিতে হানা দিতে লক্ষ্য করেছি। প্রিয়তমা যদি ভুল বোঝে তবে মৃত্যুই শ্রেয় :

চিত্তের কিছু সংবাদ না নিয়েই
তুমি যদি ভাব বিগলিত দেহে
আমি বিচলিত কামনার কলগানে,
তা' হ'লে তোমার ভুল ভাঙাবো না
অচেনা-চেনার সব আয়োজন
মানস পুতুলে নির্মাণ ক'রে যাব।
এ বিলাপ তাপে আমার মৃত্যু।

[ সহসা সচকিত : সংখ্যা ৬ ]

'উচ্চারণ' গ্রন্থের কয়েকটি প্রতিমায় মৃত্যুর উল্লেখ পাই। একটি—

আমি তোমার দু' চোখের মুক্তার কথা ভেবে
অধরোষ্ঠের কম্পিত কথার রক্তিম
সাহচর্যের চিন্তায়,
চিরকাল অন্ধকারে নিঃশেষ হতাম।।

[ উচ্চারণ : সংখ্যা ৩০ ]

কখনও কামনার আতিশয্য মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। কিন্তু আতি-শয্যের সর্বশেষ অবস্থায়ও তিনি একটি চরম আকুলতায় কেঁপে উঠবেন, তারপর ঝরে পড়বেন। নিম্নে উদ্ধৃতিটি আহরণ করা হ'ল :

এ কামনায় কোন্ অসম্ভব যন্ত্রণায়
আমি শেষ হব জানি, শুধু জানি নিঃশেষিত হবার পূর্বে একটি সর্বশেষ চরম আকুলতায় আমি অপরাহ্নের নির্জনতায় কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম ফুলের মতো ঝরে পড়বো। আমার সকল আনন্দ তখন বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে, মাটিতে মিশে যাবে এবং সময়ের গণনায় চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হবে।

[ ঐ : সংখ্যা ৩৬ ]

ঝরে পড়তেই হবে, অবশ্যম্ভাবী। এই বোধ থেকে আরেকটি মৃত্যু প্রতিমার উল্লেখ করি। প্রেম অমোঘ অনাক্রমণীয় এবং অনতিক্রম্য। মৃত্যুও অপরাজেয়। যেমন :

মৃত্যুকে যেমন অতিক্রম করতে পারি না,
তেমনি তোমাকেও নয়।

[ ঐ : ৭০ ]

মৃত্যুর পর আর কবিকে পাওয়া যাবে না পূর্বের মতো, কিন্তু পূর্বের বহু স্মৃতি-মাখা প্রিয় অঙ্গগুলি পরিত্যক্ত হাড়ের মধ্যেও ঔজ্জ্বল্য দেবে। এখানে মৃত্যুর আনুষঙ্গিক দৃশ্যমান প্রতিমারা এসেছে, সৈয়দ আলী আহসানের কাছে এই 'কবর' ও 'হাড়' প্রতিমা অসচরাচর। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ :

এরপর তুমি যখন
আমার সন্ধান করবে,
তখন আমার কবরের মধ্যে
মাথা রাখবার জন্য
একটি শুকনো হাড় পাবে,
যা একদিন আমার বাহু ছিলো।।

[ ঐ : সংখ্যা ৩৫ ]

মৃত্যু প্রতিমা সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ কবিতা তুলে ধরছি :

মৃত্যু একটি অস্তিত্বের সংশোধন মাত্র।
মৃত্যু একটি নতুন রূপের মধ্যে জাগরণ।
মৃত্যু একটি আলোর বিস্তারের মতো —
পৃথিবীর দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে
নতুন সৌভাগ্যের সত্য।
মৃত্যু একটি ইচ্ছার চিরদিনের পূর্ণতা।
কার ইচ্ছার ?

আরেকটি উদ্ধৃতি........'উচ্চারণ' গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায় মৃত্যু প্রতিমা :

আমি আসবো—
হয়তো মৃত্যুর শেষে সর্ব-বিলয়ে
একাকার হয়ে আসবো—

সে-দিনের অপেক্ষায়
আমি আজও বেঁচে আছি॥

[ঐ : সংখ্যা ৮২]

প্রেমের পূর্ণতা মৃত্যুর মধ্যে, শুধু মৃত্যুতে নয়, মৃত্যুর শেষেও আছে 'সর্ব-বিলয়' নামক মৃত্যু—সর্ববিলয়ে একাকার হয়ে দয়িতার সঙ্গে মিলন হবে—মৃত্যু তাই যন্ত্রণার অবশেষ নয়, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নয়, নয় বিলাস—মৃত্যুই প্রেমের পূর্ণতা প্রশান্তি স্থৈর্য। মৃত্যু প্রতিমা কবির কাছে প্রেমের আরেক জগত হয়ে স্ফুট; মনে রাখতে হবে নায়িকার বঞ্চনা অবহেলা অবিশ্বাস সন্দেহ থেকে মৃত্যু চিন্তার জন্ম হয়নি—মৃত্যু এখানে স্বাভাবিক পরিণতি, প্রেমের পরিপূর্ণতা ও প্রশান্তি।

সৈয়দ আলী আহসানের এই বাগৈশ্বর্য অবশেষে মননশীলতায় বেশি স্ফূর্তবাক। তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় জাগ্রতকারী ও চিত্রময় বাক্প্রতিমাবলী এক সময় মননশীলতার আশ্রয় করে, এই মননের মিশ্রণ না-হলে তিনি মধ্য-যুগের ধারার অনুবর্তনকারী রূপেই চিহ্নিত হতেন।

## চতুর্থ অধ্যায়

শামসুর রাহমানের কবিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব, তবে কবিতা সম্পর্কে ঠিক বলা নয়, কবিতার বিশ্লেষণমাত্র। 'প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' থেকে শেষতম গ্রন্থ 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা' পর্যন্ত তাঁর বহুস্তরী ও বর্ণবহুল কবিতাবলীতে তিনি কখনও সংশয়াচ্ছন্ন, কখনও বিষাদের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, কখনও মৃত্যু চেতনায় অধীর, কখনও নৈরাশ্য ও মূল্যবোধের অবনমনে হতাশাগ্রস্ত, কখনও শূন্যতা প্রবল প্রতাপে চেপে ধরে; আবার পাখি ডাকে, হ্রেষা ধ্বনিতে তুরঙ্গম ছুটে চলে, সূর্যের নিচে স্বপ্নাচ্ছন্ন বাগান জাগে এবং সেই বাগান হয় চতুর্দিকে গন্ধ ও বর্ণমনি বিভায় সমুজ্জ্বল। এই সকলের মধ্যে তাঁর কবিতা, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম পথযাত্রায় বিভিন্ন ধরনে ভালো-কবিতাই তিনি রচনা করেন, স্তরভেদে রূপপ্রতীকের দীপ্ত অন্বেষণে কখনও নিরাভরণ, আবার কখনও অলংকার-বহুল কবিতা রচনায় তিনি পারদর্শী কবি।

'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', যদিও বড়ো বেশি জীবনানন্দীয়, এই কাব্যে যে কয়টি শব্দ বাক্‌প্রতিমা নির্মিতিতে অন্ত:সলিল স্রোত নির্মাণ করেছে তারা তীব্র বেগে প্রবাহিত হয় শেষতম কাব্যগ্রন্থ অব্দি। যুগের মর্মবাণীকে আত্মসাৎ করে, তাঁর আন্তরপ্রকৃতির পক্ষে অনুকূল শব্দাবলীকে সমপ্রসারণ করে তিনি প্রতিমা নির্মাণ করেছেন; হ্রস্ব দীর্ঘ কবিতায় বহুস্তরী বহুপথগা পথের সম্ভাবনা প্রত্যাশা করেছেন, কখনও কখনও সংক্ষিপ্ত ঋজু স্বচ্ছ বাগবিস্তারে নিমগ্ন হয়েছেন। তাঁর কবিতায় সর্বাধিক ব্যবহৃত বা পুনরাবৃত্ত যে সকল প্রতিমা রূপময়, তা কয়েকটি শব্দের মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—যে সব প্রতিমায় শামসুর রাহমানের মেজাজ ফুটে ওঠে, মূলসূত্র অন্বেষণ করা যায় সেই শব্দগুলি বিষাদ, বিতৃষ্ণা, শূন্যতা, মৃত্যু, শব, করোটি, কংকাল, কবর এবং তারই পাশাপাশি আছে পাখি, নৌকা, হরিণ, বাগান, ঘোড়া, সূর্য। যে শূন্যতার সূত্রপাত 'প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যে তা 'নিজবাসভূমে'তে পেঁৗছে আরও হাহাকারমণ্ডিত। কিন্তু শামসুর রাহমান মূলত জগৎ সংসারে বিশ্বাসী—করোটিতে তিনি

জ্যোৎস্নার তীব্র সুরা পান করেন, কবর হয়ে ওঠে পুষ্প-চন্দ্রময় বাগান, লুণ্ঠিত শস্যের ঝাঁ ঝাঁ শূন্য মাঠে আবার তিনি প্রাণভরে সুদূর শস্যের ঘ্রাণ পান, প্রাচীন কংকাল অদ্ভুত শ্লোগান হাঁকে, কবরের পাশে তিনি দিতে বলেন গোলাপের চারা ; পরিশেষে শব শ্মশান উদ্যান পাখি একাকার হয়ে যায়, কারণ কবির বিশ্বাসে মৃত্যুর শেষে জেগে আছে জীবন, জেগে আছে জীবিতদের বুকে গোলাপ, ভালোবাসায় উষ্ণ এই পৃথিবী :

ফুটুক আমার ভালোবাসা ফুটুক কালো কারাগারের
দেয়াল ফুঁড়ে খুব হল্লা করে বসন্তের কাঁধে
যারা পেতেছে মেশিনগান তাদের হেলমেট
ফুঁড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক
সিগন্যালে সাইন বোর্ডে বস্তির
জীর্ণ চালায় কবরের কাঁচা
মাটিতে হাসপাতালের নিঃশব্দ
ছাদে আনন্দের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র
বিনোদের শব্দে আমার
সূর্যমুখী ভালোবাসা
নবজাতকের মতো
চীৎকার ক'রে
অম্লান ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক
আমার ভালোবাসা সবুজ পাতার মতো গান গায় গান গান গান
গান গান।

[ আমার ভালোবাসা : দু:সময়ের মুখোমুখি ]

তিনি কাব্যচর্চায় এবং কবিতার প্রতি বিনয়ী, পূর্বসুরীদের তিনি অশ্রদ্ধা করেন না, ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে গ্রহণে তিনি পরাঙ্মুখ নন, বিশ্বসাহিত্য থেকে গ্রহণেও তাঁর আপত্তি বা বিতৃষ্ণা নেই, এবং স্বীকারোক্তিতেও তিনি অকুন্ঠ চিত্ত। কিন্তু বাকপ্রতিমা, নির্মাণে তাঁর শব্দাবলী স্বল্পতম। শব করোটি (কংকাল) মৃত্যু কবর বিষাদ (বিতৃষ্ণা) শূন্যতা—এসব শব্দ আক্ষরিক এবং প্রায় প্রয়োগ অর্থেও বোদলেয়রীয়, এমন আরেকটি বহু ব্যবহৃত শব্দ (গোলাপ) রিল্কের। আর, শামসুর রাহমানের কাব্যের বিষয় হিসেবে যা-কিছু উজ্জ্বল ও শোভন, যা-কিছু উল্লেখ্য, যা-কিছু আবেগ সঞ্চারী ও

গতিশীল তার বড় অংশ জুড়ে এইসব শব্দাবলী; কিন্তু তার পাশাপাশি কতকগুলি বিরুদ্ধবাদী শব্দ, যেমন পাখি নৌকো বাগান ঘোড়া সূর্য। আবার এই দুই পর্যায়ের দুই প্রান্তিক শব্দাবলী, অর্থাৎ শূন্যতা ও করোটির পাশাপাশি বাগান ও সূর্য একাকার হয়ে গেছে—এক অসুখী জীবন ধরা পড়ে শূন্যতা বিষাদ ইত্যাদি শব্দের প্রতিমাবলীতে, আরেক সুন্দর সুস্থ জীবন দ্যুতি বিস্তার করে বাগান ও সূর্য প্রতিমা গড়নে। তাই, শামসুর রাহমানের শূন্যতা করোটি শবের উল্লাস ধীরে ধীরে এক রোমান্টিক গোলাপ বাগান নির্মাণ করে, আবার সেই গোলাপ বাগানে উষ্ণতা ও বর্ণবিস্তার করে সূর্য—সব করোটি কবর যে ক্ষত ও মৃত্যু বিস্তার করে সৌরকরোজ্জ্বলতা তাকে নিঃশেষে ধুয়ে এক অমলিন নিঃস্ব বাগান করে তোলে। কিন্তু কাব্য সাধনার শুরুতে শামসুর রাহমান অবিশ্বাসী।

নিম্নে তাঁর সর্বাধিক ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সহযোগে গঠিত একটি বাকবিস্তার সূর্য-কবর-ঘোড়া-অবিশ্বাস যে অসুখী জীবনের ঐকতান তুলেছে তার একটি আবর্তনশীল নমুনা পাঠে সেই ধারণার সমর্থন মিলবে। বস্তুত সভ্যতার সংকট থেকেই এই ভাবনার জন্ম। বাক্‌প্রতিমাবলী মননসমৃদ্ধ; সূর্য অশ্ব কবর তিনটি প্রিয় প্রতিমার উদ্ভাস লক্ষণীয়।

যতবার সেই গ'লে-যাওয়া আলো
আঁজলা ভ'রে পান করার জন্যে অধীর হয়েছি, ততবার

সূর্য 'আমার পুচ্ছে'
চাঁদ 'আমার গলায়
তোর কবর' ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছে আর
আমার সমস্ত ভালোবাসা আর্তনাদ হ'য়ে ঝরে গেছে
খুরে খুরে মাটি খুঁড়ে তোলা এক কালো ঘোড়ার পায়ে।

[ আমার স্বরের তালে : নিরালোকে দিব্যরথ ]

বিষাদ। বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পে মৃদু হাসি ও বিষাদের উদ্ভাস (ইউ-রোপীয় রেনেসাঁর) মোনালিসার বিষাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হাসি : বহু পূর্ববর্তী ধারণা। বিষাদমগ্ন এইসব চিত্রকলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষ কতো রহস্যময় (বোদলেয়র বলেছেন : বলো আমাকে রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি ভালোবাসো) বিষাদে ম্রিয়মাণ কালিদাসের যক্ষ, শ্রীমতি রাধা চিরন্তন বিষাদে মলিন, শেক্সপীয়রের হ্যামলেটকে আমরা বিষাদের অতলান্তে মগ্ন প্রথম আধুনিক মানুষ বলি, মার্চেন্ট অব ভেনিসের অ্যান্টনিও-ও

বিষাদে আতুর—আরও বেশি বিষাদ মগ্ন আড়াই হাজারেরও পূর্ববর্তী সময়ের সিদ্ধার্থ গৌতম (বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে)। তবে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে এই বিষাদ রেনেসাঁর যুগে উন্মোষিত এবং পূর্ণতা রোমান্টিকতায়—মানুষ জানতে পারলে বিষন্ন হওয়া তার একটি স্বভাব ধর্ম। বোধকরি বিষাদের হাতেই হয় সাহিত্যশিল্পীর অশ্রুহতাশা-আত্মহত্যা-উৎসর্জন। কাওয়াবাতা যখন আদর্শের জন্য আত্মহত্যা করেন তখনও মনে হয় এক অমোঘ ও সর্বগ্রাসী বিশ্ব-বিষাদ তাঁকে ডেকে নিয়েছে মৃত্যুর দিকে, দস্তয়ভস্কির নায়ক-কুলের জন্ম যেন বিষাদের গর্ভ থেকে, জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সেই ভূতে পাওয়া মানুষটি মূলতঃ বিষাদের সর্বগ্রাসী সত্তা থেকে মুক্তি পেতেই আত্মহত্যা করতে উৎসাহিত হয়—বুঝতে দেরি হয় না বিষাদের দেবী কেন বোদলেয়রকে মধুর হার্দ্য ও রমণীয় করে তোলে :

কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি ?
হও রূপসী বিষাদময়ী! অশ্রুজল
নতুনরূপে করুক তোমায় শ্রীমতী—

[ বোদলেয়র : বিষাদ গীতিকা ]

'বার-বার, বোদলেয়রের কাব্যে, আমাদের পক্ষে এই সুপরিচিত ধারণাটি ধ্বনিত হয়েছে যে কোনো নির্বিষাদ সত্তা, শুধু যে সুন্দর হতে পারে না তা নয়, পূর্ণ মনুষত্ব পায় না। 'রূপসী' ও 'বিষাদময়ী' প্রায় সমার্থক, যে নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন। সৌন্দয্য একেকটি স্ফুলিঙ্গ তিনি লিখেছেন, আনন্দে তার এক ইতরোচিত ভূষণ, কিন্তু বিষন্নতা তার মহীয়সী পত্নী। যার সঙ্গে দুঃখের কোন সম্বন্ধ নেই এমন কোনো সৌন্দর্য আমার ধারণাতীত!' প্রেমের পূর্ণতাও বিষাদসাপেক্ষ, কেননা, 'কখনো তাদের মিলন-সুখ এত মধুর হয়নি যেমন বিষাদে ও কন্নায় ভরা সেই রাত্রে—দু:খে ও মনস্তাপে পরিপ্লুত সেই সুখ' এবং এসব ধারনায় তিনি তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদের সর্বময়ী।........ কিন্তু বেদলেয়রের অন্বেষণ আরো দূরস্পর্শী মানব স্বভাবের আরো গভীরে তিনি নেমে ছিলেন। আমরা বেদলেয়ারে পাই 'মধ্য রাত্রির পরীক্ষা' বা গদ্য কবিতা 'রাত একটাতে'-র মতো রচনায় নিজের প্রতি ক্ষমাহীনতা; পাই, যেমন বিশ্বমানবের মর্মপীড়া থেকে

চিত্রল। আবার, 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থের বিরল প্রতিমার প্রভাব 'দু:সময়ে মুখোমুখি' গ্রন্থে কিছু কিছু বর্তিত হয়।

এই বিষাদ থেকে বিতৃষ্ণার জন্ম, বিতৃষ্ণা পরিণত হয় নৈ:সঙ্গ্যে, নৈঃসঙ্গ্য শূন্যতায় অবসিত। এই যুগের মানুষের মতো কবি আর নিসর্গের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে অনিচ্ছুক। যদিও তিনি নাগরিক কবি, যদিও বাগান ও গোলাপ তাঁর একটি প্রিয় বাক্‌প্রতিমা, একসময় দেখি বাগানও (পার্ক) কবির অসহ্য হয়ে উঠেছে, অথচ শামসুর রাহমান নগরেই গোলাপ বাগানের স্বপ্ন দেখেছেন। এই বোধ থেকে নিম্নোক্ত উপমায় দেখি বাক্‌-প্রতিমাগুলি কেমন উজ্জ্বল—বৃষ্টির আঁচড় প্রতিমার মধ্যে যে গতিবেগ, বস্তুত সমগ্র উদ্ধৃতিটিই গতিবেগে উচ্চালিত, কিন্তু নৈ:সঙ্গ্য পরিশেষে সমস্ত কিছু ম্লান করে দেয়, এমনকি অগ্রজ কবির মন্ত্রণায় (নিসর্গকে ভালোবেসে) বৃষ্টির জানুতে মাথা রেখেও আজ আর তৃপ্তি নেই, এই সঙ্গে 'ইঁদুরের মতো সদাই ধাবমান' বাক্‌প্রতিমা অনুভূতিহীন পলায়নপরতাকে মূর্ত করে তুলেছে —এই নৈ:সঙ্গ্য ভয়াবহ :

অগ্রজ কবির মন্ত্রণায় নিসর্গকে তীর্থভূমি
জ্ঞানে দ্রুত যতোটা এগোই তারও বেশী
নিশ্চিত পিছিয়ে পড়ি বিতৃষ্ণায়, আর চিরকেলে
বর্ষার জানুতে মাথা রেখে বড়ো ক্লান্ত লাগে।
চোখে-মুখে একরাশ বৃষ্টির আঁচড় নিয়ে ঐ স্নিগ্ধশ্যাম
পার্ক ছেড়ে চলে যাই, বিরক্তিতে ভরপুর, অস্তিত্বের
শীর্ষে ক্লান্তিহীন।

বৃষ্টির ঝরঝর ব'য়ে ইঁদুরের মতো
সদাই ধাবমান, নৈ:সঙ্গ্যের কাঁটায় জর্জর।

[ বৃষ্টির দিনে : বিধ্বস্ত নীলিমা ]

শূন্যতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৈ:সঙ্গ্যস্পৃহা, নিখিল নাস্তি ও শূন্যতা বাংলা-সাহিত্যে ক্লাসিক বৈদগ্ধ্য আনয়ন করেছে, কঠোর অধ্যবসায়ে তিনি কবিতার আঙ্গিকে ও শব্দপ্রকরণে এবং পরিশেষে নাস্তিদর্শন গ্রহণ করেছেন সম্ভ্রান্ত সাহসে—স্থাপত্যধর্মী তাঁর কবিতা বাংলা-সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে তাঁর হাতেই পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাঁর বিখ্যাত 'উটপাখী' কবিতায় ধূ ধূ মরুভূমির বন্ধ্যাত্ব, ছায়াহীন ঊষর পৃথিবী এবং

'নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ' ঘোষণা করে নিখিল নাস্তির কথা—চতুর্দিক শূন্য, চতুর্দিকে শূন্যতা হা হা করছে। তাঁর 'শূন্যতা'র বাক্‌প্রতিমা অতুল বৈভবমণ্ডিত :

> কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি;
> ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
> আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
> নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
>
> [ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : উটপাখী ]

শূন্যতার পূর্ব ইতিহাস বাংলা-সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাংলা ভাষার কোথাও এই নিদর্শনের সঙ্গে তুলনীয় কোন পঙক্তি জীবন দর্শনের গভীরতায় এত উজ্জ্বল করে ধরা পড়বে না। আধুনিক সাহিত্যে, সুধীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেও শূন্যতার এমন সর্বগ্রাসী রূপ কবিতা বা সাহিত্যের অপরাপর শাখায় মিলবে না; এইপথে তিনি নিঃসঙ্গ যাত্রী। শামসুর রাহমান শূন্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে চান, বলতে চান সবকিছু শূন্য, পৃথিবীতে অন্যায় যুদ্ধ অসঙ্গতি হানাহানি স্বৈরাচার নারীত্বের অবমাননা দেখে দেখে কবি অবিশ্বাসী পথে নিরুদ্দিষ্ট, কিন্তু বিশ্বাস অবশেষে তাঁকে হাতে ধরে ফিরিয়ে আনে। অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী শামসুর রাহমান নিম্নরূপ :

> ক. মুছে গেলো দৃশ্যাবলী চারিদিকে, অনন্তর একা
> আমি আর অকূল শূন্যতা।
>
> [ সুন্দরের গাথা : প্রথম গান, দ্বিতীয়...... ]

> খ. দেখেছি পেছন ফিরে গণ্ডগ্রাম হয়ে উজাড়
> চোখের পলকে আর শহরেও মড়কের নৃত্যনাট্য
> দেখেছি. পূজার
> মণ্ডপ এরা শান্ত মসজিদে জ্যোৎস্না ডেকে যায়
> হা-হা স্বরে
> শূন্যতায় অথচ কোথাও কোনো লোক নেই ঘরে।
>
> [ নিজস্ব সংবাদদাতা : নিরালোকে দিব্যরথ ]

গ. যেন মৃত্যুর অকস্মাৎ এ শহরে সব কটি ঘরে
দিয়েছে বাড়িয়ে হাত, শহরের প্রত্যেকটি ঘড়ি
হয়েছে বিকল আর শোক পালনের মতো কেউ
এখন কোথাও নেই। ভয়ানক নৈ:শব্দ্যের ঝড়ে
শহর-ময়ূর বুকে একটি কাঁকড়া শুধু তড়ি
ঘড়ি যাচ্ছে ঠেলে ঠেলে ক্রমাগত শূন্যতার ঢেউ।

[ ডাকছি : নিজ বাসভূমে ]

ঘ. হাড় নাড়ে মাঝে-মধ্যে ফুর্তিবাজ প্রহরে কখনো
ধুলায় গড়ায়। কখনো সে
শূন্যতাকে সাজায় চীৎকারে।

[ পথের কুকুর : বন্দী শিবির থেকে ]

ঙ. শূন্যে গাছ, শূন্যে টেলিগ্রাফ তার, ভুরুর সাঁকোয়
ক্ষুধিত পাখিরা শুধু নিরুপম সূর্যাস্তকে খায়
নি:সঙ্গতা অবিরাম আমাকে গভীর করে চায়।

চ. তোমারই উদ্দেশে
আমার হৃদয়ে অন্তহীন শোভাযাত্রা
শূন্যতায়, জড় আর চৈতন্যের মধুচন্দ্রিমায়।

[ কেন তুমি : ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ]

উপরোক্ত ছ'টি উদ্ধৃতি ছয়টি গ্রন্থ থেকে আহরিত। শূন্যতা পৃথিবীর দৃশ্যাবলী গ্রাস করে, আবার শহরে চলে মড়কের নৃত্যনাট্য এবং মণ্ডপ মসজিদ জ্যোৎস্নালোকের শূন্যতায় হা-হা করে, কালের চত্বরে হাত-পা ছুঁড়ে অভিযান মেলে দেয় নিখিল শূন্যতা, মৃত্যুর বাড়ানো হাতের নিচে শহরের প্রত্যেক ঘড়ি অচল এবং শহরমরুর বুকে একটি কাঁকড়া ক্রমাগত শূন্যতার ঢেউ ছড়ায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরে কুকুরের চীৎকার মূলত শূন্যতা রাষ্ট্র করে, এমনকি কবিতার উদ্দেশে যে অন্তহীন যাত্রা তাও শূন্যতার দিকে। এইসব বাক্‌প্রতিমা শামসুর রাহমানের বিশেষ মানসভঙ্গীকে ব্যক্ত করে, কারণ স্বকালের মানসিকতায় কবির মনন গড়ে উঠেছে, আধুনিক পৃথিবীর সমস্যায় পীড়িত হয়ে কবি বিষণ্ণ নেতিবাদ দর্শনে আকৃষ্ট, মালার্মের নেতিবাদী জীবনদর্শন ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নঞর্থক জীবনবাদ শামসুর রাহমানে সংক্রমিত; আর এইসব বাক্‌প্রতিমায় পূর্বসূরীদের মতো তিনি স্বল্পভাষ ও

ব্যঞ্জনাময় শৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এই শূন্যতায় তিনি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে পারেন না, তাই শূন্যতা তাঁর কাছে শূন্যতাগত নয়, শূন্যতা তাঁর কাছে গভীর অর্থবহ ও পূর্ণতারই একটি দিক; এইজন্যই তিনি শূন্যতার মধ্যে পুষ্পচন্দ্র দেখতে পান।

১. আমার জীবনে নেই তৃপ্তির গৌরব, আর আমি
অর্থ খুঁজি চক্রে চক্রে, সমর্পিত মহাশূন্যতায়।

[ অপাঙক্তেয় : প্রথম গান, দ্বিতীয়...... ]

২. হোক না কঠিন কপি পরস্পর, কী-বা আসে যায়
রকবাজ সন্তদের ভীড়, ওহে, কী-বা আসে যায়
প্রাণপণ হেঁকে বলো শূন্যতায় কীবা আসে যায়।

[ শনাক্ত পত্র : রৌদ্র করোটিতে ]

৩. নিভে তার রাজ্যের জড়তা
জুড়ে থাকে সারাক্ষণ, শব্দের জগৎ করে ধূ ধূ
অবিশ্বাস্য শূন্যতায়। কখনও
মরীচিকা চোখে তার আশার ঝালব বুঝি আনে

[ পিতাপুত্র : নিরালোকে দিব্যরথ ]

৪. তখন আমার বড়ো ভয় করে আর হাৎড়ে মরি
ক্ষমাহীন শূন্যতায় কবিতার কতো নিরুদ্দেশ
শব্দাবলী।

[ ঐ ]

৫. আবেগের পালতোলা নৌকোর গলুইয়ে রাত জেগে
কাগজের শুভ্রতায় নক্ষত্রপুঞ্জ আনি
শূন্য ছেনে।

[ সমান্তরাল : ঐ ]

উপর্যুক্ত সব ক'টি প্রতিমা চিন্তা, আবেগায়িত চিন্তা, বোধির ফসল; জীবন দর্শনের ফলশ্রুতি। প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে একটি পূর্ণ বাক্‌প্রতিমা, বলা যায় এখানে মহাশূন্যতায় সমর্পিত হয়েও কবি শূন্যতার অর্থ অন্বেষু। দ্বিতীয় প্রতিমায়, রকবাজ সন্তরা জীবন ধারণের তীব্র গ্লানিতে মগ্ন হয়েও শূন্যতাকে প্রাণপণ হেঁকে জীবন থেকে বহুদূরে পার করে দেবেন। তৃতীয় ও চতুর্থ

উদাহরণে পাই কবির শব্দের জগতে মরুভূমির শূন্যতা; কিন্তু কবি শূন্যতায়ও শব্দ অনুসন্ধান পর, শব্দের জগৎ যতই মরুভূমিময় হোক সেখানে অন্তত মরীচিকা ঝলমল করে—আশ্রয় দীপ্ত শপথ জাগে। সুধীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি 'ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অসার পটভূমি। সবই সেথা বিভীষিকা এমন কি বিভীষিকা তুমি'—অসার পটভূমিকায় প্রেয়সীও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। কিন্তু শামসুর রাহমান পঞ্চম উদ্ধৃতিতে বলেন, শূন্য আকাশ থেকেই তিনি কবিতার শব্দাবলী গভীর তন্ময়তায় আহরণ করেন, যে সব শব্দাবলী কখনোবা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল ও শাণিত।

মৃত্যু আরেকটি প্রতিমাগুচ্ছ যা শামসুর রাহমানকে বিচলিত করেছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে। মানুষ শুধু তার ব্যক্তিগত কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয়, সমস্ত মানব সমাজের জন্য সে দায়িত্ববদ্ধ—এই দায়িত্ব পরিহার করা অসম্ভব, মুক্তি পাওয়া সম্ভব-রহিত, কারণ তাঁকে প্রতি মুহূর্তের কর্মধারায় সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত হোক, তাকে একটি পথ নির্বাচন করতে হয়, এই নির্বাচন তাঁর একার জন্য নয়, সকলের জন্য—এর থেকে মুক্তি অসম্ভব। জাঁ পল সার্ত্রে এর নামকরণ করেছেন কমিটমেন্ট (এনগেজমেন্ট), এই দায়িত্ববোধের অন্য নাম উদ্বেগ (এ্যাংগুইশ)। অস্তিত্ববাদী দর্শনের আস্তিক দলের (অন্য দলে আছেন নাস্তিকরা, অর্থাৎ জাঁ পল সার্ত্রে নাস্তিক দলের গুরু) হাইডেগার এই কথাকে বলেছেন—মানুষ তার নিজেকে (নিজের অস্তিত্ব) অনুভব করতে চায়, অনুভবের মধ্যে নিজেকে পেতে চায়, অর্থাৎ উপলব্ধি করতে উদ্বিগ্ন। হাইডেগার তাই বলেছেন অস্তিত্বের এই উদ্বেগ (এ্যাংগুইশ) থেকেই অন্য সকল উদ্বেগের জন্ম; আবার সকল প্রকার উদ্বেগ ধাবিত হচ্ছে মৃত্যুর উদ্বেগের দিকে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা/যাতনা শুধুই যাতনা সুচির সাথী'। আর শামসুর রাহমানের মৃত্যু ভাবনা :

১. জীবনের সব কথা জানা হবার আগে হয়তো মৃত্যু হবে,
একথা কখনো জানবে না তবু মৃত্যু হবে।

[ আত্মজীবনীর খসড়া : প্রথম গান, দ্বিতীয়...... ]

২. অসার রিক্ত মৃত্যু সদাই
জীবনের বল্লভ।

[ কয়েকটি স্বর : নিরালোকে দিব্যরথ ]

৩. মৃত্যুর ক্ষুধার্ত মিশমিশে নিস্তব্ধতা আমাকে গ্রাস করে।

[ আমি কী করে কাজ পাবো : ঐ ]

৪. বহুদিন থেকে
মৃত্যু পেয়ে বসেছে আমাকে।
পাওয়াটা বিচিত্র নয়, জীবনের প্রতিটি বছর কমশম
মৃত্যুর তুহিন গন্ধে ভরপুর। তাইতো মাংসের অন্তরালে
ব্যক্তিগত হাড় সব কখনো সবুজ হয়, কখনো-বা নীল।
ফ্যালফ্যাল দেখি চেয়ে, মৃত্যুর পাথুরে ধলা স্তন
পান করে করে
কী এক সৌন্দর্য বাড়ে ক্রমাগত নানা বিন্যাসে লোকায়তিক।

[ আমি হই বর্তমান : ঐ ]

৫. আর মৃত্যুকে অমোঘ
জেনেও স্বপ্নে পথে, জেনেও আমার
পৃথিবীতে খুঁজি
জীবনের দান গানে গানে, প্রাণলোকে
খুঁজে ফিরি অপমৃত সুন্দর ছবি।

[ সূর্যাবর্ত : রৌদ্র করোটিতে ]

৬. আমার সত্তায়
বাজে নীলিমার স্তব, আকাশের আকুল সাহারা
চষে চষে কী বেল কী জুঁই
প্রত্যহ ফোটাতে চাই বুঝি না কিছুই। নীলিমায়
প্রপেলর গুঞ্জনে মৃত্যুকে ভুলে থাকি প্রহরে প্রহরে।
না, আমি কখনও আর নীচে নামবো না,

[ একজন পাইলট : বিধ্বস্ত নীলিমা ]

৭. ভেবো না আমার কথা, অন্তত গোলাপ পাখি আর
বেড়ালের কথা মনে রেখে এই তরুণী প্রহরে
যেও না যেও না তুমি মৃত্যুর গহ্বরে।

[ যদি তুমি : ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ]

৮. তোমরা নিহত যারা তাদের উদ্দেশে আজ মর্শিয়ায়
কালো করবো না চতুর্দিক, কেঁদে ভাসাবো না বুক।
তোমরা তো স্তব
এখন পবিত্র
স্তোত্র কণ্ঠে কণ্ঠে
জীবিতের চেয়েও তোমরা বেশী জীবন্ত, এখন।
তোমাদের
রক্তসেচে আমাদের প্রত্যেকের গহন আড়ালে
জেগে থাকে একেকটি অনুপম ঘনিষ্ঠ গোলাপ।

[ রক্তসেচ : ঐ ]

প্রথমোক্ত প্রতিমায় মৃত্যু অতল রহস্যময়, জীবনের সব কথা জানার আগে মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য—মৃত্যুর অমোঘ বিস্তার বা চিরন্তনতার প্রকাশ। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মৃত্যুই ধ্রুব সখা, জীবন বল্লভ। ('মরণ রে/তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান : রবীন্দ্রনাথ)। তৃতীয় প্রতিমায় কবির দিকে মৃত্যুর আগ্রাসী রূপ মিছিল করে আগুয়ান। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে মৃত্যু প্রতিমা বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়, মৃত্যুর তুহিন গন্ধ ছুটে আসে, মৃত্যুর কপিস ছোবলে জীবিত মানুষের হাড় কখনও সবুজ (জীবনের ইঙ্গিত) কখনও বা বেদনায় নীল (নীলকন্ঠ শিবকে স্মর্তব্য), আবার মৃত্যুকে কবি নারীরূপে কল্পনা করেছেন, মৃত্যুর ধবল পাথুরে স্তন পান করে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য স্ফূরিত (বোদলেয়রের মতো অপ্রতিরোধ্য কামের দ্বন্দ্ব, শক্তি)। পঞ্চম প্রতিমায় কবি আরও বিশ্বাসী, আরও ঋজু, আরও মননশীল—মৃত্যু অমোঘ, কিন্তু জীবনের দান গানে গানে অন্বেষণযোগ্য, অপমৃত সৌন্দর্যকে জীবন দান করতে হবে। ষষ্ঠ প্রতিমায় একজন আকাশচারী (কবির স্বাধীন সত্তা) বেল কিংবা জুঁই কিছু ফোটাবেন না, কিন্তু মৃত্যুকে তিনি ভুলে থাকেন, কেননা নিচের পৃথিবীতে মানুষ মৃত্যুর নিষ্ঠুর খেলায় মগ্ন—একজন সৈনিক বৈমানিকের অনিবার্য মৃত্যু প্রতি পদক্ষেপে ঝরছে, তবুও বেঁচে থাকা স্বল্প সময়টুকুতে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মেঘলোকে যুবরাজ হয়ে থাকবেন (তুলনীয়, বোদলেয়রের কবি সত্তা : আমি ভালোবাসি মেঘ...... চলিষ্ণু মেঘ....ঐ উঁচুতে......ঐ উঁচুতে......। আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল। অথবা শেলী ও ওয়র্ডসওয়ার্থের স্কাই লার্ক তুলনীয়, স্কাই লার্ক কবি সত্তার প্রতীক।) সপ্তম প্রতিমায় কবির কাছে মৃত্যুর চেয়ে গোলাপ ও পাখি

অধিক কাম্য, তাই কবি নিরুপমাকে গোলাপের শপথে আত্মঘাতী হতে সনির্বন্ধ নিষেধ করেন; লক্ষণীয় গোলাপ ও পাখির পাশে বেড়ালের প্রতিমা কেমন প্রিয় অনুষঙ্গ সৃষ্টি করছে। সর্বশেষ প্রতিমায়, যুদ্ধে নিহত মৃত একেকজন দেশবাসীর জন্য জীবিত মানুষের সত্তার জেগে ওঠে 'একেকটি অনুপম ঘনিষ্ঠ গোলাপ'—সেই প্রিয় সৌগন্ধ—গোলাপ, জীবনের আশ্বাসে সিক্ত লাল গোলাপ—মৃত্যুও মহিমময় হয়ে ওঠে। যাঁরা শামসুর রাহমানের কোন একটি কাব্যের কবিতার সঙ্গে সামান্য পরিচিত তাঁরা বুঝতে পারবেন মৃত্যু প্রতিমা কেমন অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে কবিকে আচ্ছন্ন করে আছে, এবং তাঁর কবিতাবলীর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ হবেন ততই মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌঁছবেন—'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা' অনিবার্যভাবে স্মৃতি পথে দাঁড়ায়।

শব, বিনষ্টি, কবর, করোটি শব্দ-চতুষ্টয় শামসুর রাহমানের কবিতায় চৈতন্যের আর একটি স্তরে পৌঁছার সিঁড়ি। এইসব আবেগবাহী শব্দমালা ফরাসী প্রতীকিবাদের কথা স্মরণ করায়, এইসব শব্দাবলী মানবচিত্তে আবহমান কাল ধরে আর্তির মনস্তাপের যন্ত্রণার উদ্বোধন করে আসছে; বস্তুত এই যন্ত্রণা থেকে বিষাদের দিকে যাত্রা, কিংবা বিষাদ থেকেই মৃত্যুর নিবিড় বুকে আশ্রয় প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে—উভয় দিক থেকে যাত্রা করা সম্ভব, আবার উভয় দিক থেকে শেষের পথ দর্শনযোগ্য।

শব। শব প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্টির প্রতিমাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অন্যথায় চৈতন্যের মাল্যরচনা সম্ভব নয়, এবং এইজন্য মিছিল করে আসে কবর ও করোটির আচ্ছাদিত অনুষঙ্গ। মানব স্বভাবের মর্মে প্রোথিত যে দু:খ তার জগৎ থেকে মানুষের নিস্তার কিংবা পলায়ন অসম্ভব। শামসুর রাহমানের এই 'দু:খ' প্রতিমাও বিশেষভাবে আলোচ্য-বিষয় হতে পারে। এই প্রসঙ্গে 'রৌদ্র করোটিতে, গ্রন্থের 'দু:খ' কবিতার প্রতিমা শৃঙ্খল দৃষ্টান্ত হোক। দু:খ নামক এই পুঞ্জীকৃত প্রতিমার ধর্ম হচ্ছে দু:খকে বহুর মধ্যে একক করে অধিষ্ঠিত করা, প্রাত্যহিক জীবনের সমস্তকিছুর মধ্যে উল্লেখ করে বিষয়টির বৈচিত্র্যময়তা ও বর্ণাঢ্যতা প্রসারিত করা। কিন্তু শামসুর রাহমানের দু:খবেদনা দুর্বল—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দু:খবাদ ও মৃত্যু চেতনা গভীর ও হাহাকার মণ্ডিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অলীক ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন :

> তৃষিত বালুতে,
> সদগতি-সৎকারহীন তাহাদের শব
> শকুনির ভোজ্যমাত্র ?

তাহাদের ক্ষয়িষ্ণু কংকাল
সর্বংসহা ধরণীর বর্ধমান জঞ্জালের বোঝা ?

[প্রশ্ন : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

অথবা,

আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু
মার্গে শবপরিচিতি, বিনাভাষ্যে বলো তারে, সখা,—
জগতের কোনও কাজে লাগেনি এ অখ্যাত গতায়ু,
যায়নি অনাথ ক'রে কোনও মৌন হৃদয়-অলকা ॥

[অকৃতজ্ঞ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

সুধীন্দ্রনাথের শব অনাম, পরিচয়হীন; কারণ তিনি নাস্তিগর্ভ প্রাক্তন তিমিরে স্বতন্ত্র সত্তার ক্রমাগত বিনষ্টিই লক্ষ্য করেছেন, ইন্দ্রিয়বোধের ক্ষয়ই লক্ষ্য করেছেন এবং তাই কবি বলেন 'কণিকাও নহি আমি; চরাচর লুপ্ত সে-কল্লোলে'। শামসুর রাহমানের শব সেখানে আতরে-গোলাপে সুগন্ধশ্রাবী; এইসব শীর্ণ শব প্রভু যিশুর ক্রুশকাঠ বহন করে কবরের দিকে গতিমান এবং কখনও কবির শবদেহ কবির চোখে ভেসে ওঠে।

পৃথিবীর রূপরস লুপ্তকারী শব প্রতিমা :

বিকৃত দেহের ক্ষত, লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে,

[ নাম কবিতা : প্রথম গান, দ্বিতীয়.... ]

আমাদের সন্তানের দোলনা দুলছে মৃদু ছন্দে
অসংখ্য লাশের যম-তাড়ানিয়া উৎকট দুর্গন্ধে।

[ কী যুগে আমরা করি বাস : নিজ বাসভূমে ]

শব শুধু শব নয়, ক্রুশকাঠের স্মৃতি-অনুষঙ্গ-পুণ্য বহন করে শবের মিছিল চলে। এই আলোড়ন আন্দোলন-মুখী শবযাত্রা বাগৈশ্বর্যে চিত্রময়-তায়, গতিশীলতায় সুন্দর, নৈ:শব্দ্যে শূন্য।

আমার চৌদিকে দেখি ক্রুশকাঠ নিয়ে যাচ্ছে ব'য়ে
মুখ বুঁজে কয়েকটি শীর্ণ শব,

[ স্বগত ভাষণ : রৌদ্র করোটিতে ]

উপরে বর্ণিত শব মননজাত (হয়ত অলীকও) কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত, প্রথম পর্যায়ের চরাচর লুপ্ত গন্ধবাহী লাশ এখন আর নয়, কবি এবার নিজের শবদেহ নিজে দেখতে পাচ্ছেন ; এমনকি কবিখ্যাতিও কবির দৈহিক মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম, হয়তো কবিখ্যাতিও একদিন পৃথিবী থেকে মুছে যাবে :

পুঁথির তুলোট পাতা আকাঙ্ক্ষার শব্দটাকে কখনো পারে কি দিতে চাপা ?

[ সম্পাদক সমীপেষু : রৌদ্র করোটিতে ]

ধীরে ধীরে কবি এক বিশেষ সময়ের আলোর উদ্বর্তনে উপস্থিত, আন্দোলন, যুদ্ধ, স্বৈরাচার নিজবাসভূমিকে শ্মশান বানিয়ে তুলেছে, 'কবরস্তানে আর লাশ রাখার জায়গা নেই, প্রিয় লাশ রাখবার যোগ্য স্থান কই ? 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?' কবিতার মাত্র ছয়টি অনুভূতিময় বাক্প্রতিমা এই ছোটো কবিতাকে অবলম্বন করে আছে। এই কবিতার মূল প্রতিমা লাশ। লাশের অনুগামী, সহগামী প্রতিমাবলী চিত্ররূপময়, কখনও সেই প্রতিমা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উন্নত করে তোলে, আবার সমুদ্রের চিত্ররূপময় প্রতিমা আমাদের ধ্বনিগাম্ভীর্যের বার্তা শোনায় :

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?
তেমন যোগ্য সমাধি কই ?
মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর জল—
সবকিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাইতো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।

[ এ লাশ আমরা : নিজ বাসভূমে ]

এই অনুভূতি থেকে স্বাধীনতার জন্য, আর বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা আসে সংখ্যাতীত লাশের উপর পা ফেলে। এখানে স্বাধীনতা শব্দের উপর মানবিক চেতনা আরোপিত, ইংরেজিতে এসব প্রতিমা 'পার্সনিফিকেশন' এবং 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি'র শ্রেণীভুক্ত :

তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের ওপর।

[ তোমাকে পাওয়ার জন্যে : বন্দী শিবির থেকে ]

আবার বিপরীত এক অনুভূতি থেকে এই শব বা লাশ প্রতিমা পুষ্পিত হয়ে ওঠে। এই লাশ প্রিয়জনের, এই লাশ লুকানোর মতো মাটি বা কবর পৃথিবীতে নেই, তাই এই লাশ আর শুধু গলিত মাংসের নয়—সভ্যতার সংকটজাত এই প্রতিমাবলী শামসুর রাহমানকে উদ্বেল করে। এই পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমাগুলি চিত্ররূপময় এবং চক্ষু থেকে মনের গহন পর্যন্ত পীড়িত করে, বিশ্বাসের নাক্ষত্রিক মৃদু আলো জ্বলে ওঠে, কেননা জীবনের ক্লেদে এবং পচনশীল লাশের উপর কুসুম ফুটবে :

১. নিয়ন আলোর মতো কারুর হাসির শত কণা
জাগায় স্মৃতির শব, হাড়হিম দেহে লাগে তাপ।

[আত্মহত্যার আগে : রৌদ্র করোটিতে]

২. হতে কি পারে না তার বিনষ্ট শরীর ওই দূর
আকাশের পাখিদের মতো ফের সহজ সুন্দর?

[দুপুরে মাউথ অর্গান : ঐ]

৩. কোথায় এলাম আমি? পোড়া চোখে একি দেখলাম
যেদিকে দু চোখ যায় শুধু শব, কার কিবা নাম
জানি না কিছুই; নয় এরা শব নয়; রাশি রাশি
ভারা ভারা গলিত ফসল যেন।

[না, আমি উন্মাদ নই : দুঃসময়ের মুখোমুখি]

এইসব বাগৈশ্বর্যে কবির সুন্দর জীবনের প্রতিভাস চিত্রিত, জীবনের জয়গানে কবি আস্থাশীল হয়ে উঠেছেন; আরো লক্ষণীয়, লাশের পাশাপাশি পাখি এবং ফসলের চিত্র কেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কবর। মৃত্যুর পর মানুষকে যেতে হবে কবরে, মাটির নীচে। মুসলমান ও খৃষ্টীয় বিশ্বাসে অন্ত্যেষ্টি প্রথার প্রচলন নেই। দগ্ধ হলে মৃতদেহের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না; কিন্তু কবরের তলায় দেহের পচনশীল মাংস, মাংসভুক কৃমিকীট, অস্থি-কংকাল-করোটি দুর্মরভাবে মিছিল করে আসে; টিকে থাকে অস্থি-করোটি। কবর তাই মৃত্যুর আবহ সৃষ্টিতে ও স্মৃতি বিস্তারে, কবিমানসে যুগ-যুগ ধরে এক অতল রহস্য ও দীপ্তি বিস্তার করে আছে। কবর অর্থ বদ্ধ পরিবেশ, দরোজা-জানালা-বায়ুহীন অবরুদ্ধ স্থান। আর, পৃথিবী এখন কবিদের চোখে ও মননে বাস-অনুপযোগী হয়ে গেছে (রোমান্টিক কবিদের মতে তো বটেই); এই যুগ বা শতকে মানুষ আসলে

মৃত্যের শামিল, এক চাপা শ্বাসরোধকারী পরিবেশ শিল্পীসত্তাকে চূর্ণচূর্ণ করে যন্ত্রণাময় কারাগারে নিক্ষেপ করছে—কবর তারই রূপক। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বই কবির কাছে একটি অতিকায় গোরস্থান। শামসুর রাহমানের কাছে স্বাভাবিকভাবে কবর প্রতিমা অর্থবহ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বেই বলেছি শামসুর রাহমান নঞর্থক জীবনবোধে বিশ্বাসী নন, এই জন্য কবর ধীরে ধীরে পত্র-পুষ্প-জ্যোৎস্না-বাগান-এ পল্লবিত হয়ে ওঠে—জীবন হয় নিশ্চিত আশ্বাসময়—কবির প্রথম গ্রন্থ 'প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যে 'কবর খোড়ার গান' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করি :

> শরিফ কেউ-কেটা কী করে চিনি?
> মাটির নীচে পচে অন্ধ গোরে
> হয়তো সুন্দরী কুরূপা কেউ।
> কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি।

[ কবর খোড়ার গান : প্রথম গান.... ]

অন্ধ গোর, সুন্দরী বা কুরূপা নারী—এই দুটি দৃশ্যমান প্রতিমা ; কবরের নীচে শরিফ হলেও আলাদা মর্যাদা নেই—একই বিনষ্টির দিকে মানবদেহ ধাবিত। প্রতিমাগুলো দৃশ্যমান এবং একটি চিরন্তন সত্য এখানে সমুজ্জ্বল। এমনই একই বাগবিস্তার 'রৌদ্র করোটিতে' গ্রন্থের 'যখন রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় মেলে। এই ভাব 'আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতায় চকিতে উদ্ভাসিত। নিম্নোধৃত বাক্‌প্রতিমা দৃশ্যানুভূতিক। কবরের দুর্বিনীত ফুলে, সেঁজার আপেলে, ব্রাকের মাছে গন্ধানুভূতি আর বেহালায় শ্রবণেন্দ্রিয় হয় তৃপ্ত।

> ........গলির অন্ধ বেহালাবাদক
> ব্রাকের সুস্থির মাছ, সেজাঁর আপেল জানে কতো
> সহজে আমাকে, জানে কবরের দুর্বিনীত ফুল।

[ আত্মপ্রতিকৃতি : রৌদ্র করোটিতে ]

পরবর্তী গ্রন্থ 'বিধ্বস্ত নীলিমা'। স্মর্তব্য কবির প্রিয় একটি শব্দ বাগান, এবং এই গ্রন্থে বাগান ও কবর একাকার। কবরের সঙ্গে বাগানের একটি আত্মিক যোগ আছে, খ্রীষ্টীয় আচার রীতিতে (জীবিত মানুষের যেমন) প্রিয় সন্নিধানে যেতে ফুল ও ফুলমালা একটি প্রিয় উপকরণ, তেমনি মৃত স্বজনের কবরে যেতেও ফুলের প্রয়োজন—ফুল যুগপৎ আনন্দ ও

বেদনার ভাষাকে বাগ্ময় করে। কিন্তু শ্বাপদ পৃথিবীতে ফুলের নয়নাভিরাম বাগান চূর্ণ ও বিবর্ণ, বিনষ্ট অপ্রতিরোধ্য; ঘৃণায় নয়, কবিতায় সৌন্দর্য কবরে পচে, অবিরাম/উদভ্রান্ত ভিখিরী হয়ে ঘোরে মনীষার মন্বন্তরে'। আবার 'বামনের দেশে' কবিতায় নবীন গোষ্ঠির কবিদের বলতে শুনি; 'কবরের ধূলিকে বানাই/নক্ষত্রের ফলা', কিন্তু ছায়ামৃত্যু-কবরের গান গেয়ে নিজেরাই 'নষ্ট বাগানের/ভ্রষ্ট কিছু পাখি/কবরখানার গান গেয়ে গেয়ে নিজেরাই ছায়া হয়ে যায়'। পরবর্তী আরো কয়েকটি প্রতিমা মিছিল করে জানায় সেখানে গেলেও পরিত্রাণ নেই, বস্তুত তখন নিজেই নিজের হৃদয়ের খাদ্য, স্বেচ্ছা নির্বাসনেও মুক্তির পথ রুদ্ধ, এমনকি গন্তব্যস্থানও অনির্দেশ্য :

> অতল নিশ্চিত তারা লোকালয় ছেড়ে
> কবরখানায় খোঁজে স্বেচ্ছা নির্বাসন
> বস্তুত নিজেরাই অগোচরে।

[ বামনের দেশে : রৌদ্র করোটিতে ]

কবর আর শব-এর জন্য উল্লেখ্য, এই বিশ্বাস প্রসূত, আরেকটি কবিতা 'শবাহারী কীটের কোরাস' ( নিরালোকে দিব্যরথ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত )। আরেকটি কবিতা 'পোড়ো বাড়ি', যে মগজ একদিন প্রাধান্য বিস্তার করেছে কাব্য ক্ষেত্রে সেই নজরুলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রবেশ করেছে বিনষ্টির পোকা (এই মানব ভাগ্যকে অতিক্রম অসম্ভব) : 'কবরের সব বিশীর্ণ বাসিন্দা যেন মাটি ফুঁড়ে ভিড় করে আসে,/মগজ হননে মত্ত নষ্ট কোষে ভয়াল মাকড়সা'। যে বস্তুময়তার অভিঘাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কবর-করোটি-কংকাল ইত্যাদি প্রতিমা এই ভয়াল প্রতিমাগুলো ধীরে ধীরে মননে পৌঁছে গেছে। এই কয়েকটি বাক্‌প্রতিমাতে যে বিস্তারধর্মিতা, পাঠক সহজে বুঝতে পারবেন শামসুর রাহমানের কবর বাগান-ঘাষ-হাওয়া-কংকাল কেমন। কবর, সুরভিত ফুলের কবর যদি হয় এই শহর :

> সারাটা শহর যদি কেউ দিত ঢেকে
> অজস্র সুগন্ধি ফুলে, তবে দুটি হাত গোপনে লুকিয়ে
> রাখতাম সুরভিত ফুলের কবরে সর্বদাই।

[ পুলিশ রিপোর্ট : নিজ বাসভূমে ]

ব্যক্তিগত কবর গণ-কবরে রূপান্তরিত, কবরের ঘূর্ণচক্র :

প্রতিদিন ঘন ঘন দেখছি কবর, এখনো তো।
গণ কবরের খাঁ খাঁ প্রতিবেশ সত্তা জুড়ে রয়।
শরীরের নির্জন হারেমে
বেড়ে ওঠে বুনো ঘাস। খানাখন্দ থেকে
বীভৎস বেরিয়ে-পড়া মৃত হাত-পা সর্বদা মগজে
সিঁদ কাটে, অকস্মাৎ দেয়
তুমুল ঝাঁকুনি। মৃত্যু নয়
নক্ষত্রের রাত,
বসন্ত বাহার,
চামেলির সুস্নিগ্ধ চমক।
বসে না পাখির হাট সেখানে কখনো নেই কোনো
গোলাপের চারা।

[ মরমী প্রহর, স্মৃতির পুরাণ : ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ]

ঘর হয় কবর, ঘাস হাওয়া মর্সিয়া গায়, কংকাল দেয় অদ্ভুত শ্লোগান :

এখানে আসো না বলে এঘর কবর আজ, ঘাসে
ঘাসে হাওয়া, রিক্ত হাওয়া কেবলি মর্সিয়া গায়, প্রাচীন কংকাল।
অদ্ভুত শ্লোগান হাঁকে।

[ কতোদিন : ঐ ]

এইবার, সর্বশেষে, সেই ঘূর্ণহাওয়ার প্রতিমাগুচ্ছ একটি বাক্‌প্রতিমা-গুচ্ছে রূপান্তরিত। কবির প্রিয় প্রতিমা রৌদ্র (সূর্য), শব, উদ্যান, পাখি এক অবিশ্রাম আবর্তন সৃষ্টি করে। পরস্পর বিরুদ্ধ প্রতিমাবলী একসঙ্গে সহবাস করতে সাহসী হয়ে ওঠে, কবি মনের গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

অতি বর্ষণের পর রোদ
কিংবা নীল দেখে মধ্যে মধ্যে খুবই আহ্লাদিত হই।
কখনো চাইনে যুদ্ধ, শবগন্ধময় জনপদ
বিভীষিকা অতিশয়, শ্মশানে নিবাস চায় কেউ ;
ব্যাকুল প্রার্থনা করি, পৃথিবীর সব অস্ত্রাগার
কোমল উদ্যান হোক, বোমারু বিমান পারাবাত

[ অতি বর্ষণের পর : দুঃসময়ে মুখোমুখি ]

মানুষের জন্য কবির মঙ্গল চিন্তার একটি স্পর্শকাতর মন স্বতঃপ্রকাশিত, একটি মঙ্গলময়রূপ একটি শ্বেত কপোত হয়ে উড়ছে, উড়ছে।

করোটি। মৃত্যুর পর পচনশীল মানবদেহ মাটির সঙ্গে মিশে যায়, গলিত লাশ থেকে করোটি-কংকাল আবরণ উন্মোচন করে। (কবরের তলায় টিকে থেকে উতরোল হয়); যুদ্ধ বন্যা মহামারীর করোটি পথে-প্রান্তরে নদীতে ছড়িয়ে থাকে—আর বাতাসের তোড়ে শূন্য কংকাল পুনরায় জীবিতদের মনে রাষ্ট্র করে মৃত্যু। পাশ্চাত্য সাহিত্য এই কংকাল (খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও শিল্পে) মৃত্যুর একটি প্রতীকরূপে চিহ্নিত; আর তারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বোদলেয়রকৃত 'মরণের নৃত্য'।

মধ্যযুগ থেকে এই কুসংস্কার চলে আসছে, মৃতরা কবর থেকে উঠে নৃত্য করে, ত্রাস ছড়ায় (যেন বা মেডুসার দৃষ্টিতে জীবিতদের পাথরে পরিণত করা), ডাক দিয়ে জীবিতদের নিয়ে যায় মরণের দেশে, 'আকবর বাদশাহ্‌র সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোন ভেদ নেই' তার হাতে, বস্তুত মানুষকে এই কংকাল জন্ম থেকেই মৃত্যুর দোসর করে নিয়েছে—কংকালের এই করাল-রূপ ভয়াবহতা অচ্ছেদ্য। একদা যারা মানব-মানবী ছিলো, আশা, প্রেম, হিংসা-দ্বেষ ছিলো, আজ তারা কংকালমাত্র, কংকাল হয়ে তাই আবার জীবনের প্রতি তাদের এতো আকর্ষণ এবং জীবিতের প্রতি এতো বিতৃষ্ণা —মহাকালের কাছে হচ্ছে কংকালের আসা-যাওয়ারূপ। শামসুর রাহ-মানের কাছে করোটি প্রতীকের স্তরে পৌঁছেছে। তাঁর বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থের নামও তাই 'রৌদ্র করোটিতে'—একদিকে করোটি মৃতের দোসর, অন্যদিকে রৌদ্র জীবনের জয়গান। এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নিবিড় চিত্রে কবি বাকবৈভব রচনা করেছেন। আসলে জীবন তো শূন্য; আধুনিক মানুষের কাছে জীবন আরও বেশী শূন্যতায় উষর, তাই একমাত্র করোটিই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, করোটি-কংকাল তাই এতো প্রিয়। তাঁর কাব্য রচনার প্রথম যুগে এই করোটি শূন্য ও ভবিষ্যৎহীন।

> এখানে মরার খুলি ধুলোয় গড়ায় চারদিকে
> খেলার ঘুটির মতো অসহায়, ভবিষ্যতহীন।
>
> [নাম-কবিতা : প্রথম গান, দ্বিতীয়.......]

মরার খুলি, ধুলোয় গড়ানো করোটি, খেলার ঘুঁটি তিনটি বাক্‌চিত্রই সমার্থক এবং নেতিবাচক।

আর চেয়ে দেখি মৃত্তিকায় করোটিতে জ্যোৎস্না জ্বলে
বিষন্ন স্মৃতির মতো, দ্বিতীয় মৃত্যুর ধ্বনি ভাসে।

উপরোক্ত বাক্‌প্রতিমায় জ্যোৎস্নার বিস্তার থাকলেও দ্বিতীয় মৃত্যুর ধ্বনিতে আবার মৃত্যুর জয় জয়কার জাগে, নঞর্থক জীবনদর্শন প্রকাশ পায় আবার এই কাব্যে 'কবর খোড়ার গান' কবিতায় কবর করোটির মধ্যে গোলাপ-কুঁড়ির আভাস আছে, জীবনের উল্লাস চিত্রিত হয়ে ওঠে, বাক্‌-প্রতিমাবলীর মধ্যে প্রকাশ পায় জীবন।

'রৌদ্র করোটিতে' গ্রন্থে 'নরমুণ্ডের নৃত্যে' একটি কবিতা আছে, এবং দুর্মরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় বোদলেয়রের 'মরণের নৃত্য' কবিতাটি। বোদলেয়রের শব-কংকালে কামগন্ধ আছে ('কংকাল! আমার কাম তোমাতেই খুঁজে পায় মিল।')। আর সর্বশেষে এই 'মরণের নৃত্য' নিখিল আন্দোলিত করা, এবং এই মরণ নৃত্য মানবের দিব্যদৃষ্টি খুলে দেয় :

মরণের মহানৃত্যে নিখিলেরে আন্দোলিত করে
সকলের খুলে দেয় অজানার দূর চক্রবাল।

[ মরণের নৃত্য : বোদলেয়র ]

শামসুর রাহমানের কবিতার একটি স্তবকে নরমুণ্ডের ভয়াল নৃত্যে স্বপ্ন হনন চলে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই দুঃস্বপ্নের ঊর্ণজালে ও দার্শনিকের প্রবীণ কন্ঠে সূর্যোদয়ের প্রেমঘন ভাষা ফুটে ওঠে। বাক্‌চিত্রগুলো, লক্ষণীয়, পাশাপাশি সূর্য প্রতিমার প্রতিভাসও--

নরমুণ্ডের ভয়াল নৃত্যে
চলছে যখন স্বপ্ন হনন,
দুঃস্বপ্নের ঊর্ণাজালেই
দার্শনিকের প্রবীণ কন্ঠে
মানবতা আনে অযুত যুগের
সূর্যোদয়ের প্রেমঘন ভাষা।

[ নরমুণ্ডের নৃত্য : রৌদ্র করোটিতে ]

অতঃপর, সাক্ষাৎ মেলে করোটিতে জ্যোৎস্নার, জীবনের জয়গান নিয়ে ইঁদুর আসে, ফনিমনসার ফুলেও শিহরণ জাগে—বুঝতে কষ্ট হয় না শামসুর রাহমান বিশ্বাসের পায়ে হাত রাখতে যাচ্ছেন।

করোটিতে জ্যোৎস্না দেখে ক্ষুধার্ত ইঁদুর কী আশ্বাসে
চমকে ওঠে কিছুতে বোঝে না ফণিমনসার ফুল।

[ রবীন্দ্রনাথের প্রতি : ঐ ]

কবরের তলায় দেহ যখন শটিত হবে, মাংসভুক কৃমিকীট যখন প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্য বিস্তার করবে এবং পরিশেষে অস্থি কংকাল করোটি শুধু অবশিষ্ট থাকবে—তবু ধীরে ধীরে একদিন জীবন দেখা দেবেই।

'নিরালোকে দিব্যরথ' গ্রন্থের 'কয়েকটি স্বর' কবিতায় দেখি করোটি হঠাৎ চুমকি হাসি ছড়ায়, আবার এই প্রতিমা শৃংখলটি এই বিশেষ ইন্দ্রিয় সংবেদনা থেকে অন্য ইন্দ্রিয় সংবেদনার পানে ধাবিত হয়ে ভৌতিক হাওয়া প্রান্তরে পৌঁছে অলৌকিক কোলাহল বিস্তার করে। যেমন :

হঠাৎ মরার খুলি ফিক
করে উঠলো কি হেসে? নাকি ভৌতিক স্তব্ধতা ছাওয়া
প্রান্তরে অতীত ওঠে জেগে অলৌকিক কোলাহল?

[ কয়েকটি স্বর : নিরালোকে দিব্যরথ ]

করোটি পুনরায় ভয় বিস্তার করে। তার কাছে নরকও তুচ্ছ।

করোটি মালায় শংকা গ্রথিত :
নরক সে কোন ছার?

[ কয়েকটি স্বর : ঐ ]

এবারের বাক্‌প্রতিমা আরও বিশ্বস্ত, আরও বেশি জীবন-নিষ্ঠ, যদিও বেনামি করোটির উদ্যান রোরুদ্যমান; অতঃপর প্রিয় প্রতিমা বাগান এসে করোটির সঙ্গে একাকার :

তাল তাল
জমাট মসৃণ
ব্লীচিং গুঁড়োর মতো হাড়গোড় অবিরাম জল-ধোয়া বেনামি করোটি
গাছপালা হয়ে সাজিয়েছে
কেমন রোরুদ্যমান অনাদি বাগান।

[ পাতালে বিশেষ স্বাদ আছে : ঐ ]

পরিশেষে আশা জেগে থাকে, আশার প্রতিমা জেগে থাকে, করোটির ভয় বিস্তার এবার স্তব্ধ, করোটির অর্থ আর সরাসরি মৃত্যু নয়, মৃত্যুর পর জীবনের হয় শুরু, ক্ষত যায় সরে, নতুন জীবনের হয় শুরু, করোটির

অক্ষিগোলক পায় নব পলেস্তারা, নগরের ক্ষতচিহ্নে পড়ে সুমসৃণ হস্তের ফলদ স্পর্শ :

করোটির
অক্ষি কোটরের মতো গর্তে
পায় নব্য পলেস্তারা ; শহরে ও গ্রামে
ভীতিচিহ্নগুলি মুছে মুছে যাচ্ছে একে একে সুমসৃণ
[ ভীতিচিহ্নগুলি : ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ]

বহিত্র বিহঙ্গ বাগান গোলাপ হরিণ তুরঙ্গম সূর্য প্রত্যেকটি শব্দের বাক্‌প্রতিমা আবেগ, জীবনের গতিশীলতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক,—জীবনের আশ্বাসের মোড়ক। বিহঙ্গ শিল্পীর স্বাধীন সত্তার প্রতীক, নৌকো জীবনের গতিশীলতা প্রকাশ করে, হরিণ চঞ্চল চিত্তের প্রতীক (চর্যাপদের হরিণ যেমন), বাগান বাস্তবে ও প্রতীকে জীবনের সৌন্দর্য ও অস্তিবোধের ধারক, অশ্ব বীর্যবত্তার প্রতীক, সূর্য সৃষ্টির আদিশক্তি এবং মহত্তর জীবনের প্রান্তিক বিন্দুও। এইসব শব্দাবলী, এমন কিছু শব্দসমষ্টি কোন কোন কবিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে, কিংবা বলা যায় একেক জন কবির এমন কিছু প্রিয় শব্দাবলী আছে যে সকল শব্দ-নিচয়ে একজন কবিকে আলাদা করে চেনা যায়—কবি-মনের গূঢ় রহস্যের আবরণ উন্মোচনে সহায়তা করে। শব্দের অন্তর্নিহিত রূপকাবরণ কবি এড়াতে পারেন না, শব্দের যে বিভিন্ন মাত্রিক অভিধা আছে কবি তা অস্বীকার করতে পারেন না, আবার কবি তাঁর চিন্তার বিশুদ্ধ আবেগ ও সংবেদনা শব্দের মাধ্যমে পাঠকচিত্তে সঞ্চার করেন—এই শব্দ ও শব্দের মাধ্যমে বাক্‌প্রতিমা-নির্মিতি তাই এমন অর্থব্যঞ্জক।

আলোচনার সংক্ষিপ্তির জন্য এইসব সমধর্মী শব্দাবলীর প্রত্যেকটির বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণ না করে মাত্র চারটি শব্দই আমি গ্রহণ করছি, শব্দগুলো বাগান, হরিণ, অশ্ব, সূর্য।

বাগান ও হরিণ। রোমান্টিক কবিদের একটি স্বসৃষ্ট স্বর্গলোক আছে, সেই স্বর্গরাজ্য কোনদিনই বাস্তবে পাওয়া যাবে না তা একপ্রকার নিশ্চিত, কিন্তু তবুও শামসুর রাহমান বাগানের স্বপ্ন দেখে দেখে মুগ্ধ, কবি নিজেকে ভাবতে থাকেন নিষ্পাপনির্দোষ হরিণ আর পৃথিবীকে মনে করেন হিংস্র শ্বাপদ। আর বাগান ও হরিণ পরস্পর পরিপূরক প্রতিমা এবং কবির মানসভঙ্গী এতে উন্মোচিত হয়, কবি একবার নিজেই বলে দেন 'আমার হৃদয় চর্যাপদের হরিণী/নিত্য করে আসা-যাওয়া'। কিন্তু মানুষ

আদিপাপে শাপভ্রষ্ট, তাই বলে শাপভ্রষ্ট হয়ে পড়ে থাকা যাবে না—মঙ্গল ও পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ তাই আস্তিক কবিদের জন্য অনিবার।

চঞ্চল চিত্তের প্রতীক হরিণ শ্বাপদ পৃথিবীর অত্যাচারে দীর্ণ ও বেদনাসিক্ত :

অত্যাচারের হিংস্র ব্যথায় নিজের হাতেই ছিঁড়েছে বুকে।
সোনালী হরিণ

[ এ্যাপোলোর জন্য : প্রথম গান...... ]

হরিণ চঞ্চলতার প্রতীক, আর সৌর আলোয় নিষ্প্রাণ বস্তু পর্যন্ত হরিণ-জীবন প্রার্থনা করে : জীবন দান করে সূর্য। সূর্যই সকল শক্তির আধার :

কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মোটর পাশাপাশি
হঠাৎ হরিণ হতে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি
রোদ চেরা সুরের গমকে।

[ দুপুরে মাউথ অর্গান : রৌদ্র করোটিতে ]

শ্বাপদ পৃথিবীতে হনন চলছে। এমনকি পরাবাস্তবের হরিণ হয়েও মুক্তি নেই, বিপদের হাতে হত্যাযজ্ঞ চলছেই; চিত্রগুলো বস্তু থেকে পরাবস্তুতে চলে যায় :

ঘটনারণ্যের কালোয় মুখ ঢেকে
আমিও ভৌতিক হরিণ হয়ে যাই।
বর্তমান কালে চূর্ণ হয়ে যাই।
বর্তমান কাঁপে চূর্ণ দর্পণে,
ব্যাধেরা হননের নেশায় অস্থির।

[ মেঘের নীল ইজি চেয়ারে : নিরালোকে দিব্যরথ ]

আর কবি এক সময় নিজেকে নিজে হনন করেন, বস্তুত বুকের তীব্র জ্বালাই কবিকে অসহায় করে তোলে এবং আত্মহনন কার্যে প্রবৃত্ত করে। এই সঙ্গে জানতে পারি মানুষ, বিশেষত কবি ধ্বংসের মুখে কতো অসহায় নিম্নোক্ত প্রতিমায় তা লক্ষণীয়; এখানে অশ্ব ও হরিণ যুগপৎ ভিড় করে :

একটি অদ্ভুত ঘোড়া আমাকে পায়ের নিচে দলে
চলে যায় দূরে কেশর দুলিয়ে
কখনো শিকার করি, হরিণ শিকার করি ঘরে।

[ নাম কবিতা : দুঃসময়ের মুখোমুখি ]

বাগান পরম অস্তিত্বের ও চেতনার ধারক। প্রিয়তমা ও বাগান, বাগান ও গোলাপ, বাগান ও হৃদয় মূলত এক এবং একাকার। এই নিজস্ব বাগান তর্কাতীতভাবে ঐশ্বর্যময়, কাজেই চেতনার এই বাগান ধ্বংস করার শক্তি কারও নেই। 'রৌদ্র করোটিতে' গ্রন্থের 'আজীবন আমি' কবিতা বাগান বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই বাগান কবির হৃদয়ে পল্লবিত এবং ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠ, এই বাগানের ধ্বংস নেই, এই বাগানে ফুলের পাশে বসন্তের আরক্ত প্রস্তাবে প্রজ্জ্বলিত ও প্রস্ফুটিত হয় কবিপ্রিয়া। বাক-চিত্ররা এখানে জীবন্ত, যদিও মরুভূমি ও বালির কবর দেখা যায়, যদিও উটের মতো অতি বেঢপ প্রাণী। গ্রীবা বাড়ায়, পরিণামে তারা পিছু হটে যায়। উদ্ধৃতিটি আহরণ করছি :

আমার হৃদয়ে ছিলে লোকোত্তর সফল বাগান
তর্কাতীত ঐশ্বর্যে ভাস্বর।
কোনোদিন সময়ের সিংহবর্ণ মরুভূমি তাকে
পারেনি ডোবাতে তরঙ্গিত বালির কবরে,
অথবা উটের দীর্ঘ কোনো
বেঢপ পায়ের নিচে হয়নি দলিত
বাগানের কোমল পরাগ।
এখানে বাগানে
আমার প্রভাত হয়, রাত্রি নামে, উৎসারিত কথা
হৃদয়ের সোনালি রূপালি
মাছ হয়ে ভাসে আর বসন্তের আরক্ত প্রস্তাবে
প্রজ্জ্বলিত, উন্মোচিত তুমি।

[ আজীবন আমি : রৌদ্র করোটিতে ]

আবার শুনি 'আমার আত্মা নতুন জন্মের প্রতিভায়/হতে পারে নিবিড় বাগান/তোমার দৃষ্টির তারাময় প্রস্রবণে।' একদিন এই বিশ্বাসে ফাটল ধরে, সেই বাগানে দেখা দেয় ছেঁড়া জামা-জুতো, ঘোড়ার মূর্তি, মৃত পাখি, বিষ পিঁপড়া, শব, করোটির প্রতিমা। তবুও কবি বাগানের জন্য আকুল, 'সম্পাদক সমীপেষু' কবিতা সেই অভিষ্ট বাগানের আকাঙক্ষায় রচিত। এখানে বাক্‌প্রতিমাগুলো বেশী চিত্রল, কখনও মননসমৃদ্ধ প্রতিমা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে :

আমরা বাগান চাই আমরা ক'জন অকপট,
শান্তিবাদী ক্লান্ত নাগরিক এমন বাগান চাই

যেখানে ফুলের কাছে সহজে পারবো যেতে ঘাসে
চিৎ হয়ে শুয়ে দিব্যি পা দুটো নাড়বো অকারণ
মাঝে মাঝে........
নানান ফুলের গাছে সুশীতল জল দেবো বলে
দুবেলা অসীম ধৈর্যে ঝারি হাতে সবাই প্রস্তুত,
অথচ বাগানই নেই, কোথাও বাগান নেই আজ।

[ সম্পাদক সমীপেষু : বিধ্বস্ত নীলিমা ]

তবুও আছে : কবির মনোভূমে একটি পুষ্প আছে, বাস্তবে এক স্বপ্নময় বাগান আছে, স্মৃতিতে সত্তায় এক বাগান আছে, রোমান্টিক চিন্তায় এক বাগান গড়া আছে। কিন্তু যুদ্ধকালীন ধ্বংসে এই বাগান হয় জন্মভূমির প্রতীক। 'বিধ্বস্ত নীলিমা' নামটিও এই ভাবনাপ্রসূত বাক্‌প্রতিমা।

বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে
আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু
ফাল্গুনের স্মৃতি ঝলকিত ফুল
কী করে বাঁচাই বারুদের ঘ্রাণ থেকে?

বাগান আর কবরে এখন আর কোন তফাৎ নেই, 'ভোরে সে বাগান/কবরের মতো স্তব্ধ, চতুর্দিকে আশ্চর্য সৌরভে/রইলো জেগে, ফ্যাকাশে গোলাপ পেলো রক্তাক্ত গৌরব'—শব কীট শূন্যতা বিপদ সবকিছুর পরও জেগে থাকে প্রসন্ন বাগান, গোরস্থান বাগান বোধি মিলেমিশে ঘূর্ণচক্র গড়ে তোলে। পরস্পর-সংশ্লেষ বাক্‌প্রতিমা শৃঙ্খলিত হয় :

জ্যোৎস্না রাতে অকস্মাৎ বাতাসে চেইন
উন্মোচিত, সাইকেল ভেসে যায়, গোরস্থান, কাগজের টুল,
মেয়ে-পুরুষের আর ভুলচুক করুণা, পাপের পারাপারে
মেঘে-মেঘে, নক্ষত্রের বাগানে কেবলি ভেসে যায়
দীপ্ত কী এক বোধিতে।

[ কোন সাইকেল আরোহীর উপাখ্যান : নিরালোকে ]

কিন্তু 'নিজবাসভূমে' কাব্যে কবি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন :

পার্কময় আমি
কিংবা আমাকেই পার্ক বলা যেতে পারে।

[ পার্ক থেকে যাওয়া যায় : নিজবাসভূমে ]

'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে এসে কবি বুঝতে পারেন বাগান কত শূন্য, কত অর্থহীন, কত নেতিবাচক। এখন 'প্রেমালাপ সাজে না বাগানে/বর্তমানে আমাদের', এখন প্রেম ও প্রেমিকাকে গোলাপ অথবা বাগানে আর পাওয়া যাবে না, প্রেম এবং প্রেমিকা বুকের মধ্যেই শুয়ে আছে ('মানসীর দিব্য আবির্ভাব সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে/জাগরণে আমরা একাকী' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)। কিন্তু প্রেমিকাই হবে গোলাপ—যদিও কবি জানেন তাকে ধ্বংসের দায়ভাগ থেকে কোনোদিন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তবুও যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন সরাতে হবে, ভ্রমরের গানে তবেই কান পাতা যাবে, তবেই প্রেমিকা নিয়ে বাগানে যাওয়া সাজবে, তবেই প্রিয়ার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব :

আমাদের ক্ষত সরে গেলে
কোনো এক বিনম্র বিকেলে
তোমার কাছেই যাবো হে আমার সবচেয়ে আপন গোলাপ,
করবো না কথার খেলাপ।

[ প্রতিশ্রুতি : বন্দী শিবির থেকে ]

অশ্ব। শামসুর রাহমানের কাব্য সাধনায় অশ্ব ও সূর্যের বাক্‌প্রতিমা অসংখ্যবার এসেছে বহুমাত্রিক বর্ণবিভায়। অশ্ব বীর্যবত্তার প্রতীক, ক্ষিপ্রতায় প্রাণীকুলের মধ্যে অদ্বিতীয়, প্রাচীন যুগে স্থলে অশ্বই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। কিন্তু গ্রীক ও পৌরাণিক যুগে অশ্বের যে আদর ও প্রয়োজনীয়তা ছিলো এখন তেমন আর নয়। তুরঙ্গ এখন অতীতস্মৃতি মাত্র; অশ্ব এখন বাক্য-ক্ষেত্রে প্রতীকের মর্যাদা লাভ করেছে। 'বিধ্বস্ত নীলিমা' কবিতায় প্রাচীন পৃথিবীর দৃপ্ত অশ্বারোহী ছুটছে, যদিও বীরভোগ্যা নারী আর গবাক্ষে বীরের জন্য অপেক্ষমান নয়, তবুও আজও বুকের মধ্যে রক্ত টগবগ করে ওঠে, 'ঘোড়ার খুরের ঘায়ে/পালকের মতো উড়ছে মড়ার খুলি' এবং এই বিশ্ববিজয়ী কবিসত্তাকে দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে 'অবেলায় এলো এ-কোন অশ্বারোহী?' স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার অনুষঙ্গ মনে পড়ে, আবার 'জনৈক সহিসের ছেলে বলছে' (বিধ্বস্ত নীলিমা গ্রন্থের একটি কবিতা) কবিতায় বৃদ্ধ সহিসের স্বপ্ন হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দ্য সী'-র বৃদ্ধের মতো; সেই প্রাচীন কৃষ্ণাঙ্গ ঘোড়া আগুন রংয়ের সুদূর মাঠ পেরিয়ে সহিসের ছেলেকে (অথবা কবি-সত্তাকে) নিতে আসে। অশ্ব, বেদুইন জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন অশ্ব, পিকাসোর

(ডিফরম) গার্ণিকা চিত্রের অশ্ব—কবির অবরুদ্ধ আত্মা যেন, গতিহীন জীবন ও আর্তনাদে অসহায় স্বকাল যেন এই লুপ্ত-গৌরব অশ্ব। গতিমান, শব্দময়, দৃশ্যমান, স্বাদলিপ্ত, চিত্রল ও মননশীল বাক্‌প্রতিমার দৃষ্টান্ত :

ক্রুদ্ধ সেই ঘোড়াটার আর্তনাদ যেন
আমাদের কাল। আমরা ভয়ার্ত চোখে
ধূর্ত মর্ত্যজীবীদের করুণা কুড়াই
অহর্নিশ। অগোচরে স্বপ্নের ঘোড়াকে
ঝেটিয়ে বেড়াই, ভাবি তাকে তাড়ালেই
থাকা যাবে নিশ্চিন্তির সম্পন্ন কোটরে।
অগ্নিকণা ঝরাতে ঝরাতে। এক ভীড় রাগী ঘোড়া
ছাদের জঙ্গলে,
মসজিদের পুরুষ্ট গম্বুজে,
মঠের শিখরে
গির্জের চূড়ায়
চালের আড়তে,
মুদির চালায়,
কসাইখানায়,
কেমন অদ্ভুত নাচে উঠতো মেতে, করতো তছনছ
ভাটপাড়া গ্রন্থাগার—তুমি সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি
শুনতে কি পেয়েছো তখন?
অথচ সকাল বেলা তোলবলে ক্রুদ্ধ ঘোটকের
কীর্তির কলুষ কোথায় যে
হতো অবলুপ্ত। পুনরায় শহরের
প্রতিটি বাগানে রাঙা আভার ঝলক,

[মহররমী প্রহর, স্মৃতির পুরাণ : ফিরিয়ে নাও ঘাতক....]

সর্বশেষে, অশ্ব যখন কাঁচের আলমারিতে আশ্রয় নেয় তখন তার প্রতীকি মর্যাদা লাভ হয়। অন্য একটি কবিতায় পাই তুরঙ্গম জীবনের দুর্দমনীয় আকাঙক্ষার মতো ছুটে চলে, অশ্ব তখন আর অশ্ব থাকে না। অশ্ব পৌঁছে সূর্যের সান্নিধ্যে, সূর্যই তো সর্বশক্তির উৎস--প্রতিমা পাঠের এই অভিজ্ঞতা স্মরণীয়।

এবং একটি ঘোড়া চমকিত বালকের আকাঙ্ক্ষার ঘ্রাণে,
মত্ত হয়ে ছুটে যায় দলছাড়, মেঘের তল্লাসে,
সহসা খিঁচিয়ে মুখ ছিঁড়ে নেয় অস্তগামী সূর্যটির মাংস একতাল

[ পিতার প্রতিকৃতি : রৌদ্র করোটিতে ]

সূর্য প্রতিমা। কবির চিত্ত ঊর্ধ্বে ধাবিত হয় চৈতন্যে আলোক-রথে চড়ে আর পৃথিবীর আঁধারের উপরে থাকে অশ্বারোহী সূর্য--সূর্য অকৃপণ ও নির্ভীক আলোকদাতা। বাগান-পাখি-অশ্ব এদের মতো সূর্য প্রতিমাও পরাবস্তুর পানে ধাবিত, তখন কবিচিত্ত হয় সৌরকিরীটধারী জ্যোতির্মালা। এই উদ্বেল মুহূর্তে আত্মমগ্ন সুর সংহতির দিকে নিমগ্ন, মহত্তম বাক্‌প্রতিমার এক ঘূর্ণনচিত্র অংকিত হয়, সূর্য তখন আর শুধু সূর্য থাকে না, বর্ণিল বিস্তারে আরেক সূর্য হয়, তখন পৃথিবীকে আলোদান করা কিংবা অন্ধকারে মজ্জিত করা কোনটিই আর সূর্যের ঈপ্সায় থাকে না, সূর্যের তাৎপর্য তখন কবির মনময় চিন্তার ধারক—সূর্য হলো একটি রূপক।

সূর্যের চুল্লীতে আমি বহুদিন সেঁকেছি আত্মাকে
উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ওহে, তবু দেখি এখানে-সেখানে
থেকে যায় স্যাঁত-সেঁতে ভাব।

[ রৌদ্র করোটিতে ]

জীবনে এবং শহরে এই শতকের শোকজ্বরাব্যাধি পা রেখেছে। তাই বলে কি প্রত্যুষে সাদা মোরগের কিরীটের মতো সূর্য দেখা দেবে না? নৈঃসঙ্গের কূলকাঠ, রক্তগোলাপ, পাথুরে মৃত্তিকায় পা রাখা প্রতিমা কয়টি বর্ণিল ও আবেগবাহী (স্মর্তব্য 'ক্রুশকাঠ' শামসুর রাহমানের আরেকটি প্রিয় প্রতিমা)—আবেগবাহী বিস্তারে হৃদয় প্লাবিত করে :

প্রত্যুষের সাদা
মোরগের কিরীটের মতো সূর্য আমরা দেখিনি
কতকাল, কতকাল নৈঃসঙ্গের ক্রুশকাঠ বয়ে
ফুটিয়েছি কতো রক্তগোলাপ পাথরে মৃত্তিকায়
ওরা পা রাখবে বলে।

[ অধমর্ণের গান : নিরালোকে দিব্যরথ ]

কিন্তু সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে কবির জীবনের শেষপ্রান্তে যাওয়া বাক্‌প্রতিমা রচনায় আরও মননের গভীরে প্রবেশ—

সামনে তাকিয়ে দেখি পরিবর্তনের
টগবগ ঘোড়া
থমকে দাঁড়ায় নৈঃশব্দের ক্ষণস্থায়ী প্রাঙ্গণের
এক কোণে এবং মাথায় তার স্বপ্নের কিরীট
সম্মেলনে একান্ত নির্ভর।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে সুতীক্ষ্ণ বাতাসে
এবং তখন
ক্ষুধার্ত চোয়ালে তার বাস্তবের খড়কুটো নড়ে

[ বামনের দেশে : বিধ্বস্ত নীলিমা ]

আবার, নিম্নোক্ত প্রতিমায় দেখি নীলিমাকে ছারখার করে ঐ ঘোড়া। এখানে প্রতিটি প্রতিমা গতিতে বিদ্যুৎ স্পষ্ট ('সাঁকো' শামসুর রাহমানের আরেকটি প্রিয় প্রতিমা)। এই সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের বাক্‌ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয় এই বাক্‌চিত্র। (যেমন জীবনানন্দে আছে 'কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে')।

কে ঘোড়া মেঘের সাঁকো পেরিয়ে স্বপ্নে আসে?
বুঝি তার খুরের ঘায়ে নীলিমা হচ্ছে গুঁড়ো।
কে জাগায় তন্দ্রা তটে? বেঘোরে বৈঠা দেখি
অবেলায় শিথিল মুঠোয় সহসা উঠলো নড়ে।

[ ভেলায় : বিধ্বস্ত নীলিমা ]

'প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' গ্রন্থের অশ্বের বহু উজ্জ্বল প্রতিমার মধ্যে একটি মাত্র উদ্ধার করছি। তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোর থেকে লাফিয়ে উঠছে ঘোড়া তমসা ছিন্ন হলো উজ্জ্বল আলোর উৎসবে, এই বন্ধন ছিন্ন অশ্বের সঙ্গে উপমেয় হতে পারে একমাত্র কবি :

মুহূর্তে মুছে গেলো সময়ের ঘোর ব্যবধান,
মেঘের বৈভব সে ফিরে পেলো তার অবলুপ্ত কান্তি,
আর ভেসে চললো আকাশ থেকে আকাশে অক্লান্ত গতিতে
কবির মতো নিঃশঙ্ক, সহজ একা।

[ সেই ঘোড়াটা : প্রথম গান, দ্বিতীয়.... ]

নগর, কারখানা, হরতাল প্রত্যেকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ঘোড়া হয় রূপক ঘোড়ার স্থিরচিত্র :

কারখানায়
তেজী ঘোড়াগুলো
পাথুরে ভীষণ।

[হরতাল : নিজবাসভূমে]

অশ্ব, আবার, আকাশচারী বিমান। এ্যাসেম্বলী হল, মসৃণ ছাদ, যুগল পাখা, এরোড্রাম, নক্ষত্রেব রেণু প্রত্যেকটি প্রতিমা মনোরম ও মনোমুগ্ধকর :

এ্যাসেম্বলী হলের মসৃণ ছাদ থেকে
মনোরম বুররাখ যাচ্ছে উড়ে দুলিয়ে যুগল
পাখা, এরোড্রাম ছুঁয়ে খুরে নক্ষত্রের রেণু মেখে।

[বিকল্প ঘর : নিজবাসভূমে]

একালের জুয়ার সঙ্গী ঘোড়া এককালের রিক্সের স্তব্ধ অশ্ব, এই অশ্ব পুনরায় স্বপ্নে আশ্রয় নেয়, সেই স্বপ্নলোক থেকেই তার নিত্য আসা-যাওয়া। বাক্‌চিত্রগুলো এখানে যেমন বর্ণিল তেমনি বহুপথগা, আবার বাগবৈদগ্ধ্য এই সব বাক্‌প্রতিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিমারা নগর, আকাশ, ছাদ, মসজিদ মঠ গির্জা, চালের আড়ত, মুদির-দোকান, কসাইখানা, গ্রন্থাগার অর্থাৎ চরাচরে যথেচ্ছ বিচরণশীল—পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে নেমে আসে এই অশ্ব।

কে জানে কোত্থেকে
এক ভিড় ঘোড়া, হয়তো বা আকাশের মাঠ থেকে
হঠাৎ আসবে নেমে ঘুমন্ত শহরে।
ডালাপালা ক্ষিপ্ত ডানা ঝাপটায় গোধূলিপ্রবণ
মগজে আমার, চেতনায় অগণন সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আসা-যাওয়া
আমি হই বর্তমান, হই আদিকাল।

[আমি হই বর্তমান : ঐ]

সূর্য কবির আবেগভরা মন ও মনন, কবির চেতনা :
একদা কবিতা তার বুক নগ্ন করেছিলো আপনার
চোখের সম্মুখে,
আপনি সে নগ্নতায় দেখেছেন নিজেরই
মনের সূর্যোদয়।
[ কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি : নিজবাসভূমে ]

'রৌদ্র নিয়ে যায়' কবিতায় সূর্যের বাক্‌প্রতিমায় পাই—অন্ধকারকে হটিয়ে ওঠে সূর্য, সূর্য পথ প্রদর্শক, আত্মার প্রতীক হরিণ মুখ রাখে সূর্যের দিকে, অন্ধকার রাতে প্রদীপ সূর্যের কাজের ভার নেয়, দেবদূত আসে তখন, দেবদূত আলোর মতো চৈতন্য জেগে ওঠে—সর্বশেষে আমরা জানতে পারি একমাত্র অকৃপণ রৌদ্রই চেতনা জাগাতে পারে। এই কবিতায় কবির উপসংহারে আমি কবির প্রিয় বাক্‌প্রতিমার আরও কয়েকটি ঘূর্ণচক্র তুলে ধরছি। একটি উদ্ধৃতিতে শূন্যতা, পাখি, কংকাল, গোলাপ, রৌদ্র, ফুল (বাগান—ঘোড়া, সূর্য এক মাতাল ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছে। কবির বাক্‌প্রতিমার এই উৎকৃষ্ট উদাহরণটি দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করছি—ঐ শব্দাবলী সৃষ্ট বাক্‌প্রতিমা কবির মানসলোক উদ্ভাসিত করে তুলবে :

শৈশবের
অশেষ সন্ধান তাকে টেনে আনে জনশূন্যতার
নেউল-ধূসর তীর্থে যেখানে কুয়োর জল
সত্যের নিটোল মুখ দেখায় আশায়
যেতে হয়—যেখানে দরোজা বন্ধ, বারান্দায় পাখির কংকাল
গোলাপের ছাই পড়ে আছে
একটি বাতিল জুতো বিকেলের রোদের আদরে
হেসে উঠে বলের মতন নেচে নেচে নিরিবিলি
ফুলের জগতে চলে যায়
এবং একটি ঘোড়া চমকিত বালকের আকাঙ্ক্ষার ঘ্রাণে
মত্ত হয়ে ছুটে যায় দলছাড়া মেঘের তল্লাসে,
সহসা খিঁচিয়ে মুখ ছিঁড়ে নেয় অস্তগামী সূর্যটির মাংস একতাল।
[ নাম-কবিতা : রৌদ্র করোটিতে ]

লক্ষণীয়, বিপরীতধর্মী ও পরস্পর-বিরোধী সর্বাধিক পুনরাবৃত শব্দগুলো কাব্য সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অন্বেষণে যে সূত্র নির্দেশ করে তারা অবশেষে

বিরোধী-স্বার্থ না-সেধে একই পথের শেষে মিলে ঐকতান সৃষ্টি করে। এমন আরেকটি বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি, এখানে প্রতিমাসৃষ্ট শব্দগুলো রৌদ্র-যুদ্ধ-শব-শ্মশান-উদ্যান-পাখি :

অতিবর্ষণের পর রোদ
কিংবা নীল দেখে মধ্যে মধ্যে খুবই আহ্লাদিত হই।
কখনো চাইনে যুদ্ধ, শবগন্ধময় জনপদ
বিভীষিকা অতিশয় শ্মশানে নিবাস চায় কেউ?
ব্যাকুল প্রার্থনা করি, পৃথিবীর সব অস্ত্রাগার
কোমল উদ্যান হোক, বোমারু বিমান পারাবত।

[ অতিবর্ষণের পর : দুঃসময়ে মুখোমুখি ]

এইভাবে বিপরীতধর্মী দুই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ হয় সমন্বয়ধর্মী, আস্থাশীল এবং জীবন দৃশ্যময় হয় সূর্যের নীচে—শামসুর রাহমানের এই আশাবাদী জীবন দর্শন নতুন কিছু নয়। এমনকি বক্তব্যের দিক থেকেও নতুনত্ব অন্বেষণযোগ্য নয়। অবিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে উত্তরণ একটি সাধারণ পদ্ধতি, তেমনি বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসের পথে পা রাখাও অতি সরলীকৃত পথযাত্রা। কিন্তু, এই পথে শামসুর রাহমানকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাবে না। কারণ, শিল্পীর প্রেরণা যে-কোন বিষয়লগ্ন, যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বনে হতে পারে। এমন কোন স্থির প্রমাণ আমরা দিতে পারিনা শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর দৈন্যতায় প্রথাসিদ্ধ পথ অবলম্বনে বক্তব্য বিষয়ের উপর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবহেতু—কোন রচনা যে-কোন একটি গুণের অভাবে নিকৃষ্ট হতে পারে না। মহৎ প্রতিভা প্রচলিত কোন রীতি পদ্ধতির নিয়মরেখা মেনে চলে না। শামসুর রাহমান মাঠে-ঘাটে নিজেকে পরিবর্তন করছেন, বোধ করি বিবর্তিত হচ্ছেন, সব চাঞ্চল্য বর্জন করছেন —আলোচিত শব্দাবলীর প্রতিমাবলী অন্য লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হবে, রহস্যময় মৃদু হাস্যে স্পষ্ট হবে। কোন স্থিরীকৃত বিশ্বাসে আবদ্ধ থেকে আবর্তিত না হয়ে দ্বিরালাপে অথবা মৌন রহস্যময় হবে তাঁর কবিতা। হয়ত তারই প্রতিভাসজনিত বিরল প্রতিমার একটি শ্লোক 'ইচ্ছা' কবিতায় (নিজবাসভূমে গ্রন্থে) আর্তিত। এই শ্লোকে একটি বছর, একমাস, একদিন বাঁচার প্রতিমায় আবার উক্ত সময়ের অনেক কল্প ও বাস্তব চিত্র মননে

উদ্ভাসিত হয়, একটি বছর বা একদিনের বাঁচার কাহিনীর জাল বোনা অবিরাম চলতে থাকে :

যদি বেঁচে যাই একটি বছর
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই একমাস কাল
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই একদিন আরো
লিখবো।

## পঞ্চম অধ্যায়

একজন কবির সম্যক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, সাবধানী সমালোচনা নয়—সামান্য ধারণা লাভের জন্য কোন-কোন বিশেষ দিক বিশ্লেষণ এবং বিশেষ একটি বিন্দুকে স্পর্শ করে একজন কবিকে জানতে প্রত্যাশী হয়ে এই চেষ্টা। এ-দেশের কবিতায় আল মাহমুদের মত আর কেউ নদী-জল নিয়ে এমন বাক্‌চিত্র বিন্যাস করেননি, তাঁর কবিতার কয়েকটি ছত্র পাঠ করতেই জলের ধ্বনিময় গন্ধময় স্বাদযুক্ত স্পর্শভরা বর্ণিল প্রতিমা আচ্ছন্ন করে তোলে, বঙ্গোপসাগর উর্মিল হয়ে ওঠে—বাংলাদেশের আর কোন কবি সাগর নদী পুকুর-তীরবাসী হয়েও আল মাহমুদের মতো এমন ঐশ্বর্যময় জলে অবগাহন করতে নামেননি। আল মাহমুদের কবিতায় ধ্বনি ও চিত্রময়তা এমন সমাচ্ছন্ন সুরে বেজে ওঠে, যা একান্তই আল মাহমুদের, যার মঞ্জুল ধ্বনিময়তা একান্ত অন্তরঙ্গ—এক অখণ্ড বৈশিষ্ট্যের প্রসারিত রূপ ফুটে ওঠে, এবং উপলব্ধি করা যায় এইসব পঙক্তি-নিচয় একান্তই আল-মাহমুদীয়। অথচ কবিতার করণ-কৌশলে তিনি কখনও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে দিশাহারা ছোটেননি, বরং প্রাচীণ ঐতিহ্য থেকে শাশ্বতরূপকে ছেঁকে তুলে আনতে অভিসারিক, আবার একান্ত মুখের ভাষা ও শব্দাবলীকে বাগৈশ্বর্যে পরিণত করেছেন এবং বহু ব্যবহৃত গ্রামীণ শব্দগুলি তাঁর বাক্ যোজনায় (বিশেষত 'সোনালি কাবিন' গ্রন্থে) বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং অনুভূতির ইশারায় হয়ে ওঠে দীপ্যমান।

প্রথমে 'সূর্য' ও 'কলস' প্রতিমার দুটি উদ্ধৃতি আহরণ করছি :

> ক্রমে তাও শেষ হলে সে বন্য বৃষভ যেন গলে যায় নিসর্গ শোভায়
> তুমি কি সোনার কুম্ভ ঠেলে দিয়ে দৃশ্যের আড়ালে দাঁড়াও
> হে নীলিমা, হে অবগুন্ঠন ?
> আকাশে উবুড় হয়ে ভেসে যেতে থাকে এক আলোর কলস
> অথচ দেখে না কেউ, ভাবে না কনক কুম্ভ পান করে কালের জঠর ;
> ভাবেনা, কারণ তারা প্রতিটি প্রভাবে দেখে উঠে আরেক আঁধার
> ছলকায়, ভেসে যায়, অবিশ্রাম ভেসে যেতে থাকে।
>
> [ কালের কলস : কালের কলস ]

প্রবল স্রোতের কাছে গিয়েছিলো 'কাল
কলস ভাসিয়ে তীরে দাঁড়াল যখন
কেমন আলতা রঙে হলো লালে লাল
বধির অধীর পানি।

[ কলস ভাসিয়ে : ঐ ]

প্রথম উদ্ধৃতিতে 'সোনার কুম্ভ', 'আলোর কলস', 'কনক কুম্ভ' শব্দগুলি সূর্যের সুপরিচিত উপমান, কিন্তু 'বন্য বৃষভ' বলার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের নতুন নামকরণ (বা উপমান) সচেতন অনুভূতিতে ও প্রাণারোপে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে—বস্তুত এই ব্যঞ্জনা, এই ভাবারোপ, এই গতিময়তা, এই শক্তিময়তা এক অপরূপ প্রাণ প্রাচুর্যে তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটতে থাকে। সূর্য একটি কলস : কালের কলস। সূর্য মানুষের অতি প্রিয় এবং পরম আত্মীয়, কবির বিশেষ দৃষ্টিতে তাই সূর্যের বাক্‌প্রতিমা হয় গতিমান চিত্রময় শব্দমান (বন্য বৃষভ বলায় শব্দমানও হয়ে ওঠে সূর্য)। আবার এই সূর্য যেমন অন্ধকার হটিয়ে দেয় বহুদূরে তেমনই এই সূর্য প্রভাতেও কখনও কখনও 'আরেক আঁধার ছলকায়' (অর্থাৎ অন্ধকার বর্তমান কালের কথাই এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে)। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, এই কলসের ভাসমান গতিতে 'বধির অধীর পানি' লালে লাল হয়ে যায় (মাটির কলস এবং কালের কলসরূপ সূর্য দুইই বোঝায় এখানে)। এইভাবে সূর্য প্রতিমা প্রাচুর্যে অকুন্ঠ হয়ে উঠেছে আল মাহমুদের কাছে। কিন্তু, এবার, নিতান্ত গদ্য শব্দ কথ্য শব্দ কাব্যিক মেজাজে হার্দ্য হয়ে ওঠে :

কেমন নিবদ্ধ হয়ে থাকে তারা মৃত্তিকা সন্তান আর শস্যের ওপরে
পুরুষের কটিবন্ধ ধরে থাকে কত কোটি ভয়ার্ত যুবতী
ঢাউস উদরে তারা কেবলই কি পেতে চায় অনির্বাণ জন্মের আঘাত।
মাংসের খোড়ল থেকে একে একে উড়ে আসে আত্মার চড়ুই
সমস্ত ভূগোল দেখো কি বিপন্ন শব্দে ভরে যায়
ভরে যায়, পূর্ণ হতে থাকে।

'ঢাউস উদরে', 'মাংসের খোড়ল', 'সমস্ত ভূগোল' বাকগুচ্ছে কবিতার মঞ্জুল অনুষঙ্গ গড়ে উঠলো—স্বাভাবিকভাবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন 'কাব্যের শব্দ আবেগবাহী'—এখানেও কবিতার অবয়বে যখন শব্দগুলি বাকবন্ধে আবদ্ধ হয়ে গেছে তখন এই শব্দগুলিই হয়ে উঠলো শব্দার্থের

অস্থিরধর্মী স্বভাব-পরায়ণ। নারী দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যুগপৎ সৌন্দর্য ও কাম উদ্রেককারী। যৌন বৃত্তি বিষয়ে উগো-র মত—"ইন্দ্রিয়ে যখন আগুন ধরে তখন সৌন্দর্যকে বাহুবন্ধে বেঁধে ভগবানকেই আলিঙ্গন করি আমরা"। আল মাহমুদের নারী শুধু সৃষ্টি রক্ষাকারী, আনন্দদাত্রী; পুরুষের হাত ধরে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য এই নারী ফসলের বীজ বুনবে না; নূহের তরী থেকে নেমে আনন্দে উল্লাসে সে পুরুষের হাতে আঘাত ভোলানো চুমু এঁকে দেবে এবং সন্তান দেবে শুধু:

> আনন্দে উল্লাসে আমি আমার পুরুষের হাতে
> আঘাত ভোলানো চুমু এঁকে দেবো নীরব আবেগে।
> প্রথম রাত্রিতে তার বীর্যবান সন্তানের বীজ
> সযত্নে ধারণ করে আমি হবো ক্লান্ত ফলবতী।
>
> [নূহের প্রার্থনা : লোক লোকান্তর]

আল মাহমুদের কবিচিত্ত বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়বেদী—কবির মনোজগত পঞ্চেন্দ্রিয়কে আন্দোলিত করে তোলে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার কথা নয় বরং তিনি ইন্দ্রিয়বেদী, অর্থাৎ বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ-ঘ্রাণ-স্বাদ-লিপ্ত তাঁর বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ। কখনও কখনও তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দিকে আমাদের উচচালিত উৎক্ষিপ্ত করেন, তখন কবির বাক্‌প্রতিমা শৈল্পিক শুদ্ধতায় অন্তর্মুখী আবেদন সৃষ্টি করে। "কাব্যসৃষ্টির কারবার শারীর ইন্দ্রিয় নিয়ে নয়, শরীরোত্তর কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়বোধ নিয়ে। বাস্তবজীবনে দৃষ্টি-শক্তি তীক্ষ্ণ না হলেও কাব্যে দৃশ্যরূপময় প্রতিমার প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্য অসম্ভব নয়, মিলটন ও টেনিসন তার প্রমাণ। শোনা যায় হোমর অন্ধ ছিলেন। বধির বেঠোফেনের মতো ধ্বনিময় চিত্ত ক'জনার? রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়-বেদী প্রতিমা আলোচনায় যখন ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তির উল্লেখ করি তখন তাঁর কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়বোধের কথাই বলি কেননা সেখানেই তাঁর কাব্যকারু বিধৃত, তাঁর শারীর ইন্দ্রিয় আমাদের আলোচ্য নয়"—(ডঃ অমলেন্দু বসু)।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিময় তিনটি উদ্ধৃতি আহরণ করছি—

> এইতো সেই অবসর, যখন কোনো দৃশ্যই আর গ্রাহ্য নয়।
> পলকহীন চোখ যেন উল্টে যাচ্ছে। যেখানে থরে থরে সাজানো আছে
> ঘটনার বিদ্যুচ্চমক। না, কাউকে ধমক দিতে চাই না।

কোনো কর্তব্য আমার জন্যে নয়। বরং হৃদয়ের ভেতর
যে ব্রহ্মাণ্ডকে বসিয়ে রেখেছি তার গোলক
দ্রুত আবর্তিত হোক।

[ উল্টানো চোখ : সোনালি কাবিন ]

তারপর শুরু হয় সবুজের পীড়ন।
সবুজ আমার চোখে আঘাতের মত বাজতে থাকে
আমার চোখে তখন সবুজকে লাল বলে মনে হয়।
সে লাল আবার নীল হয়ে যায়। তারপর কালো।
এইভাবে শতবর্ণে রঞ্জিত হতে হতে
শাদা এসে সবকিছুকে ঢেকে ফেলে। আমার
চোখ তৃপ্ত হতে থাকে। আমি তখন
স্ত্রীকে দেখি না, পুত্র-কন্যাকে দেখি না।

[ চোখ : ঐ ]

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
রওনা দিয়েছি। দুঃখ
আমাদের ক্লান্ত করে না।
দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে
মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।

[ স্বপ্নের সানুদেশে : ঐ ]

এই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমায় কবির অভিজ্ঞতা অন্তর্গূঢ় এক সত্তার উদ্বোধন করে। এইসব বাক্‌প্রতিমায় এক ধরনের মননচেতনা ধাবিত হয় দৃশ্য থেকে দৃশ্যাতীত ভাবনায়, পাঠককে করে তোলে আবেগবাহী ভাবনারোহী কবিতার সওয়ার।

এবার দৃশ্যময় প্রতিমার উল্লেখ করছি। পাহাড় কবির কাছে নারীর স্তন, বস্তুত কবির কাছে নারী এবং কাম নিরবচ্ছিন্ন তাই পাহাড়-প্রকৃতি-পাখি কামের অংশ—কবির কাছে নারী প্রায় ভোগ্য সামগ্রীমাত্র, ইন্দ্রিয় বিলাসের প্রধান উপকরণ; সোনালি কাবিনের সনেটগুচ্ছে এবং আরও বহু কবিতায় নারী হয়ে আছে ইন্দ্রিয় সঙ্গিনী। নিম্নের উদ্ধৃতিতে, কালিদাসের

মতো প্রকৃতি-ব্যাপ্ত কাম আল মাহমুদকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই দৃশ্যটি সুন্দর হয়ে উঠেছে যখনই বলা হলো যে চাঁদ নারীর গলার লকেট:

কখন যে চাঁদ ওঠে আড়াআড়ি পাহাড়ের ফাঁকে:
যেন কার পাথুরে স্তনের কাছে ঝুলে আছে শাদা
চাঁদির লকেট।

এই দৃশ্যের সঙ্গে কালিদাসের শ্লোকাংশটি স্মর্তব্য:

দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট, অমর মিথুনের ভোগ্য,
গর্ভ সূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।

[পূর্বমেঘ ১৮: বুদ্ধদেব বসু অনূদিত]

পুনরায় এই দৃশ্যমান প্রতিমা ধীরে-ধীরে মনস্বিতায় পেঁাছে কেমন শোভন বেদনাবিধুর হয়ে ওঠে। কবিতার নাম 'এক নদী', অর্থাৎ পুনরায় নদীর প্রতিমা গ্রাস করে নিয়েছে বাঙলার মাঠ-ঘাট, নদীর এই অপরাজেয় রূপ আল মাহমুদকে প্রথম থেকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নীচের এই স্তবকে চাঁদের উপমেয় হলুদ বর্ণ পিঠা, পিঠার দৃশ্যমান এবং গন্ধবহ প্রতিমা যুগপৎ ভিড় করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সেই সঙ্গে পিঠা বুভুক্ষুদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, চাঁদ ঠিক ক্ষুধার্তদের খাদ্য না-যোগালেও প্রেমিক-প্রেমিকার মনের খাদ্য পরিবেষণে অমিত; এবং, শেষোক্ত লাইনটিতে স্মৃতির বেদনাবাহী কথা এনে সম্পূর্ণ বাক্‌প্রতিমাটিকে করে তুলেছে অধীর ও বিহ্বল। উদ্ধৃতিটা পড়ুন—

পিঠার মতো হলুদ মাখা চাঁদ
যেনো নরম কলাপাতায় মোড়া;
পোড়া মাটির টুকরো পাত্রকে
স্মৃতি কি ফের লাগাতে পারে জোড়া!

[এক নদী: সোনালি কাবিন]

এমন আরেকটি দৃশ্য প্রতিমায়, লক্ষণীয়, আল মাহমুদ কেমন অনায়াসে 'কাঁপিয়ে কাঁখে ঠিল্লা ভরা পানি' বাক্‌চিত্রটি ব্যবহার করেন। দেখতে পাই বাক্‌চিত্রটি অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু মহাকালের কালোত্বের সঙ্গে যখন সেই রূপসী রমণীর গাত্রবর্ণকে উপমান করা হয়, তৎক্ষণাৎ

দৃশ্যটি মনস্বিতাপ্রাপ্ত হয়ে আরও ভাবাবেগ সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে; আবার 'রূপসী সেই পরী' বলায় নারী হয়ে ওঠে গৃহ ছাড়া মায়াবিনী, কিন্তু পরীরা বোধকরি অসচরাচর হলেই শুধু কালো বর্ণের হতে পারে (তাহলে ঐ পরী আসলে গৃহকর্ম নিপুণা কালো বাঙালী রমণী)। বাক্‌প্রতমাটি দেখুন :

মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাত-বরণী রূপসী সেই পরী
কাঁপিয়ে কাঁখে ঠিল্লা ভরা পানি
দেহের ভাঁজে ভেজা নীলাম্বরী—

[ ঐ : ঐ ]

আবার :

নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ
যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,
হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কিনা সেও
যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার।

[ সোনালি কাবিন, ১২ : ঐ ]

ওইতো সামনে নদী, ধানক্ষেত, পেছনে পাহাড়
বাতাসে নুনের গন্ধ, পাখির পাপড়ি উড়ে যায়
দক্ষিণ আকাশ জুড়ে সিক্ত ডানা সহস্র জোড়ায়;

[ প্রত্যাবর্তন : কালের কলস ]

প্রথম উদ্ধৃতিতে 'সিকস্তী', 'তালাশ' শব্দ দু'টি একান্ত গাদ্যিক, কিন্তু কবিতায় শব্দদ্বয়ের অবস্থান এমন যথাযথ যে পুনরায় এদের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা অবান্তর। 'সিকস্তি' শব্দটি জমি-জমা সংক্রান্ত কাগজপত্রে বহুল ব্যবহৃত, গ্রামবাসীদের পরিচিত শব্দ, আল মাহমুদ নদীর নরম উষ্ণ টাটকা চিত্রটি তুলে ধরতে এই শব্দটির প্রয়োগ করে বাক্‌প্রতিমাটি ঐশ্বর্যময় করে তুলেছেন। দ্বিতীয় উদাহরণ, নদী-ধানক্ষেত-পাহাড়, অদৃশ্য বাতাসে লোনা স্বাদ (স্বাদযুক্ত, স্পর্শমান এবং ঘ্রাণযুক্ত প্রতিমা), উড়ে যাওয়া পাখির পালক (গতিমান চিত্র) সিক্ত ডানার বিধুনন দৃশ্যমান প্রতিমাকে উত্তাল করে শব্দমান প্রতিমায় উত্তীর্ণ করেছে। দৃশ্যমান স্বাদযুক্ত ঘ্রাণযুক্ত শব্দমান গতিমান স্পর্শমান সব রকমের প্রতিমা এই তিনটি লাইনে যুগপৎ উর্মিল।

এবার, দৃশ্যরূপবেদী কয়েকটি লোভন বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি যেখানে ধ্বনিপ্রবল প্রতিমা দৃশ্যকে করেছে আরও উজ্জ্বল বর্ণময় :

কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর
কষ্টকর তার চেয়ে নয় মেয়ে কবির অধর।
[সোনালী কাবিন, ৫ : সোনালী কাবিন]

হারিয়ে কানের সোনা এ-বিপাকে কাঁদো কি কাতরা ?
বাইরে দারুণ ঝড়ে নুয়ে পড়ে আনাজের ডাল
[সোনালী কাবিন, ৭ : ঐ]

যেন বা কাঁপছো আন ঝড়ে পাওয়া বেতসের মূল ?
বাতাসে ভেঙেছে খোঁপা, মুখ তোলা, হে দেখনহাসি
তোমার টিক্‌লি হয়ে হৃদপিণ্ড নড়ে দুরু দুরু
মঙ্গল কুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
উঠোনে বিন্নীর খই, বিছানায় আতর, অগুরু।
[সোনালী কাবিন, ১৩ : ঐ]

ভাঙন যখন চল্লিশ গজের মধ্যে এগোলো। আমার বাপ
তখন অসুস্থ। কী তার অসুখ ছিল জানি না,
কেবল আমাকে নদীর কাছে যেতে বলতেন। বলতেন
জেনে আয় কোন দিকে চর পড়েছে।
আমি তার কথায় দৌড় দিতাম। কিন্তু ফিরে এসে বলতাম
আজ কৈবর্তপাড়ার নলিনীদের ভিটেবাড়ী ভাঙলো বাবা।
মা চোখ টিপতেন।
[চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয় : ঐ]

আল মাহমুদের দৃশ্যরূপময় বাক্‌চিত্রগুলির পাশাপাশি অঙ্গে-অঙ্গে ধ্বনিপ্রবল বাক্‌চিত্র মিশে এমন মধুর হার্দ্য করেছে, বিশেষত সোনালি কাবিন-এর দৃশ্যচিত্রকল্পরূপময় প্রতিমাগুলি অবিরলভাবে আদিরসাশ্রিত--চর্যাযুগের শবরী বালার দৈহিক মিলনপর্ব চলার প্রস্তুতি চলছে, আহ্বান চলছে, কেননা এই পথেই হৃদয়ের ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অথবা, শেষ উদ্ধৃতিতে নদীর ভাঙনের যে প্রবলধ্বনিরূপ সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে নতুন চর জাগার স্বপ্ন এবং নদী-তীরবর্তী গ্রামের উজাড় হওয়ার দৃশ্য পূর্ণতা

অর্জন করেছে। আবার লোক লোকান্তর' পর্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দীর্ঘ বর্ণনায় সমৃদ্ধ কয়েকটি ছত্র কেমন দৃশ্যময় ধ্বনিময় (জল-নদী-পাখির) প্রতিমা :

এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে। মাটির কলসে জল ভরে
ঘরে ফিরে সলিমের বউ তার ভিজে দু'টি পায়।
অদূরের বিল থেকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক
পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায় দূরে;
জনপদে কি অধীর কোলাহল মাযাবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।

[ তিতাস : লোক-লোকান্তর ]

আল মাহমুদের কবিতায় নদীর প্রতিমা বারবাব ঝাপ দিয়ে উছলে পড়েছে, তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলীতে নদী এঁকে বেঁকে কখনও সমুদ্রের মতো শয়ান কখনও বৃষ্টির ঋজুরেখ গতি। সেই তিতাস' নদী, আশৈশব সঙ্গী তিতাস, স্মৃতির তিতাস, স্বপ্নের তিতাস—জলের প্রহারে তার তীর ভাঙে, জলের ঘূর্ণি আর ঘোলা স্রোতের বিপুল টানে অসংখ্য মাছধরা ও যাত্রীবাহী পাল-তোলা নৌকোর গতিমান রূপ, ভিজে পায়ে সলিমের বউ-এব মাটির কলসী কাঁখে বাড়ি ফেরা, দূরের শযান জলের বিলের উপর দিয়ে পানকৌড়ি মাছরাঙা বক পাখা থেকে জলের ফোটা ফেলে উড়ে যায়, নদীতীরবর্তী জনপদের জনমানসে নদী এনেছে প্রবহমান সচলতা—নদীর এই চিত্র চিরচেনা। শেষ বাক্যে যদিও আছে নদী থেকে 'খুঁজিনি কিছুই' কিন্তু পূর্বে একবার বলা হয়ে গেছে 'যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে', অথবা নদীর স্রোতের প্রবাহে জনমানসেও কোলাহল জেগেছে, আর নদী হয়েছে মায়াবিনী......অবশেষে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না এই নদীই কবিকে যৌবনের যুবরাজ করেছে, এই নদীই কবির পৌরুষ এনেছে, হৃদয়ের আবেগ দিয়েছে, প্রবল পরাক্রান্ত সম্ভোগী করেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দীর্ঘ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কথা বলা হয়ে যায়, কিছু ভাবনার মিশ্রণ ঘটে—নদীর মতো দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে নির্বস্তুক যৌবনের তুলনায়

ফলে আমরা যদিও কোন বিশেষ ছবি পাইনা কিন্তু সম্মোহন আসে। এমন আরেকটি নিসর্গ বর্ণনা :

আমি যখন ছোটো, আমাদের গ্রাম ছিল
এক উদ্দাম নদীর আক্রোশের কাছে। ক্রমাগত ভাঙনের রেখা
ধীরগতিতে গ্রামকে উজাড় করে এগোতে থাকলে
আমি প্রাত্যহিক ভাঙনের খবর আমার মাকে এনে দিতাম।
দৌড়ে এসে বলতাম, আজ ইদ্রিসের
গোয়াল ঘরটা গেল মা।
আমার বাপের ছিল অঘুমের অসুখ। সারারাত
ধস নামার শব্দ পোহাতেন। কখনো দেখতাম
সড়কি নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছেন।
আমি তার পেছন নিলে বলতেন, আয়
কোথায় চর জাগলো দেখে আসি।
দশ মাইলের মধ্যে চরের খবর মাঝিরা কেউ জানতো না।
গলুইয়ের ওপর থেকে হাত নেড়ে নেড়ে
তারা দূর গঞ্জের দিকে চলে গেলে
আমরা ঘরে ফিরতাম।

[ চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয় : সোনালী কাবিন ]

এই দীর্ঘ বর্ণনায় নদী, নদীর ভাঙন, ভাঙনের প্রবল শব্দ, নতুন জাগা চর, বৃদ্ধ মানুষের জীবন সায়াহ্নে নতুন জাগা চরের দিকে ছোটা, বৃদ্ধের পেছনে একটি বালকের ছোটা ইত্যাদিতে নদীর একটি সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে, নদীর একটি ব্যাপক চিত্র কবি তুলে ধরেছেন পাঠকের চোখে। 'ক্রমাগত ভাঙনের রেখা ধীরগতিতে গ্রামকে উজাড় করে' বাক্‌চিত্রটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে একটি প্রবল আন্দোলন জাগে, বুঝতে পারি কবি নদীর আগ্রাসী রূপের দিকে ছুটে চলেছেন। এই বর্ণনার ভাষা সরল, মাত্র একটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে দীর্ঘ এই নিসর্গ চিত্রে (নদীর বিশেষণ 'উদ্দাম')। লক্ষণীয় 'লোক লোকান্তর'-এর উদ্ধৃতিটিতে সরাসরি 'যৌবনের প্রতীকের মতো' 'জনপদে কি অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী- এনেছে স্রোতের মতো' ইত্যাদি কথা কবি বলেছেন, বিশেষণ উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন কিন্তু 'সোনালি কাবিন' কাব্যের এই পর্যায়ে

পৌঁছে কবির প্রতিমা নির্মাণ চলছে বর্ণলেপহীন ঋজুরেখ মুখের ভাষা প্রয়োগে ('চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়'-এর মতো বর্ণনাত্মক কবিতায়)। এই নিসর্গ বর্ণনার ছলে একটি প্রবল বেদনাবোধকে জাগরিত করার সুন্দর কবিতা আছে 'লোক লোকান্তর'-এ। কবিতাটির নাম 'রাস্তা'।

যদি যান,
কাউতলী রেলব্রীজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ী।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাটলেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।

দেখবেন, লাউয়ের মাচায় ঝোলে
    সিক্তনীল শাড়ির নিশেন।
শুঁটকির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ।
দেখবেন ভাদুগড়ের শেষ প্রান্তে
এক নির্জন বাড়ীর উঠোনে ফুটে আছে
আমার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী
    একটি ম্লান দুঃখের করবী!

[ রাস্তা : লোক-লোকান্তর ]

নিসর্গ বর্ণনা চলছে, কখনও সহজ-সরল কখনও বর্ণাঢ্য—'সোনালি কাবিন'-এর বর্ণলেপহীন প্রকৃতি নয়। এখানেও নদী—নদী প্রতিমা এসেছে 'কিষাণের ললাটলেখার' উপমানে, এবং পরবর্তী লাইন অলঙ্কার কৌশলের বর্ণাঢ্য বৈভবে বর্ণিত। কবিতার মূল বাক্‌প্রতিমা রাস্তা। রাস্তা পথে যেতে-যেতে দৃশ্যের সঙ্গে শব্দ-গন্ধ-স্বাদযুক্ত প্রতিমা ছুটে আসছে। বিশেষণ ব্যবহারের প্রবণতা পূর্ণমাত্রায় আছে। 'সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।' সবুজ রঙ জীবনের প্রতীক, মাঠের রঙ যদি সবুজ ফসলের রঙে অবাধ বিস্তৃত হয়ে ওঠে বলা যেতে পারে কিষাণের মনে-প্রাণে আশাই সঞ্চার করছে, তাই 'সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য' বাক্‌চিত্রটি কি বোঝায় ধারণা করা শক্ত। কিন্তু চিত্রকল্প যেখানে দৃষ্টিসাধ্য না-হয়েও স্মৃতিতে অনুষঙ্গে

ও অভিভাবে পরাক্রান্ত হয়; উপচে পড়ে, যেখানে কখনও কখনও স্পষ্টতা ও যাথার্থ্যের অভাবে ও কবিতা হয়ে ওঠে লক্ষ্যভেদী—এই 'সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য' অন্তর্ভেদী হতে পারছে কিনা সন্দেহ, এখানে সবুজে বিস্তীর্ণ মাঠের সঙ্গে নির্বস্তুক 'দুঃখে'র তুলনার ফলে আমরা স্পষ্ট কোন চিত্র পাই না, অথচ সম্মোহিত হয়েও সন্তুষ্ট হতে পারছি না। বিশেষত পরবর্তী স্তবকের সমাপ্তিতে নতুন কোন বাক্‌চিত্র সংযোজিত না-হয়ে প্রথম স্তবকের সমাপ্তির মতো দুঃখের প্রতিমার পুনরাবৃত্তি হয়; কিন্তু 'আমার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী'র মতো নির্বস্তুক বাক্‌চিত্র সংযোজনের ফলে সমগ্র কবিতাটি আলোড়নমুখী আন্দোলন-ধর্মী হয়ে ওঠে, কবিতা হয়ে ওঠে লক্ষ্যভেদী।

অতঃপর, অলঙ্কৃত করণ-কৌশলময় প্রাচীন চারণপ্রীতির দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাক, এই উদ্ধৃতিতে কবির বিশিষ্ট মনোভঙ্গির পরিচয় ফুটে ওঠে:

মুখের রেখায় শেষে হেঁটে গেলো গাম্ভীর্যের হিম;
বুদ্ধের মূর্তির পাশে তুমি আমি নিষ্পলক চেয়ে
গভীর প্রশান্তি যেন আমাদের রক্তে আছে ছেয়ে
নির্বাক দুজন শুধু, ইতস্ততঃ ছড়ানো আদিম।
মহেনজোদারোর সে মৃৎপাত্রে লেখা কি-যে নাম
আমরা বুঝিনি ঠিক আশেপাশে কত হাঁটলাম।

[ প্রত্ন : লোক-লোকান্তর ]

এ-তীর্থে আসবে যদি ধীরে অতি পা ফেলো সুন্দরী,
মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়,
ছিন্ন তালপত্র ধরে এসো সেই গ্রন্থ পাঠ করি
কত অশ্রু লেগে আছে এই জীর্ণ তালের পাতায়।
কবির কামনা হয়ে আসবে কি, হে বন্য বালিকা
অভাবের অজগর জেনো তবে আমার টোটেম,
সতেজ খুনের মতো এঁকে দেবো হিঙুলের টিকা
তোমার কপালে লাল, আর দীন-দরিদ্রের প্রেম।

[ সোনালী কাবিন, ৪ : সোনালী কাবিন ]

'লোক-লোকান্তর' পর্যায়ের এবং 'সোনালী কাবিন'-এর সনেটগুচ্ছ অলঙ্কারবহুল বাক্‌প্রতিমার নিদর্শন। পূর্বোল্লেখিত গ্রাম-গঞ্জ-নদী নয় প্রাচীন

ভারতবর্ষের এবং প্রাচীন বাংলার বাক্‌চিত্র ধীরে ধীরে উত্তাল হয়ে উঠছে, সমসাময়িক কোন কবির মধ্যে এই প্রাচীনচারিতা এমন আগ্রাসীরূপ নিয়ে ছুটে আসেনি। পূর্ববর্তী জীবনানন্দ দাশের মধ্যে মুকুন্দরাম ও বল্লাল সেনের বাংলা ধীরে ধীরে বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগত ছেড়ে এসিরিয়া পর্যন্ত বিস্তারধর্মী রূপ আছে। উপরে দুটি স্তবকে বুদ্ধের মূর্তি থেকে মুকুন্দরামের রক্ত বর্ণে-গন্ধে-শব্দে বাগ্‌বৈভব রচিত হয়েছে। প্রাচীন সঙ্ঘারামের বুদ্ধমূর্তি এবং মহেনজোদারোর মৃৎপাত্র, ফুল্লরার অভাবের সংসার (এখন আরও তীব্র রূপ নিয়েছে বাংলায়), আর প্রাচীন গরীব বালিকার রক্ত নিয়ে আজকের সুন্দরী ভালোবাসার রক্ত-লাল কামনা-আবেশ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখবে বলে কবির বিশ্বাস। অথবা,

কী প্রপঞ্চে ফিরে আসি, কি পাতকে
বারম্বার আমি
ভাষায়, মায়ের পেটে
পরিচিত, পরাজিত দেশে?
বাক্যের বিকার থেকে তুলে নিয়ে ভাষার সৌরভ
যদি দোষী হয়ে থাকি, সেই অপরাধে
আমার উৎপন্ন হউক পুনর্বার তীর্যক যোনিতে।

[জাতিস্মর : সোনালী কাবিন]

এখানে, অলঙ্করণ পদ্ধতিতে ভাব-মনন মিশ্রিত হয়ে বাক্‌প্রতিমাটি হয়ে উঠেছে একটি দার্শনিক বিশ্বাসপ্রসূত আবেগময়। কবি বারবার ফিরে আসবেন এই ভাষা ও মায়ের পেটের মধ্য দিয়ে, এই পরিচিত-পরাজিত দেশে, কিন্তু পরক্ষণেই কর্মবাদী (বৌদ্ধ দর্শনের মতো) তিনি শপথ বাক্য উচ্চারণ করছেন এই বলে, যদি ভাষা চর্চা করে তিনি অপরাধী হন (বৌদ্ধ দর্শনের বাচনিক পাপে অভিযুক্ত হন) সেই পাপে তীর্যক যোনিতে জন্ম নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-যাতনা পেতে সাহসী। এই কবিতায় জন্মস্রোত নম্রস্রোতা নদী বলে কল্পিত—অর্থাৎ পুনর্বার নদী ফিরে আসে উপমা হয়ে। জীবনানন্দ দাশ পুনরায় এই বাংলায় মানুষ অথবা পাখি হয়ে জন্মাবার সাধ প্রকাশ করেছেন (বৌদ্ধ দর্শনের জন্মান্তরবাদে শুধু মনুষ্য নয় প্রাণীকুলেও জন্ম সম্ভব); এইভাবে :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;

হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জালাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

[ ২৪ : রূপসী বাংলা ]

জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস কিংবা বাংলার প্রতি ভালোবাসা দৃশ্যময়-শব্দময়-গন্ধময় প্রতিমায় ঝরে পড়েছে, ভাষার এই শীলিত কারুকার্য এমন নিমগ্ন-চেতনা খুব কমই দেখা যায়। 'জন্মান্তরবাদ' কবিতার এই বাক্-প্রতিমা নির্মাণ 'সোনালি কাবিন' সনেটগুচ্ছে আরও অধিক চিত্রময় হয়ে উঠেছে, জন্মান্তরবাদ ও প্রাচীনচারিতা 'সোনালি কাবিনে'র বাক্‌বৈভব রচনায় অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে।

প্রাচীনকালের এক নারী, সেই আবহমানকালের রমণী নূহ নবীর জাহাজ থেকে মাটি স্পর্শ পেলে তার কর্তব্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছে। পূর্বেই বলেছি কবির কাছে কাম ও নারী অবিচ্ছেদ্য, রমণী বলে :

ভেসে ভেসে তারপর একদিন দুরন্ত বাতাসে
যখন আবার পাবো পুরানো সে মাটির সুরভি
আনন্দে উল্লাসে আমি আমার সে পুরুষের হাতে
আঘাত ভোলানো চুমু এঁকে দেবো নীরব আবেগে।
.. .. .. .. .. । এতোদিন যৌবনের নামে
যা ছিলো সঞ্চিত এই সঞ্চারিত শরীরের কোষে।
হে নূহ সন্তান দেবো, আপনাকে পুত্র দেবো আমি।

বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণে....বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে আল মাহমুদের কাব্যভাষা জলের যে ঘূর্ণচক্র সৃষ্টি করেছে, যে উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ যে কলমুখর জল সমাবেশ তাঁর চেতনার ভিত্তিতে—এই মোহন প্রতিমাগুচ্ছের অনুশীলনে তাঁর কাব্যবস্তুর, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের, এবং তার ভবিষ্যত দৃষ্টির একটি উজ্জ্বল প্রশস্ত পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বাংলার প্রকৃতি মৌসুমী বায়ুর আশীর্বাদ। আল মাহমুদ জল সম্পর্কে দুটি চেতনার (মনোভঙ্গীতে বা উপলব্ধিতে) পৌঁছেছেন—জলের আকর্ষণ, ফলবতী রূপ ; অন্যটি তার সংহার মূর্তি বা

বিকর্ষণ। 'লোক-লোকান্তর' গ্রন্থে জলসত্রের অন্বেষণ রূপ ও বিকর্ষণ ভাবের উদ্বোধন হয়েছে এইভাবে (প্রথমটি আকর্ষণ, দ্বিতীয়টি বিকর্ষণ ভাবের) :

ক. জলসত্র খুঁজেছি তো পাইনি সে কুম্ভভরা জল
পাইনি মেঘের মূর্তি যার পায়ে বেজে উঠে মল
বৃষ্টির শব্দের মতো, হাসি যার কাঁপায় প্রহর।

[ লোক-লোকান্তর : তৃষ্ণার ঋতুতে ]

খ. খুঁজেছি জলের কণা থর থর ধুলোর তুফানে
এখন বুঝেছি মানে—এও এক নারকী সমাজ ;
জলসত্র নেই কারো এই শেষে মেনে নিলো মন,
ধুলোকে এড়িয়ে আর কারো ঘরে যাবো না এখন।

[ ঐ : ঐ ]

এই জলসত্র ও কুম্ভভরা জল পরবর্তী 'কালের কলস' গ্রন্থে গলিত স্বর্ণ হয়ে বয়ে গেছে। 'সোনালি কাবিনে' নদী মিশেছে জন্মজন্মান্তরের স্রোতে, শুনতে পাই : 'পূর্বজন্মের সেই নগ্নস্রোতা নদীর কিনারে' (জাতিস্মর)। কবি আত্মমগ্নতার গণ্ডীতে, সচেতন বহির্দৃষ্টি চেতনায়, অস্থিরতায় ও প্রশান্তিতে এমনকি পৃথিবীতে 'আসবো না বলেই' অন্তিম বাক্য উচ্চারণ করেন তখন 'জল' চেতনাচেতন লুপ্তকারী বাক্‌প্রতিমা :

আমি আসবো না বলে মিছিলের প্রথম পতাকা
তুলে নিই হাতে।
আর আসবো না বলে
সংগঠিত করে তুলি মানুষের ভিতরে মানুষ।
কথার ভেতরে কথা গেঁথে দেওয়া, কেন?
আসবো না বলেই।
বুকের মধ্যে বুক ধরে রাখা, কেন?
আসবো না বলেই।

অথচ স্মৃতির মধ্যে পরতে পরতে জমে আছে
দুঃখের অস্পষ্ট জল। মনে হয় যে নদীকে চিনি
সেও ঠিক নদী নয়, আভাসে ইঙ্গিতে কিছু জল।

[ সোনালি কাবিন : আমি আর আসবো না বলে ]

এ-হেন জলময় চেতনার উদ্বেল অবস্থায়ও কবি আত্মমগ্ন, জলের ভিতর জলে লীন।

'নদী তুমি' কবিতায় এককালের বিশ্বস্ত নদী-জল এখন বিশ্বাসঘাতকতায় নীল; জলপ্রতিমার বিকর্ষণ কেমন তীব্র দেখুন ('লোক-লোকান্তর' গ্রন্থের 'বৃষ্টির অভাবে' কবিতাটিও এই ভাবজাত) :

নিসর্গের মানচিত্র ছেঁদা করে একদা যে নদী
আনতো গভীর জল কর্মপরায়ণ ঘরে ঘরে
সেও আজ নদী নয়, কালসাপ, ধূর্ত বণিকের
গোপন দালাল যেন। পাটের চালান ভরা নাও
ভাসাও উদ্দাম গতি, হাসির গমকে নেড়ে পাল
পাটাতন ভেঙে পড়ো বিশ্বাসঘাতক নীল জল।

[সোনালি কাবিন : নদী তুমি]

এই কবিতার জলপ্রতিমা পূর্ণতা পেয়েছে শেষ স্তবকে (সম্পূর্ণ কবিতা পাঠ শেষে পাঠক বুঝতে পারবেন) যখন কবি নদীকে বলেন : 'যেন চোরের সাহায্যকারী তুমি, কবির সন্দেহ ;/বোনের শাড়ির মত মায়ের দেহের মত নও।'

আল মাহমুদের নদী-জল বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ যে-সকল কবিতায় বিশেষ মূর্ত হয়ে উঠেছে উল্লেখ করতে চেয়েছি। সবশেষে পূর্বোল্লিখিত 'স্বপ্নের সানুদেশে' কবিতার নদী প্রতিমার কথা পুনরায় উল্লেখ করছি, এই কবিতার নদীর বহমান ধারা এবং 'আমাদের' যাত্রা একটি পরিপূর্ণ বাকবৈভব রচনা করেছে—অস্পষ্ট কুয়াশায় যাত্রা, আলোর ঝলকানিতে উদ্ভাসিত পথ, পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যানী, দুঃখ-ক্লান্তি-মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যাত্রা, হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে সম্মুখে পথে অগ্রসর হওয়া এবং পরিশেষে স্বপ্নের সানুদেশে পৌঁছার প্রতিমার নদী বা জল বাক্‌প্রতিমার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছে। 'লোক-লোকান্তরে' এই বাক্‌প্রতিমা গুচ্ছের উদ্বোধন ঘটেছে এবং এই গ্রন্থেই মূল সুর ও দ্বন্দ্ব বহির্দৃষ্টি লাভ করেছে, পরবর্তীকালে 'কালের কলস' থেকে 'সোনালি কাবিন' গ্রন্থদ্বয়ে তার সংযোজন-বিয়োজন চলেছে, নদীর বাঁক বঙ্কিম রেখায় এঁকে-বেঁকে শাড়ির মতো দেহে উঠেছে কখনও অবিশ্বাসী ও যন্ত্রণার নীল নদী হয়েছে, সমতালে এবং স্বতন্ত্র তালে চলেছে, কখনও আবেগে-বেগে আলাদা-আলাদা হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে নদী বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ মূল সুর থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি। বাঙালী জীবনের অর্থনীতে সংস্কৃতিতে যার প্রধান ভূমিকা সেই নদীর চিরচাঞ্চল্য আল মাহমুদের কাব্যভাষা জলের ঘূর্ণচক্রকে রূপ দিয়েছে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

কবিতার প্রাণশক্তি বাক্‌প্রতিমা : তার নির্মিতিতে। কিন্তু কবিতা আলোচনার এই নতুন পদ্ধতিতে কেউ কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন—এমনকি মানতেই হয় এই বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে লুকিয়ে আছে মায়াবী চোরাস্রোত, ভ্রান্তি; আরও স্বীকার করতে হয় বাক্‌প্রতিমা বিশ্লেষণ ও বিন্যাস দুরূহ-দুরবগাহ। আমিও শহীদ কাদরীর বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছের শ্রেণী বিন্যাস করছি না, শুধু দূরবর্তী আলোকস্তম্ভকে চিহ্নিত করে সৃজনী শক্তির গূঢ় রহস্যের দরজায় আঘাত করতে চাই—কারণ সকলের মতো আমিও স্বীকার করি শিল্পীর সৃজনীশক্তি শেষ পর্যন্ত রহস্যময় থেকেই যায়, যেনবা চির-রহস্যময় চির অধরা এই শক্তি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে রচনার মধ্যে শিল্পীর অন্তর্লোকের পরিচয় চূর্ণ-চূর্ণ ছড়িয়ে থাকে—এই প্রতিমা দর্শন করে-করে শিল্পীর হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছা যায়। জানি শিল্পী শেষ পর্যন্ত একা এবং নিঃসঙ্গ, এমনকি সেখানে তিনি ক্ষমাহীন ও দুর্বিনীতও।

শহীদ কাদরীর দুটি কাব্যগ্রন্থের বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণ করতে বসে আমি কিছু বাক্‌প্রতিমা উদ্ধৃত করবো—"হয়তো কোনো কোনো আধুনিক শিল্পী পরস্পর দ্বন্দ্বজীর্ণ সত্তাসমূহে বিচ্ছিন্ন ও বিকলচিত্ত, তাঁদের ইমেজগুলোতে সে বিচ্ছিন্নতার সাক্ষ্য"। শহীদ কাদরী আমাদের সাম্প্রতিক ধারার কবিদের একজন, কিন্তু তিনি এতো কম লেখেন যে মাঝে-মাঝে তাঁর কবি-অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমার প্রশ্ন জাগে—যদিও সকলেই জানেন রচনার বিপুলতায় একজন শিল্পীর শক্তির পরিমাপ হয় না।

শহীদ কাদরীর বাক্‌প্রতিমা বা ইমেজ কখনও-কখনও সরল নির্দ্বন্দ্ব অতি পরিচিত, কখনও আবার দুরবগাহ প্রতীকধর্মী ব্যঞ্জনাবহুল। তাঁর কবিতার শব্দ ও চিত্র চিরপরিচিত রূপ-প্রতীকের স্রোতে আমাদের অপরিচিত জগতের সন্ধানে নিয়ে চলে, এবং সেখানে পৌঁছে অবগাহন করি পরিচিত অথচ নতুন স্বাদের এক নদীতে। কাব্য-স্বভাবে তিনি চিত্র ও ধ্বনির সাধক, অসংখ্য সাধারণ ও অসাধারণ বাক্‌চিত্রাবলী তাঁর কাব্যের অবয়ব

গঠন করেছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার' এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা'র কবির মানসভঙ্গিতে বাস্তব থেকে পরা-বাস্তবে গতায়াত, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়োত্তর অনুভূতির রাজ্যে উত্তরণ—এই ভ্রমণ সময়ে আমরা কবিকে খুঁজে পাই, কবির শিল্পী-সত্তার কাছাকাছি পৌঁছি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত-সন্নিবেশ করি :

ক. এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি।
[ বৃষ্টি, বৃষ্টি : উত্তরাধিকার ]

খ. কাঁটা-তারে ঘেরা পার্ক, তাঁবু, কুচকাওয়াজ সারিবদ্ধ
সৈনিকের। হিরন্ময় রৌদ্রে শুধু জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান,
ভোরবেলা সচকিত পদশব্দে ঝোড়ো বিউগলে
গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী হঠাৎ বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে।
[ উত্তরাধিকার : ঐ ]

গ. রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে ধাবমান খাকি
জিপের পেছনে মন্ত্রীর কালো গাড়ি,
কাঠপড়া, গরাদের সারি সারি খোপ
কাতারে কাতারে রাজবন্দী ;
[ রাষ্ট্র মানেই লেফট.... : তো. অ., প্রি ]

ঘ. এই তো আমার চুল
চপল চঞ্চল চুল
কোনোমতে বিব্রত মুণ্ডুতে আমি ধারণ করেছি,
[ সেলুনে যাওয়ার আগে : তো. অ., প্রি ]

এই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমায় পাই দৃশ্যানুভূতি ; চিত্রধর্মিতাই এদের প্রধান গুণ। একেকটি পরিবেশ একেকটি চিত্র পাঠককে ছুটিয়ে নিচ্ছে সম্মুখের দিকে ; এই দৃশ্যানুভূতিক চিত্রাবলী কখনও গতিশীল, কখনও গন্ধ বিস্তার করছে, কখনও শ্রবণেন্দ্রিয়কে করে তুলছে মাতাল, আবার কখনও বা

ত্বগেন্দ্রিয়কে করছে কাতর। প্রথম উদ্ধৃতিতে—অন্ধকার শহর, বর্ষাকাল, বিদ্যুৎ বিকীর্ণ-করা পথ-ঘাট, নগ্ন পায়ে ছেঁড়া পাৎলুন পরে নিঃসঙ্গ যাত্রী কবি, নৌকোর গতিশীল পালের মত হাওয়ায় ওড়া শার্ট আর শার্টের অভ্যন্তরের শরীরটা তীব্র গতিসম্পন্ন একটি নৌকো (কেননা সমগ্র চিত্রটির আবহে বুঝতে পারি 'আমি' নামক কবি পুরুষটির দেহ এখন অতিমাত্রায় চঞ্চল, কেননা বৃষ্টি এসে সমগ্র প্রকৃতিকে এমনকি জড় বস্তুকেও করে তুলেছে নিরুদ্দিষ্ট)। দৃশ্যটি মূলতঃ চিত্রধর্মী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার গতিময়তা এবং ত্বগেন্দ্রিয় তৃপ্ত প্রতিমাবলী সম্পর্ণ দৃশ্যটিকে করে তুলেছে আরও বিস্তারধর্মী আরও আবেগময়। দ্বিতীয় উদাহরণ—কাঁটা-তার ঘেরা পার্ক ও তাঁবু (যারা স্থিরধর্মী) এক সময় এইসব দৃশ্যাবলী অস্থিরধর্মী হয়ে ওঠে কুচকাওয়াজরত সৈনিকের মত, আবার যে কামান শান্তির সময় রৌদ্র-তাপে শুধু আলোই বিকীর্ণ করে বা যে-সকল গাছ-পালা স্থির অচঞ্চল কিংবা ঘর-বাড়িগুলি অনড় তারা সকলেই এক সময় বিউগলের সামান্য ইঙ্গিতে কর্মিষ্ঠ-উদ্বেল হয়ে উঠল—বস্তুত শুধু প্রাণী নয় বস্তুও কবির চিন্তার রাজ্যে, মানুষের আবেগের মুখে আন্দোলন-ধর্মী হয়ে ওঠে (তুলনীয়, পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ : রবীন্দ্রনাথ)। দৃশ্যটি সৈনিকের পদভারে বিউগলের ঝড়ো নিনাদে রণাঙ্গনের মিশ্র শব্দে হয়ে উঠল শ্রবণানুভূতিপ্রবণ। তৃতীয় উদ্ধৃতিটি একটি উপনিবেশ-রাষ্ট্রের চিত্র, একটি রাষ্ট্রের দৃশ্যময়তা ফুটিয়ে তুলতে অনেকগুলি অস্থিরধর্মী ও অশুভ চিত্র একত্রিত হয়েছে কবির তুলিতে, কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের বদলে দেখতে পাচ্ছি একটি সামরিক-জান্তা শাসিত রাষ্ট্র—মন্ত্রীর গাড়ি ছুটছে সামরিক জীপের পেছনে অথচ এই মন্ত্রীরাই জনগণ নির্বাচিত এবং জনগণের সেবায় তারা প্রতিশ্রুত, আর রাষ্ট্রের কাঠগড়া, গরাদের খোপ এবং কাতারে কাতারে রাজবন্দী—আসলে সবই মানুষের হৃদয়কে বিকল ও বিধুর করার প্রয়াস।

চতুর্থ উদ্ধৃতির দৃশ্যটিও অস্থিরধর্মী স্বভাবের—এই চুল স্বভাব-চঞ্চল, শিল্পীসত্তার মত স্পর্শকাতর ও স্বাধীনতাকামী, দিনে-দিনে এর বৃদ্ধি আছে তাই বাঁধন ভাঙাতে প্রয়াসী এবং কিছুতেই ঐ চুল মাথার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে না। লক্ষণীয় প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি দৃশ্যময় থেকে গতিশীল হয়ে উঠেছে, শুধু গতিময়তা নয় বা বেগ নয় আবেগধর্মিতাই এদের নিহিত শক্তি, এমনকি বাতাসের আন্দোলনে উৎক্ষিপ্ত-চঞ্চল চুল পর্যন্ত যেন শব্দ ঝারছে—কাজেই বলা হয় এইসব বাক্‌চিত্র বর্ণিল, নিটোল, মঞ্জুল, শব্দময়, আবেগ বহুল এবং ইন্দ্রিয়জ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগ নৈপুণ্য এবং শক্তি আরও দূরপ্রসারী।

ক. নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ
মেঘ, জল, হাওয়া,—
হাওয়া, ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চীৎকার.
কী বিপদগ্রস্ত ঘর-দোর,
ডানা মেলে দিতে চায় জানালা-কপাট

[ বৃষ্টি, বৃষ্টি : উত্তরাধিকার ]

খ. দেখেছিলাম ছেলেবেলায় ম্যানহোলের পাশে
রয়েছে প'ড়ে স্তনের নীচে হা-খোলা এক ক্ষত
হুবহু এই লাল গোলাপের মতো।

[ গোলাপের অনুষঙ্গ : তো. অ., প্রি. ]

গ. সতেজ শরীর থেকে ছলকে পড়ছে কৈশোর, মাঠে, ঘাসে,
গাছ থেকে পালাচ্ছে পাখিরা।

[ যুদ্ধোত্তর রবিবার : ঐ ]

তৃতীয় পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমার কয়েকটি নিদর্শন :

ক. এবং বাউলের একতারার মত বেজে ওঠে চাঁদ,
অমাবস্যায় গোলাপঝাড়ের মত পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকি
ভরে রয় রাত্রির ময়দানগুলো জুড়ে;
এবং যুগল পিদিমের মত মা'র চোখের আশ্বাসের আলোয়
তরুণ ঘোড়ার পিঠে দ্রুত পেরিয়েছি শৈশব, কৈশোর।

[জানালা থেকে : উত্তরাধিকার]

খ. কিংবদন্ত, স্মৃতির মত পাঠালো সে ঝলকে ঝলকে পলক-না-পড়া হাওয়া
ফিরলো উষ্ণতা যেন পুরোনো কোমল মখমলে; বাতি-জ্বালা, লাল, নীল
কাঁচের দোকান একপাল অপ্সরীর মত নেচে নেচে
দেখালে কত-না রঙ্গ, যেন তারা কত মোহনীয়,
একরাশ ধুলোপাতা বিশুদ্ধ আনন্দে শুধু তাল ঠুকে গেল।

[ চন্দ্রালোকে : ঐ ]

গ. ব্লাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি :
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হ'য়ে
নিজেদের ঘরে।
[ ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায় : তো. অ., প্রি. ]

ঘ. সংঘর্ষের সব সম্ভাবনা, ঠিক জেনো, শেষ হ'য়ে যাবে—
আমি এমন ব্যবস্থা করবো, একজন গায়ক
অনায়াসে বিরোধী দলের অধিনায়ক হ'য়ে যাবেন
সীমান্তের ট্রেঞ্চগুলোয় পাহারা দেবে সারাটা বৎসর
লাল নীল সোনালি মাছ
ভালোবাসার চোরা-চালান ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ হ'য়ে যাবে
প্রিয়তমা।
[ তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা : ঐ ]

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমার রূপ—প্রথম উদ্ধৃতিতে সন্ধ্যায় অন্ধকারে বৃষ্টি নামল, বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ, মেঘ-বৃষ্টি-হাওয়া কোনটির বিরাম নেই; নিচ্ছিদ্র এই অন্ধকারে নির্মম বৃষ্টির এই ঘোর বিপত্তিতেও হাওয়ার চীৎকার হয়ে ওঠে ময়ূরের রভস-বর্ণিল আনন্দ-বিহারের মত ধ্বনিময় কিন্তু প্রকৃতিতে চলছে বিপৎপাত শুধু বিপৎপাত—এই চরম বিপৎপাতেও বস্তু চলছে উর্ধ্বলোকে, ঘরবাড়ি বৃষ্টির চাপে মুহ্যমান কিন্তু জানলা-কপাট পাখা মেলে উর্ধ্বাভিসারী—যেমন শিল্পী-সত্তা সমস্ত প্রতিকূল প্রতিবেশকে তুচ্ছ করে শিল্পের জয়গান করে। বৃষ্টি এখানে শুধু আর বৃষ্টি নয়, এই বৃষ্টি অবশেষে শিল্পীকে ভাসিয়ে নেয় অজানা লোকে, 'বৃষ্টি, বৃষ্টি' কবিতার শেষ স্তবকের শেষ কয়েকটি পংক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ভাব, জানা যায় বৃষ্টির উচ্ছ্বাসে কবির অন্তর-সত্তা ভেসে চলছে : যদিও কবি জানে না কোন শহরের দিকে এই যাত্রা (লক্ষণীয় কবির এই যাত্রা কোন গ্রাম বা স্বপ্নপুরীর দিকে নয়, অমরাবতীতে নয়, প্রাচীন কাব্যের অলকা-রও নয়)। এই বৃষ্টিতে শিল্পী সত্তা নূহের আত্মার মত শক্তিমান হয়ে ওঠে :

আমার নৈঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তেমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ

জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো ?
[ বৃষ্টি, বৃষ্টি : উত্তরাধিকার ]

এই শ্রেণীর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে শিল্পীর চোখে, গোলাপ আর নিহত নারীর রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডের কোন পার্থক্য নেই ; তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যুদ্ধোত্তর দিনের শিশু-কিশোরদের খেলার চিত্র পাই এবং খুব সাধারণ চিত্র হলেও লক্ষণীয় 'ছলকে পড়ছে কৈশোর' বাক্‌চিত্রটি, বর্ণনাটি সাধারণ দৃশ্যানুভূতিক নয়, এখানে মননের মিশ্রণ ঘটেছে, অদৃশ্য কৈশোর-শক্তি ভাষায় কারুকৃতিতে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। এই চিত্ররূপগুলি প্রথমোক্ত বাক্‌প্রতিমার চেয়ে উজ্জ্বল, ভাবপ্রধান এবং জটিলতর।

উক্ত তৃতীয় পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমার বস্তুচিত্র, শব্দচিত্র, গন্ধচিত্র, দৃশ্যচিত্র, স্পর্শচিত্র এবং সেই সঙ্গে ভাব, ভাবানুষঙ্গ ও মননের মিশ্রণ আরও জটিল উর্মিল—ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়াতীত হচ্ছে, আবার তখনই ফিরে আসছে মর্তের সীমায় (সব পাখি যেমন এক সময় ঘরে ফিরে আসে) মানুষও স্বপ্নচারণ শেষে গৃহাকাঙক্ষী হয়। এই সকল বাক্‌প্রতিমায় কবি একটি উর্ধ্বগতি চৈতন্য-প্রবাহের অন্বেষু—এই চৈতন্য-প্রবাহ-যাত্রার উন্মার্গ-গতিতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ; শিল্পেরও। এই পর্যায়ের প্রথম উদ্ধৃতিতে—চাঁদ বেজে উঠতে শুনি বাউলের একতারার মত ; চাঁদ দূরের হলেও অনুভূতিতে আবেগে আমাদের খুব কাছের এবং চাঁদের শব্দমান বাক্‌চিত্র অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত কিছুই হয়ে ওঠে আরও মোহনীয়, আমাদের চতুর্দিকের পরিবেশ হয়ে যায় নতুন অর্থে মাধুর্য-মণ্ডিত। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখি কাঁচের দোকান, দোকানের মধ্যকার বস্তুপুঞ্জ প্রাণশক্তি পেয়ে (দৃশ্যমান বাক্‌চিত্র হল গতিশীল) নৃত্যশীল অপ্সরী হয়ে উঠেছে ; নিষ্প্রাণ বস্তুর এই প্রাণশক্তি অর্জন অর্থপূর্ণ হয়ে আমাদের শিহরিত করে তোলে। কিংবা তৃতীয় উদ্ধৃতিতে দেখুন রাষ্ট্রশক্তির ব্ল্যাক আউটেও প্রকৃতি তার আপন কাজ করে যাচ্ছে এবং সমস্ত রকম বিরুদ্ধ পরিবেশেও মানুষের অনুভূতিমালার তীক্ষ্ণতার ক্ষান্তি নেই—স্বপ্ন নিয়ে প্রেম নিয়ে নিজস্ব জগত থেকে আরেক লোকে, অন্যলোক থেকে আপন-লোকে গতায়াত চলছে। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে দেখুন এই অসম্ভব-অবাস্তব স্বপ্ন রচনার কি বর্ণিল ও অর্থময় বর্ণনা হতে পারে—বাস্তবে যা কোনদিন সম্ভব নয়,

পৃথিবীতে যা হয়ত কোনদিন ঘটবে না, ব্যক্তিগত প্রেম থেকে মানব-প্রেম যা চিরদিন শুধু দলিতই হওয়ার সম্ভাবনা অধিক, কবি তবুও বলে দিচ্ছেন বা এমন ব্যবস্থা তিনি করবেন যেখানে ভালোবাসা কোনদিন ব্যর্থ হতে পারবে না—'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা' কবিতাটি এই ভাবের উৎকৃষ্ট কবিতা বলা যায়। এইভাবে শব্দের ও বাক্যের জাল বিস্তার করে স্বর্গ থেকে মর্তে, মর্ত থেকে স্বর্গে, বস্তু থেকে পরাবস্তুর রাজ্যে পাঠককে গতায়াতের শক্তি দেন কবি—সবকিছু হারিয়ে আবার ফিরিয়ে পাওয়ার আনন্দে অবগাহনের অবসর দেন কবি; এই সঙ্গে একটি আদর্শ পৃথিবী রচনার ভার কবি নিজের হাতে তুলে নিয়ে, প্রিয়তমার জন্য একটি কল্প পৃথিবী রচনা যখন সমাপ্ত করেন—অথচ প্রিয়তমার পৃথিবীর বাক্‌চিত্রাবলী আহরিত হয়েছে যুদ্ধ অথবা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কাঠামো থেকে, অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবনার চিত্রসমূহ কল্যাণকামী বাক্‌চিত্র রূপায়িত হয়েছে কবির হাতে।

এই বাস্তব ও বস্তুময় পৃথিবীর অভিঘাতে স্বভাবতই শিল্পীর প্রাণ বেদনার্ত হয়ে ওঠে, বিশেষত যুদ্ধের ভয়াল নৃশংসতা শিল্পীকে করে তোলে অধীর অস্থির—আবার সেই যুদ্ধের স্মৃতি চিত্র কোন-কোন কবির কবিতায় হয় ভাবময়তায় সম্পৃক্ত, কাব্য হয়ে ওঠে নতুন বাক্‌প্রতিমায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

যুদ্ধসম্পর্কিত দুই ধরনের বাক্‌প্রতিমা, মোটামুটি দুই ধরনের মনোভঙ্গী, লক্ষ্য করি শহীদ কাদরীর কবিতায়—একদিকে যুদ্ধের ধ্বংসচিত্র যা মানবতাকে চিরকাল পিষ্ট করছে, অন্যদিকে যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ শিল্পকলার অধিক চর্চা—পরিণামে সমস্ত কিছুই প্রিয়তমার জন্য। দুই রকমের বাক্‌চিত্রাবলীতে যুদ্ধ-প্রতিমার উল্লেখ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই অধিক; তাঁর সর্বাধিক ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমার শব্দাবলী—চুল, পাখি, ঘোড়া, স্বপ্ন—তাদের অন্যতমরূপে, অর্থবহতায় ও অর্থময়তায় মূল্যবানরূপে, মূল-সূত্র অন্বেষণের চাবিস্বরূপ এই যুদ্ধ-প্রতিমার বিশ্লেষণ হতে পারে। এই মোহন প্রতিমাগুচ্ছ গঠিত হওয়ার পূর্বসূত্র অবশ্যই প্রথম কাব্যগ্রন্থে অঙ্কুর রূপে দৃশ্যমান, কবির ভবিষ্যৎ পথের গূঢ় ইঙ্গিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের 'সেলুনে যাওয়ার আগে' কবিতায় গণতান্ত্রিক অধিকার বাক্‌-স্বাধীনতা শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষার সূত্ররূপে উৎসারিত। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পীর ভবিষ্যৎ পথযাত্রার ইঙ্গিত বারবার প্রথম রচনাগুলিতে আত্মনিবিষ্ট রূপে হলেও চকিত বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কবির আত্মনিমগ্নতা যতই তীব্র হোক-না-কেন একদিন তার পূর্ণতররূপ পরিস্ফুটন হবে প্রশস্ততর ও

বলিষ্ঠতর বাহনে—আত্মমগ্নতা হয়ে ওঠে জনময় চেতনার প্রকাশ। এই বহির্দৃষ্টির বৃত্তরূপ শহীদ কাদরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সচরাচর প্রতিমারূপে উৎসারিত না হয়ে সুঠাম বৃত্তরূপ ধারণ করেছে, যে আত্মনিমগ্নতা থেকে জনময় জগতের চেতনার উৎসার সেই জনময় জগত পুনরায় শিল্পীর কাছে আত্মভাবময়তায় ফিরে এসেছে—যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র, সৈন্যবাহিনী, অর্থ-সম্পদ সমস্ত কিছুই প্রিয়তমার তুষ্টির জন্য (লক্ষণীয়, দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থের নামও 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা'), এইভাব থেকে কবি বলেন : আমি এমন ব্যবস্থা করবো/নৌ, বিমান আর পদাতিক বাহিনী/কেবল তোমাকেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে-ঘিরে নিশিদিন অভিবাদন করবে, প্রিয়তমা। এই দুই মনোভঙ্গীর উদাহরণের কয়েকটি ছত্র তুলে ধরছি। প্রথমত :

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার
কারফিউ, ১৪৪-ধারা,

[রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট...... : তো. অ., প্রি. ]

পেটের ভেতরে যেন গর্জে উঠছে গ্রেনেড,
কার্বাইনের নলের মতো হলুদ গন্ধক ঠাসা শিরা,
গুণাগার হৃদয়ের মধ্যে ছদ্মবেশী গেরিলারা
খনন করছে গর্ত, ফাঁদ, দীর্ঘ কাঁটা বেড়া।
জানু বেয়ে উঠছে একরোখা ট্যাঙ্কের কাতার
রক্তের ভেতর সাঁকো বেঁধে পার হলো
বিধ্বস্ত গোলন্দাজেরা,..................
সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছে
এক দীর্ঘ সাঁজোয়া বাহিনী
এবং হেড লাইনগুলো অনবরত বাজিয়ে চলছে সাইরেন।

[ স্কিৎসোফ্রেনিয়া : ঐ ]

রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রে দলিত মানুষের চোখে তার অশুভ কাঁটাতার, কারফিউ, ১৪৪ ধারা ছাড়া আর কিছুই পড়ে না ; এবং ধীরে ধীরে সেই অশুভ ছায়া ব্যক্তিমনে ব্যাধির সৃষ্টি করে, ব্যাধি হয়ে ওঠে জটিল, জটিল ব্যাধির আবর্তে শোনা যায় পেটের ভেতর গর্জে উঠছে গ্রেনেড আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে মিছিল করে নেমে এসেছে দীর্ঘ সাঁজোয়া-বাহিনী। 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া'

কবিতার শেষ স্তবকে এই ভাবের বীভৎস চিত্র দেখতে পাই : 'স্বচ্ছল কিচেনে/অনর্গল রান্না হ'য়ে চলেছে আপন-মনে/নানা ধরনের মাংস/নাই-জেরিয়ার, আমেরিকার, সায়গনের, বাংলার/কালো, সাদা এবং ব্রাউন মাংস। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি :

জেনারেলদের হুকুম দেবেন রবীন্দ্রচর্চার? মন্ত্রীদের
কিনে দেবেন সোনালি গীটার? ব্যাঙ্কারদের
বানিয়ে দেবে কবিতার নিপুণ সমঝদার?

[ রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন? : তো. অ., পি ]

একজন কবি কমাণ্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী
এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়
সবগুলো গণভোট পাবেন একজন প্রেমিক, প্রিয়তমা।

[ তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা : ঐ ]

বি-৫২ আর মিগ-২১ গুলো
মাথার ওপর গোঁ গোঁ করবে
ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
চকোলেট, টফি আর লজেন্সগুলো
প্যারাট্রুপারদের মতো ঝরে পড়বে
কেবল তোমার উঠোনে প্রিয়তমা।

[ ঐ : ঐ ]

এই ঘনিষ্ঠ অবিভাজ্য চারুশীল যুদ্ধ-প্রতিমাগুলোর ব্যবহার ভিন্নধর্মী। পূর্বোক্ত বাক্‌প্রতিমাগুলোর আরেক প্রান্তে বসে এইসব প্রতিমা প্রকাশ করছে ভিন্ন সুর। জেনারেলদের হতে হবে রবীন্দ্র-বিশারদ, মন্ত্রীদের শিখতে হবে সোনালি বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলতে, আর ঐ অর্থগৃধ্নু ব্যাঙ্কার-ব্যবসায়ীদের কবিতা-কলা রসে নিপুণ হতে হবে, তাহলে একজন কবিই যথার্থভাবে পারবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরীর নিয়ন্ত্রণ-ভার নিতে, একজন প্রেমিক সমরমন্ত্রীর আসনে বসে পারবেন রাজ্যরক্ষা বিষয়ক কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিতে, এবং তবেই বি-৫২ মিগ-২১ থেকে ধ্বংসকারী প্যারাট্রুপার ও বোমার পরিবর্তে প্রিয়তমার জন্য ঝরে পড়বে চকোলেট-টফি—পৃথিবীতে আর থাকবে না রূঢ়তার আঘাত, প্রেমিকার বাসযোগ্য সুস্থ পৃথিবী তাহলে গড়ে উঠবে এবং কবির সংবেদনশীল চিত্তের শান্তি তবেই কিঞ্চিৎ মিলবে।

কবি বহির্পৃথিবীর বেদনাকে অন্তর্প্রকৃতিতে ধারণ করেন বলেই শিল্পীসত্তার অধিকারী, আবার বহির্পৃথিবীর জনতার দুঃখ-যন্ত্রণাকে 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া'-য় আপনার করে ধারণ করেন—মানুষে-মানুষে হানাহানি-যুদ্ধ প্রিয়তমার প্রেমের পায়ে পোষা জন্তুর মত বশীভূত করে কবি আদর্শ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। জনজীবন-জনতা সমস্তকিছুই আদর্শ পৃথিবীর মানসলোক সৃষ্টির জন্য—যুদ্ধের এই ব্যথিত চিত্তের প্রতিমা তাই ব্যষ্টি মন থেকে ব্যক্তি মনে সঞ্চারিত। বাক্‌প্রতিমাগুলো কবির সৎ-চিন্তার চেতনার প্রবণতার প্রবাহ, এক সুঠাম ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার প্রকাশ এই বাক্‌চিত্রাবলী।

যুদ্ধের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে জনতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এই জনতা চেতনা শহীদ কাদরীর কবিতায় কি অর্থ বহন করে কিছু বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণে এবার প্রত্যক্ষ করি। যদিও এক চলমান জনতার অংশ কবি, যদিও মানুষ মাত্রেই আসঙ্গ-লিপ্সু—শহীদ কাদরী বরাবর জনতা-ভীরু আধুনিক কবি। জনতার এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খলতায় যদিও কবি চিন্তিত, কিন্তু জনশক্তিকে সংহত করতে তৎপর হতে তাকে দেখি না, আবার তাঁর জনতা-চিন্তনের মধ্যেই দেখি বিপরীত মনোভঙ্গীর জন্ম।

নেই এই ভীড়াক্রান্ত, বিব্রত, বর্বর উর্ধ্বশ্বাস শহরের
তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চীৎকার!
[ নপুংসক সন্তের উক্তি : উত্তরাধিকার ]

ভাব ও মননসিদ্ধ এই উদ্ধৃতিতে জনতাকে কবি আহ্বান করছেন মৃত শহর উদ্দীপ্ত করে তুলতে। জনতা এখানে স্থির, বহির্জগতের উদ্‌ভ্রান্তির সঙ্গে জনতা বিপরীত-মুখ ও বিমুখ; অথচ নগরের উচ্ছৃঙ্খলতাকে শৃঙ্খলায় আনতে পারে একমাত্র সচেতন-বোদ্ধা জনগণ। বিব্রত বর্বর এলায়িত শহরকে তীক্ষ্ণধার জনতাই পারে শাসন করতে, সেই জনতাকে কবি আবাহন করছেন। কিন্তু দেখা যায়:

দূর একটি ম্যানসনে, গাড়ী বারান্দায়
হল্লামুখর জনতার অংশ গল্পগুজবে ভরা
[ভরা বর্ষায় একজন লোক : উত্তরাধিকার]

জনতার কোলাহল-মুখরতা ও আদর্শচ্যুতি কবির আদর্শপরায়ণ চিত্তে আঘাতস্বরূপ, জনতার এই বিমুখতায় কবির মধ্যে বেদনা বিমূর্ত হয়ে উঠেছে

—জনতা যদি কর্মোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে নগর উন্নয়নে কৃতসঙ্কল্প না-হয় কবিচিত্ত আহত ও বেদনাবিহ্বল হবেই। তবে জনতার এই স্থিরধর্মী-বিমুখতা বলিষ্ঠ কর্মাদর্শে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতিও হতে পারে। কিন্তু

আমারি মুখের মতন হাজার
মুখের মিছিল
তোমার জন্য প্রতীক্ষায়।

[ প্রিয়তমাসু : উত্তরাধিকার ]

এখানে, প্রিয়তমা আর নিজের ঐকান্তিকা নয়, নাগরিক সভ্যতা ও আর্থিক সঙ্কট প্রিয়তমাকে হটিয়ে নিয়েছে পতিতালয়ের জীবিকাকুঞ্জে—জনতার জৈবিক জীবনই এখানে প্রধান।

এবার দেখতে পাই জনতার মিছিল শ্লোগান ভিন্ন অর্থ বহন করে আনছে। একদিন, দেখতে পাই, একদিন 'অনুসরণ করেছিলাম শ্লোগান দেয়া মিছিলগুলো/—আমাকে খুব মোহন স্বরে ডেকেছিলো!'
—কিন্তু এই আহ্বান, জনতার এই মোহন আহ্বান অন্য রকম। কারণ পর মুহূর্তেই আমরা জানতে পারি জনতার অনুগমন এই কারণে, জনতার কাছ থেকে নারীকে স্পর্শ করার সাহস সঞ্চয় করতে হবে, প্রিয়তমাকে পাওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করবে জনতা—

ভালোবাসার জন্য আমি শহরভরা প্ল্যাকার্ডগুলো
দারুণ যত্নে পড়েছিলাম, অন্ধকারে, একলা রাতে
পিস্তলের সে ঠাণ্ডা বাঁটের ধাতব কঠিন
শিউরানি সব পেয়েছিল এই করতল,
তোমার উষ্ণ স্তনের কাছে
নিরাপদে যাবেই ব'লে
বিপ্লবীদের আত্মচরিত ঘেঁটেছিলো রাত্রি জেগে
আমার ব্যর্থ আঙুলগুলো।

[ জতুগৃহ : তো. অ., প্রি. ]

'উত্তরাধিকার' কাব্যগ্রন্থের আরেকটি জনতা-প্রতিমায় দেখি কবি-চিত্ত জনতা-বিমুখ। জনতা-ভীরুতা কবিকে আত্মকেন্দ্রিক নির্বাসনে নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। জনতার প্রতি কবির বিভ্রম ও সংশয় কখনও দূর হয়নি,

বরং জনতা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে, জনতাকে বিশ্বাস করা যায় না। কেন? এর যথাযথ সদুত্তর নেই :

কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন
সদ্য উঠে-আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ!

[ নপুংসক সন্তের উক্তি : উত্তরাধিকার ]

জনতার কোলাহল, নির্বুদ্ধিতা ও রূঢ়তার আঘাত বস্তুত কবির হৃদয়-বৃত্তিতে প্রবল আঘাত। যে-আঘাত নির্জনতা-অন্বেষু তার কাছে জনতার ধূলি-ধূসরিত হট্টগোল চৈতন্য প্রবাহে প্রবল বাধা স্বরূপ, এইজন্য নিঃসঙ্গ শিল্পীর মনে জনতা-চিন্তনে বিপরীত মনোভঙ্গীর সুর ধ্বনিত হবে। এই ভাব থেকে দেখতে পাই পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে কবি প্রকাশ করেছেন আত্ম-সঙ্কুচিত ভাবনার। মননের মিশ্রণই এই বাক্‌চিত্রের উদ্ভব। জনতার স্রোতে কবি কত নির্বান্ধব একা ও সঙ্কুচিত, এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-সঙ্কুচিত জনতা প্রতিমাটি স্মর্তব্য :

সহেনা, সহেনা আর জনতার
জঘন্য মিতালী।

শহীদ কাদরীর আত্মমগ্ন-চিত্ত সুধীনদত্তের ভাবনার অনুবর্তী হয়ে সর্বদা জনতাকে বিভ্রান্ত-নির্বোধ দেখেছে, বস্তুত আধুনিক নগরের প্রতিবেশী হয়েও কবি জনতা-বিচ্ছিন্ন। এই জনতা তাই ছত্রভঙ্গ, পাশবিক শক্তির কাছে পরাজিত, পাশবিক শক্তির প্রতিমা-হিসাবে উল্লেখ্য :

ক. রাষ্ট্র বললেই মনে হয় নিষিদ্ধ প্যামফ্লেট,
গোপন ছাপাখানা, মেডিকেল
কলেজের মোড়ে 'ছত্রভঙ্গ জনতা—
দুইজন নিহত, পাঁচজন আহত'—

[ রাষ্ট্র মানেই.... : তো. অ., প্রি. ]

খ. কেননা এক বাচাল বাবুর্চির
সবল নেতৃত্বে
আর সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে
আমাদের স্বচ্ছল কিচেনে

অনর্গল রান্না হ'য়ে চলেছে আপন-মনে
নানা ধরনের মাংস—
নাইজেরিয়ার, আমেরিকার, সায়গনের, বাংলার
কালো, সাদা এবং ব্রাউন মাংস।
[ স্কিৎসোফ্রেনিয়া : ঐ ]

সমাজের মানুষ অমঙ্গল-বিভীষিকায় ক্লিষ্ট, বীভৎস-প্রতিমা কবিতায় ধরা দেবেই। সমাজের দুঃখী, উৎপীড়িত ও অপমানিত জনতার সঙ্গে এই পর্যন্ত কবিকে বিচ্ছিন্ন দেখেছি যদিও, জনতার প্রতি অনাস্থা কবির যতই প্রকাশ্য দেখি-না-কেন—অমঙ্গল-বিভীষিকায় কবিচিত্ত ঠিক কেঁপে-কেঁপে উঠছে, 'স্কিৎস্রোফ্রেনিয়া' এই ভাবধারা-পুষ্ট কবিতা। আরও লক্ষণীয় পাশবিক শক্তির প্রতিমার পাশাপাশি প্রিয়তম মাতৃভূমি ও প্রিয়জনের দলিত রূপ, দুঃস্বপ্ন অমঙ্গলের হাত থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। যেমন :

শহর ছেড়ে চলে যাবে সবাই
(এবং চলে যাচ্ছে দলে দলে)
কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ স্পর্শ ক'রে আমরা কয়েকজন
আজীবন র'য়ে যাবো বিদীর্ণ স্বদেশে, স্বজনের লাশের আশেপাশে।
[ নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে : তো. অ., প্রি. ]

শহীদ কাদরীর সৃজন-চেতনায় জনতাচিন্তা আত্মকেন্দ্রের দিকে প্রসারিত, বহির্জগৎ ও বহির্জগতের উল্লাস অন্তর্মুখী আবেগে সংহতি খুঁজেছে, জনতা-ভাবনা কবিচিত্তে অবশেষে মারাত্মক মানস-ব্যাধি সৃষ্টি করেছে। যেহেতু কবি জনতার কাতারে দাঁড়াতে পারেন না, যেহেতু এক ধরনের অনীহাবোধ এক ধরনের নৈঃসঙ্গ্য কবিকে জনতা-বিমুখ করেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্রধারী সৈনিক হতে বিরত রেখেছে—কবি এইজন্য একরকম অপরাধ-বোধে ক্লিষ্ট (যদিও আমরা জানি সকলের দ্বারা সকল কাজ সাধিত হয় না) কবির মুখে উচ্চারিত হয় :

গুনাগার হৃদয়ের মধ্যে ছদ্মবেশী গেরিলারা
খনন করছে গর্ত, ফাঁদ, দীর্ঘ কাঁটা বেড়া।
কাতার, জানু বেয়ে উঠছে একরোখা ট্যাঙ্কের
রক্তের ভেতর সাঁকো বেঁধে পার হলো
বিধ্বস্ত গোলন্দাজেরা,
[ স্কিৎসোফ্রেনিয়া : তো. অ., প্রি. ]

এখন, জনতা ব্যক্তি-মানসে নেমে এসেছে ব্যাধি হয়ে, যে-ব্যক্তি-মানুষ জনতা-ছিন্ন থেকে নিজেকে সকল সমস্যার উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছে সেই ব্যক্তি-মানুষ আজ ছিন্নভিন্ন, যেন পাপবোধ তাকে তাড়িত করে চলছে, যেন এক ধরনের অপরাধবোধে সে আজ মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত—তারই বাক্-প্রতিমা :

> একটি চুম্বনের মধ্যে সচীৎকার ঝলসে গেল কয়েকটা মুখ,
> একটি নিবিড় আলিঙ্গনের আয়ুষ্কালে
> ৬০,০০০,০০ উদ্বাস্তুর উদ্বিগ্ন দঙ্গল,
> লাফিয়ে উঠলো এই টেবিলের 'পর ;
>
> [ স্কিৎসোফ্রেনিয়া : ঐ ]

কবিতাটি এক মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষের কথা, যে মানুষ যুদ্ধের ধ্বংস দেখে চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় সমস্ত কিছুই এক পরম্পরায় চালিত ; যদিও মানসিক উচচালিত ভাবনাসমূহ বাহ্যিকভাবে প্রবল ভারসাম্যহীন। কবিতাটির শেষ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু বস্তুত মানুষ—মানুষের মাংস এখন আর শকুন-শেয়ালের খাদ্য নয়, মানুষই হয়েছে এখন মানব-মাংসাশী। এই ক্লেদজ-পৃথিবী, পৃথিবীর এই মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত পরিবেষ্টনীতে তবুও শিল্পী আশাবাদী এবং সমষ্টি চরিত্র এখানে ব্যক্তিচরিত্রে নিবিড়ভাবে মিশ্র হয়ে গেছে।

প্রত্যেক কবি তাঁর নিজস্ব কতক প্রিয় শব্দ এবং প্রিয় রূপক-প্রতীক ব্যবহার করে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন, পরবর্তীকালে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিশীল শতাব্দীকে প্রভাবিত করে রাখে ; তাতে গভীরভাবে প্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন তাঁর কবিতার সঙ্গে দীর্ঘতর ও নিবিড়তর সহবাস। শহীদ কাদরী তাঁর কবিতাকে আধুনিক দুর্বোধ্যতার আবর্তে না-ফেলে বরং করে তুলেছেন প্রাঞ্জল ঘন গভীর এবং ইঙ্গিতে দূরপ্রসারী। তাঁর কবিতার বৈচিত্র্য কয়েকটি শব্দের মধ্যে, এই স্বল্প উপকরণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চিত্রের সংখ্যা কম—কিন্তু প্রসাধনকলায় তাঁর কবিতা লক্ষ্যভেদী। বোদলেয়র বললে যেমন বিষাদ বিতৃষ্ণা নির্বেদ ইন্দ্রিয়বিলাস দারিদ্র পতিতা মৃত্যু বুঝি বা তাঁর কবিতার বৃহত্তম অংশ জুড়ে এর উল্লেখ, রিল্কে বললে গোলাপ (এই সঙ্গে 'গোলাপের অনুষঙ্গ' কবিতায় ব্লেক-এর

গোলাপও স্মর্তব্য, 'টাকাগুলো কবে পাবো' কবিতায় গ্রেগরী করসোর উক্তিতে যেমন তাঁর মানসভঙ্গির পরিচয় মেলে ) ; শহীদ কাদরীর দুটি প্রিয় শব্দ 'পাখি' ও 'চুল' যা বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে আবর্তনশীল ও আন্দোলন-ধর্মী—শব্দ দু'টির বাক্‌চিত্র অনুসরণ করা যেতে পারে।

পাখি : কোলরিজে পাই আলবাট্রস হত্যা হেতু নাবিকের নির্মম পরিণতি-চিত্র, আবার বোদলেয়রের কাছেও আলবাট্রস সমুদ্রসম্রাট এবং পথদ্রষ্টা ( বিশাল আলবাট্রস, সমুদ্রের বিহঙ্গপুঙ্গব,/যে, পেরিয়ে সমুদ্রের তিক্ত ফেনা, আলস্যে সঞ্চরে,/জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা, পথের বান্ধব।)/ শেলী ও ওয়ার্ডসওয়র্থের স্কাইলার্ক কবি সত্তার প্রতীক, কিংবা জীবনানন্দের রবারের বলের মত ছোট পাখি এবং পিকাসোর শ্বেত কপোত—তাঁদের প্রত্যেকের স্ট পাখি স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতোদ্ভাসিত এবং সেই জন্য তার আবেদন আজ এত সর্বপ্লাবী। ইংরেজি সাহিত্যে পাখি শক্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক, এই শক্তি জৈবিক উদ্দামতা ও মানস শক্তির উল্লাস যুগপৎ, পাখিতে চাঞ্চল্য ও স্থৈর্য দুইই—শহীদ কাদরীর কাছে পাখি দ্রষ্টা, স্বাধীন সত্তা ও শিল্পীর প্রতীক। তাঁর দু'টি কাব্য গ্রন্থে ('পাখিরা সিগন্যাল দেয়' কবিতা ছাড়া) অন্তত, আটাশবার পাখির সাক্ষাৎ মেলে, তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির মাঝে শুনতে পাই এক মঞ্জুল আহ্বান ও নিঃসঙ্গ বিষাদ—যা মানুষের মনের এমন কোন-কোন স্তরের উল্লেখ করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন মনুষ্যত্বের একটি লক্ষণ (জীবমাত্রেরই প্রাণের ব্যথা সমান), দ্বিধাহীন ঘোষণা করলেন :

পাখির মাংসও আজ আর
পছন্দ করিনা।

[ নীল জলের রান্না : তো. অ., প্রি. ]

কারণ পাখি ও শিল্পী অভিন্ন সত্তার অধিকারী, যেমন ওয়ার্ডসওয়র্থ ও শেলী তাঁদের স্ব স্ব স্কাইলার্কের সঙ্গে ছিলেন অভিন্ন আপন-সত্তা।

পাখির চাঞ্চল্য-গতিশীলতা-উল্লাস, জীবন-প্রকাশ, অর্থাৎ পাখির দৃশ্যমান প্রতিমা অনুভবের দিকে দ্রুত সঞ্চরমান :

নীল হলুদ ফুর্তিবাজ পাখিদের আনন্দগুলো
তরুণ-তরুণীর চোখে, উৎসবে, বর্ণালী বালবে
ত্রিলোকের অন্ধকারে সকল আঙুর ক্ষেতে
একটি উজ্জ্বল বড় মুদ্রা জ্যোতিচক্রের মত ঘিরেছে জীবনকে ;

[ দুই প্রেক্ষিত : উত্তরাধিকার ]

পুনরায়, এই স্বাধীনসত্তা পাখি, কবিতার শব্দের মত পাখি, কিংবা প্লেনগানের গর্জনে ভীত পাখির মত কবিতা আজ বিপর্যস্ত; এখানেও পাখির দৃশ্যমান ও গতিমান প্রতিমা ধীরে-ধীরে মননের দিকে উচচালিত। যুদ্ধের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় কবিতা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, পাখিরাও কি নৃশংসতাকে পক্ষ-বিধুননের ইন্দ্রজালে ডুবিয়ে দিতে পারবে না। বাক্-প্রতিমাটি উপমান-উপমেয়ের তুল্যে মননশীলতার দিকে অভিসারী :

> হে আমার শব্দমালা, তুমি কি এখনও বৃষ্টি-ভেজা বিব্রত কাকের মতো
> আমার ক্ষমতাহীন ডাইরির পাতার ভেতরে বসে নিঃশব্দে ঝিমুবে, তা-হ'লে তোমার ধ্যানে আবাল্য দুর্নাম কিনে আমি অনর্থক বড়াই করেছি।
>
> [ কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার : তো. অ., প্রি. ]

কিন্তু পূর্বকার সারি-সারি পাখির প্রতিকৃতি, সারি-সারি পাখিদের বিষন্ন চোখ, পাখিদের দলবদ্ধ অসহায়ত্ব—আমাদের অবশেষে বিশ্বাসী করে তোলে যে পাখিরাই দ্রষ্টা, অবশেষে শত বিরুদ্ধতার মধ্যেও জানতে পারি একমাত্র পাখির চোখেই আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে—যুদ্ধের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে শুধু পাখিরাই পারে উর্ধ্বে ডানা মেলে দিতে :

> মাথার ওপরে শুধু ক'টা পাখি উপেক্ষা করছে সব মানা
> অসম্ভব স্বাধীনতায় আকাশে উড্ডীন দেখি
> আইডেন্টিটি কার্ডহীন ডানা॥
>
> [ পাখিরা সিগ্‌ন্যাল দেয় : তো. অ., প্রি. ]

চুল ও অশ্বের বাক্‌প্রতিমা শহীদ কাদরীর কবিতায় কখনও কখনও একাকার হয়ে গেছে। 'সেলুনে যাওয়ার আগে' কবিতায় শিল্পীর স্বাধীনতার প্রতীক চুলের উল্লাস দেখি অশ্বের বীর্যবত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিল্পীর উদ্দাম চুল চিরকাল উর্ধ্বে উড্ডীন থাকবে, রাষ্ট্রযন্ত্র তার উপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না—স্যামসনের চুলই যেমন সকল শক্তির উৎস। নীচের দু'টি বাক্‌প্রতিমায় বিপ্লবী ঝড় ও অশ্বের সঙ্গে চুলের সখ্যতা বর্ণিত। চুলের উপমান অশ্ব, কিন্তু উপমান ও উপমেয় যুগপৎ একাকার হয়ে সুনিপুণ সংযোজনায় ও সূক্ষ্ম অভিনিবেশ এই তুল্যমূল্য বাক্‌প্রতিমা রচনা করেছে :

সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত
এই কালো পাগলা অশ্বের ভয়ে, যদি
টগবগ ক'রে হঠাৎ মাড়িয়ে যায়
ভর-দুপুরের ট্রাফিক, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন
হয়ত আহত হবে,

[ সেলুনে যাওয়ার আগে : তো. অ., প্রি. ]

অথবা,

তবু সে আমার চুল
অন্ধ
মূক ও বধির চুল মাস না যেতেই
আহত অশ্বের মতো আবার লাফিয়ে উঠছে অবিরাম।

[ ঐ : ঐ ]

শহরে বৃষ্টির একটি সুন্দর বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন শহীদ কাদরী। এই দৃশ্যটি প্রায় মানবিক চেতনায় আরোপিত হয়ে গেছে, এই বর্ণনায় গতির যে উল্লাস শব্দের যে ক্রেংকার—উপমা সমাহার ও শৈল্পিক করণ-কৌশলময় এমন চিত্র খুব কমই দৃষ্ট হয়।

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে
যারা ছিলো তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মত যেনবা মড়কে
শহর উজাড় হবে,—বলে গেল কেউ—শহরের
পরিচিত ঘন্টা নেড়ে নেড়ে খুব ঠাণ্ডা এক ভয়াল গলায়

.... .... .... .... ....

নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ
মেঘ, জল, হাওয়া,—
হাওয়া, ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চীৎকার,
কী বিপদগ্রস্ত ঘর-দোর,
ডানা মেলে দিতে চায় জানালা-কপাট
নড়ে ওঠে টিরোনসিরসের মতন যেন প্রাচীন এ-বাড়ী!
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় জনারণ্য, শহরের জানু
আর চকচকে ঝলমলে বেসামাল এভিনিউ

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)
বৃষ্টি পড়ে মোটরের বেনেটে টেরচা,
ভেতরে নিস্তব্ধ যাত্রী, মাথা নীচু
ত্রাস আর উৎকন্ঠায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে,—জল,
অবিরল

জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল,

[বৃষ্টি, বৃষ্টি : উত্তরাধিকার]

বাক্‌সংযোজনায় যে যে প্রতিমা রচিত হল, এবার, দুটি শ্রেষ্ঠ বাক্‌-প্রতিমার উল্লেখ করে আলোচনার সমাপ্তি টানছি—নিম্নোক্ত দু'টি বাক্‌-প্রতিমায় কবির সৃজনী-চেতনা কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অধিক অনুরক্ত লক্ষ্য করুন :

যেন সমুদ্রোচ্ছ্বাস তার বাহুতে, কটিতে
জঙঘার আলোড়নে, নিতম্বের তৃষ্ণার্ত তরঙ্গে
তরোয়ালের মত কিংবা তীক্ষ্ণ ধারালো চাঁদের মত
চোখের আঁধারে ঐ স্বর্গের ডাইনী যেন গতির পুলকে
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়।

[নর্তকী : উত্তরাধিকার]

হস্তধৃত এক ঐন্দ্রজালিক লাটাই
নীলাভ আকাশে ওড়া শাদা বগার মতন ক্রন্দন পেরুনো কোনো ঘুড়ি?
ছিলো নাকি স্বচ্ছল স্বর্গের চাবি? রং-বেরঙের কিছু শার্ট?
আত্মার পতন কিংবা সূর্যকরোজ্জ্বল
মুসার উত্থান?

[শেষ বংশধর : তো. অ., প্রি.]

দু'টি উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমার শব্দে দৃশ্য-ঘ্রাণ-স্পর্শ, বস্তু-ভাব-মনন, সরল-জটিল, ইত্যাদি বহুগুণিক ও বহুমাত্রিক চিত্রাবলী ভীড় করেছে; কবি বস্তু থেকে পরাবস্তুতে ভাবনাকে সঞ্চারিত করেছেন। প্রথমোক্ত

উদ্ধৃতিতে ইয়েটস-এর মত শহীদ কাদরীও নর্তকী থেকে নৃত্যকে (আধার থেকে আধেয়কে) বিশ্লিষ্ট ও বিভাজনের কথা ভাবতে পারেন না। নর্তকীর দেহ-ভঙ্গীতে উত্তেজনা ও উদ্দামতা আছে, ঐ নর্তকী স্বর্গের ডাইনীর মত বার বার কটাক্ষে ও হাতের মুদ্রায় (অঙ্গ-সঞ্চালনে) মোহন আহ্বান করছে, ডাইনীর মোহময় আহ্বানের মত তৃষ্ণা ও কামনা ঝরে পড়ছে (ম্যাকবেথে: ডাইনীরা উচ্চাশায় উদ্দীপ্ত করেছে), অবশেষে নর্তকীর গতির পুলক থেকে তীব্র জ্যোৎস্নার মত অলৌকিক সৌন্দর্য-সৌরভ উদ্ভাসিত। কিন্তু তবুও নৃত্যকে কিছুতেই নর্তকী থেকে পৃথক করা যায় না, অর্থাৎ সৌন্দর্যকে আধার থেকে কখনও বিশ্লিষ্ট করা যাবে না। এখানে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ও ধ্বনিময়তা, কটি ও মহান জঙঘার লাস্যময় আন্দোলন (বোদলেয়র: মহান জঙঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন/জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন/যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে/গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।), নিতম্বের তৃষ্ণা বিস্তার, তরোয়াল বা বাঁকা চাঁদের ভ্রু-ভঙ্গিতে অন্ধকার আমন্ত্রণ, স্বর্গের ডাইনীর মত মোহন আহ্বান, কিন্তু এই গতির চিত্রটি অবশেষে তীব্র জ্যোৎস্নার (লক্ষণীয় তীব্র শব্দটি) এবং জ্যোৎস্নার শুচিশুভ্রতায় (শিল্পের শুচিতায়) অপরূপ ও অপার্থিব হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, হস্ত লাটাই আকাশ বগা (বক) ঘুড়ি চাবি শার্ট সূর্য চাক্ষুষ চিত্র; কিন্তু ক্রন্দন পেরুনো ঘুড়ি শব্দচিত্র, রঙবেরঙের শার্ট গন্ধ ও স্পর্শ চিত্র; আবার ঐন্দ্রজালিক লাটাই, স্বর্গের ভাবানুষঙ্গ, আত্মার পতন-এর মনন, মুসার উত্থান-এ প্রাচীন ধূসর জগতের স্বাদ—সার্বিক রকমের বাক্‌প্রতিমার সমাবেশ একটিমাত্র স্তবক-বিন্যাসে বর্ণময় হয়ে উঠেছে,। বাক্‌প্রতিমা দু'টি আমাদের বস্তু পৃথিবী থেকে আরেক জগতে উচ্চালিত করে; রূপায়নের বর্ণনীয় অভিঘাতে ও অভিক্ষেপে একটি গতিমান দ্যুতিময় আবর্তনশীল উজ্জ্বলতা অবশেষে আমাদের এক মায়াময় জগতে পৌঁছিয়ে দেয় (অথচ বস্তুজগত থেকে তা একেবারে বিশ্লিষ্ট নয়), এমন এক শিহরণ বস্তু ও বস্তুবহির্ভূত উপলব্ধিতে মুগ্ধ করে—পাঠকচিত্ত এইভাবে শ্রেষ্ঠ বাক্‌প্রতিমার স্বাদ গ্রহণ করেন।

## সপ্তম অধ্যায়

কাব্যকলায় বাক্‌চিত্র ধ্রুবতারার মতো অনির্বাণ, পাঠকের কাছে তার সংক্রাম মূল্যবান এবং প্রেরণাদাত্রী। কবিতা বাক্যের সাহায্যে, বাক্‌-সংযোজনে যে প্রতিমা সৃষ্টি করে তা পাঠকের ইন্দ্রিয়সমূহে দিব্যরূপ ও দিব্যকান্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়। কবিতা দৃশ্যমান, শ্রব্যমান, ঘ্রাণলিপ্ত, স্বাদযুক্ত ও স্পর্শেন্দ্রিয়কে মাতাল করে; মাতাল করে ভাব-ভাষা-ছন্দ ইত্যাদির শোভনতায় পারিপাট্যে, ইঙ্গিতধর্মিতায়। আবার, শব্দের সরল সাধারণ আভিধানিক অর্থ, তার বহুধা বিস্তৃত অর্থ এবং প্রতীকী মর্যাদা কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়—বাক্‌প্রতিমা এই সকলের সন্নিপাতে পাঠকের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সাড়া জাগায়।

বাক্‌প্রতিমা নির্মিতিতে রফিক আজাদের সাফল্য ও ব্যঞ্জনা কতটুকু সঞ্চার করেছে উদ্ধৃতি সহযোগে বিচার করা যেতে পারে। তাঁর ছন্দ-সম্পদ ও বাক্‌-ব্যঞ্জনা কবিতার অবয়ব নির্মাণে যে করণ-কৌশল সৃষ্টি করেছে, সেতো ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার আরেক রূপ; কেননা কবিতা ইন্দ্রিয়বেদী।

প্রথমে দৃশ্যরূপময় বাক্‌প্রতিমায় তাঁর সফলতা লক্ষনীয় :

> দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, প্রতিশ্রুতি হে প্রিয় দরোজা,
> শৈশবের পরিত্যক্ত ভো-ভো মাঠ থেকে, ধুলো-পায়ে,
> এই দ্যাখো কুড়িয়ে এনেছি আমি হারানো বেলুন—
>
> [ হে দরোজা : অসম্ভবের পায়ে ]

> খণ্ডিত ব্রিজের মতো নতমুখে তোমার প্রতিই
> নীরবে দাঁড়িয়ে আছি :
>
> [ মাধবী এসেই বলে যাই : ঐ ]

> তবে অশ্রুজল ছাড়া ঐ পদপল্লবে
> আর কি দেবার আছে ?....কেবল চোখের জলে ভ'রে দিতে পারি
> একটি অদৃশ্য, শুষ্ক বঙ্গোপসাগর ॥
>
> [ স্মৃতি, চাঁদের মতো ঘড়ি : ঐ ]

নগরে-বন্দরে আমি গ্রামে-গঞ্জে অবিরাম
ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরি পরশ পাথর,

[ চন্দ্রাহত কেরানীর রবিবার : সী.জ.সী.স. ]

উদ্ধৃত চারটি বাক্‌প্রতিমাই দৃশ্যরূপময়, অর্থাৎ চক্ষু-বিনোদন। প্রথমে : কবি শিল্পের মায়াময় জগতে প্রবেশ-প্রত্যাশী, কিন্তু শিল্পের দুয়ার রুদ্ধ—রুদ্ধ হলেও শিল্পের প্রবেশ-পথের দরোজা শিল্পীর কাছে প্রতিশ্রুতিশীল, আর প্রবেশপত্ররূপ হারানো বেলুন তিনি শৈশবের পরিত্যক্ত ভো-ভো মাঠ থেকে ধুলো-পায়ে কুড়িয়ে এনেছেন—দরোজা এখন আর বন্ধ থাকা উচিত নয়। দরোজাটি প্রতিশ্রুত বলার সঙ্গে-সঙ্গে তাৎপর্য হয়ে উঠেছে গভীর প্রত্যয়শীল, শিল্পীর আত্ম-প্রত্যয় এখানে প্রথম থেকেই তুঙ্গ-স্পর্শী—পরবর্তী-কালে এই প্রত্যয় ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত 'আমি' বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পাই খণ্ডিত দ্বিজের মতো বেদনার্ত বিষণ্ণ আহত আর্ত কবি নম্রমুখে মাধবী নাম্নী মানস-প্রিয়ার জন্য নীরবে প্রতীক্ষারত। বস্তুত শিল্প এবং মাধবী অভিন্ন-হৃদয়া। এইজন্য তৃতীয় উদাহরণে দেখি : কবি জীবনদেবতার পদতলে 'অশ্রুজল' ছাড়া অর্ঘ্য রচনার উপকরণ আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না, এই চোখের জলের শক্তি এমন পরাক্রান্ত যে বিপুলতায় তা বঙ্গোপসাগর হবে। কবি এখানে বঙ্গোপসাগরের উপমা এনেছেন, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে একটি অদৃশ্য শুষ্ক উপসাগরই কবির বর্ণনায় দৃশ্যমান। আবার অশ্রুর গতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের গতিমান এবং শব্দমান প্রতিমার, অন্যদিকে পদপল্লবে অশ্রু নিবেদনের চিত্রটি সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়কেও করে তুলছে উদ্বেল। চতুর্থ উদ্ধৃতি আমাদের পূর্বোল্লিখিত ভাবনাকে পুষ্ট করছে। এখানে নগর-বন্দর গ্রাম-গঞ্জ দৃশ্যমান স্থিরচিত্রকে ভাসিত করছে, কিন্তু দৃশ্যমান স্থিরচিত্রটি পরমুহূর্তে ক্ষ্যাপার পরশ পাথর অন্বেষণে হয়ে উঠল গতিমান ও আবেগধর্মী বাক্‌প্রতিমা। আবার, এই ক্ষ্যাপাকে যদিও চন্দ্রাহত কেরানীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু এই ক্ষ্যাপা-কেরানীই শিল্পী, এই ক্ষ্যাপা-শিল্পীই কাব্যজগতের বন্ধ দরোজার অর্গল খুলবেন। এই পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমা দৃশ্যমান, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের চক্ষুকেই এরা উদ্বেলিত ও উচ্চকিত করেছে।

শব্দহীন চ'লে যাবে জীবনের দরকারি গাড়ি—
কেননা, ধ্বংসের আগে সাইরেন কেউ বাজাবে না।

[ নগর ধ্বংসের আগে : অসম্ভবের পায়ে ]

প্রিয়তম হে গর্বিনী মুঘল রমণী,
বহুদিন তোমার গভীরে আলোকিত রাস্তায় ভ্রমণ করেছি একাকী,
অথচ আশ্চর্য! এমন মনে হয়নি যে তুমি ধরা দিয়েছো।
বরং আমার কাছ থেকে পালিয়েই বেড়িয়েছো—
ফুটফুটে ছোট্ট খুকীর মতো, দুষ্টু, ফাঁকি দিয়েছো শুধু....

['স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' : ঐ]

মলিন বসন ফেলে—নগ্ন আমি,
নাক্ষত্রিক, ছুটে যাবো অমলিন আলোর উদ্দেশে—
কখনো তোমার ডাক পশে যদি কানে॥

['রোগশয্যায়' : ঐ]

যেন গর্ভগৃহ থেকে নেমে ডিনামাইটের মতো
অসম্ভব তোলপাড় জুড়ে দিলো একটি শৈশব।

অবিশ্বাস্য উষ্ণতায়, চাপে দ্রুত গ'লে যেতে থাকে
ঘড়ির ডায়াল আর তোমারো নিটোল অবয়ব।

[মাধবী এসেই বলে : যাই : ঐ]

এই পর্যায়ের প্রথম উদ্ধৃতির চিত্ররূপ : জীবন, মৃত্যু এবং জীবন-মৃত্যুর প্রতিবেশ এখানে একই পঙক্তিতে সন্নিবেশিত; জীবনের দরকারি গাড়ি নামক জীবন একদিন শব্দহীন চলে যাবে, তখন কেউ সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক করে দিতে বা পথ দেখাতে আসবে না, ব্যর্থতা নিয়ে অপূর্ণ আশা নিয়ে মৃত্যুর অঙ্কলীন হতে হবে সকলকে (এই কবিতার প্রারম্ভে বলা আছে—শেষতম ঘড়ি ভেঙে যাবে, সময় জ্ঞাপক কিছুই থাকবে না, মৃতদের ঈর্ষা করেও কিছু মিলবে না, 'জাহাজ জাহাজ' বলে চীৎকার করলেও উদ্ধারকারী কেউ ছুটে আসবে না।)। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পাই; চিরায়ত গর্বিনী মুগল রমণীর ভালোবাসায় মগ্ন প্রেমিক-পুরুষ ধীরে-ধীরে স্বপ্ন-প্রয়াণ করছে, রমণীর শরীরে-প্রেমে বহুবার একাকী ভ্রমণ করেও সেই মুঘল রমণী রয়ে গেলো অধরা, শুধু অধরা নয় বরং ফুটফুটে ছোট্ট খুকীর মতো সেই দুষ্টু চিরায়ত নারী চিরকাল শুধু ফাঁকিই দিয়েছে। তৃতীয় উদাহরণে পাই : মলিন বসন ফেলে, জীবনের জীর্ণতা বর্জন করে, সবকিছু ফেলে নগ্ন-সরল

আমি নক্ষত্রের শব্দহীন বেগে নীল আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে অমলিন আলোর দিকে চলে যাবো। এই চলার পথ উন্মুক্ত হবে একমাত্র প্রিয়তমার আহ্বানে। এখানেও বর্তমান থেকে বাস্তব, বাস্তব থেকে আরেক লোকে গমনের চিত্র দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য হয়ে উঠলো। চতুর্থ উদাহরণে দেখি : একটি শিশুর জন্মের সোচ্চার প্রকাশের মতো বালক বয়স তোলপাড় শুরু করলো। শ্রব্যমান এই বাক্‌প্রতিমাও শৈশবের আরেক জগতে নিয়ে চলে আমাদের, স্বপ্নের দিকে যাত্রা চলে। পঞ্চম উদ্ধৃতিতে মাধবীর অবয়ব গলে তরল হয়ে যাচ্ছে, শুধু মাধবীর অবয়ব নয় এই সঙ্গে সময়ের পরিমাপ জ্ঞাপক ঘড়িও তরল হয়—বাস্তব থেকে অন্য এক জগতে আমাদের প্রবেশ হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমা প্রথম শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে, প্রথমোক্ত বাক্‌প্রতিমাবলী দৃশ্যরূপময় আর এই শ্রেণীর বাক্‌-প্রতিমা দৃশ্যমান হয়েও অনুভূতির রাজ্যে এক অপার্থিব জগতের সন্ধান দিচ্ছে। এই সকল বাক্‌প্রতিমায় প্রস্ফুটিত চিত্রাবলী পূর্বের চিত্ররূপ থেকে রূপগত ও চরিত্রগতভাবে ভিন্নধর্মী, কেননা, আমরা এখানে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগত থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে হাত বাড়িয়েছি, যদিও জানি সেই জগত অধরা ও মায়াময়; অর্থাৎ দেখার জগত থেকে না-দেখা জগতে কবি আমাদের হাত ধরে নিয়ে যেতে চান—প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে ছুটি মিলবে বলে এবং সেই সঙ্গে কবিতায় ভাবানুষঙ্গের জগতের অনুভব জাগলো। বাক্‌চিত্র নির্মাণে কবির সফলতা এখানে অনুসরণযোগ্য।

অন্য এক পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমা :

তুমি সেই লোকশ্রুত পুরাতন অবাস্তব পাখি,
সোনালি নিবিড় ডানা ঝাপটালে ঝ'রে পড়ে যার
চতুর্দিকে আনন্দ, টাকার থলি, ভীষণ সৌরভ।

রোমশ বালুকা-বেলা খেলা করে রৌদ্রদগ্ধ তটে;
অস্তিত্বের দূরতম দ্বীপে এই দুঃসহ নির্জনে
কেবল তোমার জন্যে ব'সে আছি উন্মুখ আগ্রহে—

সুন্দর শাম্পানে চ'ড়ে মাধবী এসেই বলে—'যাই'।।

[ মাধবী এসেই বলে : যাই : অসম্ভবের পায়ে ]

ফানুস-মানুষদের এই বিরাট
　　সুগোল গোলক-ধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি
সীমিত সময় থেকে স ম য় হী ন তা য়
　　কেননা, সময়ের দুর্গন্ধময় ড্রেনে
　　নষ্ট-স্পার্মের মতো প'ড়ে থাকতে চাই না আমি.

.... .... .... .... .... .... .... .... ....

সেই গ্রহে
কোনো ফানুসিক ক্ষুধা ও পিপাসা থাকবে না—
মানুষ যেখানে
ব্যতীত কোমল স্বপ্ন
　　অন্য খাদ্য গ্রহণও করবে না।

[বাতাসের উল্টোদিকে যাত্রা : ঐ]

এই পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমার রূপ : মোহিনী ও চিরায়মান সময়ের সবচেয়ে দ্রুত রথে চড়ে প্রেম ও প্রেমিকা আসে আবার ফিরে যায়, কোথায় যায় অথবা কোথা থেকে আসে কেউ বলতে পারে না, আগমনে আনন্দ-গীত-সৌরভ-সচ্ছন্নতা সবই ফিরে আসে। এইজন্য মাধবীর জন্য এত উন্মুখ আগ্রহ, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে তাই এমন তীব্র ঝণাৎকার। কিন্তু এই নিবিড় আগ্রহ-উন্মত্ততা তুচ্ছ করে মাধবী পুনরায় চলে যায়।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পাই : সময় থেকে সময়হীনতার রাজ্যে বিচরণশীলতা, ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন অলৌকিক রাজ্যে স্বপ্ন-খাদ্য গ্রহণ, আবার এখানেই 'নষ্ট-স্পার্মের মতো পড়ে থাকতে চাই না' বলে স্পষ্ট ঘোষণা ধ্বনিত হয়; অর্থাৎ অবাস্তব অলৌকিক রাজ্যে প্রবেশ করেও একটি প্রদীপ্ত ঘোষণা উচ্চকিত শোনা গেলো--সবকিছুর মধ্যে জীবিত এক 'আমি'কে প্রত্যক্ষ করলাম, যাকে আমরা পরবর্তী 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে' কাব্যগ্রন্থে নিনাদিত হয়ে বাজতে শুনেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমা থেকে এই তৃতীয় পর্বে পৌঁছে আমরা চির. রহস্যময়তা, সময়ের সময়হীনতা, অলৌকিক স্বপ্নসুধা পান করে জীবন ধারণের ঘোষণা শুনতে পেয়েছি, সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের জয়ধ্বনিও। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে অতীন্দ্রিয়ে গমন-করে আবার ইন্দ্রিয়লোকে ফিরে আসাই জীবনের লক্ষণ, অবরোহণের পর্যায়ে আমরা অতীন্দ্রিয় জগত থেকে মর্তলোকে ফিরে আসি—এই আসা-যাওয়ার পথের

বর্ণনায় কবির বাক্‌প্রতিমা আমাদের অনুভূতির রাজ্যের সন্ধান দিয়েছেন —তৃতীয় পর্বের বাক্‌প্রতিমা তাই বাক্‌চিত্রের বহুধাবিস্তৃত অর্থকেই বিশ্লেষণে পরিস্ফুট করেছে।

কয়েকটি সহজ সরল সাধারণ বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি, এই পাওয়া অপ্রত্যাশিত নয়, কেননা প্রত্যেকটি বাক্‌প্রতিমা শিল্প-সৌকর্যে নিটোল তুলনাহীন হবে এমন অসম্ভব আশা করা অসঙ্গতও বৈকি। 'অসম্ভবের পায়ে' রফিক আজাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, তাই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কবিকৃতি ও কবিচিত্ত শুধু সৃজন বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং সন্ধানশীলমাত্র। দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাক :

কারুকার্যময় হে দরোজা, তোমার গভীরে....

[ হে দরোজা : ঐ ]

নীরবেই ত্যাগ ক'রে যাই আমি বিফল রোদনে।।

[ ঐ : ঐ ]

চারপাশে অগভীর অস্বচ্ছ মলিন জলরাশি।

[ নগর ধ্বংসের আগে : ঐ ]

ট্রাক-চাপা-পড়া কুকুরের মতো থেৎলে যাচ্ছে;

[ শরীরী পুতুল : ঐ ]

প্রচুর খেয়েছে সে গ্রামের সবুজ সতেজ শব্জী,
পুকুরের মাছ, পালিত গোরুর দুধ, কচি ডাব;
শহরতলীর কলা, আনারস, ঝুনা-নারিকেল;

[ খাদ্যান্বেষণ : ঐ ]

বাক্‌প্রতিমাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সহজ সরল নির্দ্বন্দ্ব, এমনকি প্রকাশ-ভঙ্গিতেও নতুনত্ব নেই মনে হতে পারে। কিন্তু সমগ্র কবিতার পটভূমিতে এই সকল বাক্‌প্রতিমা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময়। যেমন, 'কারুকার্যময় হে দরোজা' বললেই আমরা স্বাভাবিক অর্থে প্রাচীনকালের কারুকার্যখচিত দরোজাটি বুঝি, এমনকি চৈনিক কারিগরের অপূর্ব কারুকার্যময় দরোজাও আমাদের স্মৃতি-পথে চলে আসে, কিন্তু সমগ্র কবিতা-পাঠে জানতে পারি এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পের দরোজার চিত্রই কবি এখানে দৃশ্যময় ও ভাব-মণ্ডিত করেছেন। আবার শেষতম বাক্‌প্রতিমাটি একটি খাদ্য তালিকামাত্র,

পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বাক্‌চিত্র, কিন্তু যখনই এই তালিকা শেষে অর্থাৎ-স্তবকটি সমাপ্ত হয় এবং শুনতে পাই, '—কিছুতেই পারে না সে খেতে এই-সব পরিচিত/খাদ্যাবলী;—বিবমিষা লাগে।' তখনই বাক্‌চিত্রটি আরেক অর্থে সুষমামণ্ডিত হয়, ব্যঞ্জনাবহুল প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে।

আবার পরবর্তী পর্যায়ে দেখি অন্য এক রকম বাক্‌চিত্র—স্বপ্নের সন্ধানে, সন্ধানে-সন্ধানে স্বপ্নময়, সুন্দরের স্বপ্নে পিপাসাগ্রস্থ—এই পর্বের বাক্‌প্রতিমা সহজ সাধারণ অর্থের সীমায় বদ্ধ না-থেকে কল্পনাবৃত্তিকে এবং পাঠককেও নিয়ে চলে বহুদূর উজ্জয়িনী-অলকায়। বাস্তবের আবদ্ধ-চাপে স্পৃষ্ট মানুষ স্বপ্ন দেখে, এমন বাক্‌চিত্র রফিক আজাদের কবিতায় বিরল নয়। এইসব চিত্রাবলী সুঠাম, সুবিন্যস্ত ও সর্বাঙ্গীণ প্রতিমা-দীপ্তিতে ভাস্বর। 'জন্মদাতার প্রতি' কবিতার বাক্‌প্রতিমার কথাই প্রথমে উদ্ধৃত করি: বৃদ্ধ পিতার শ্বেত-শুভ্র শশ্রুতে যে স্বপ্নের খেলা, শশ্রু তো নয় যেন রাজহংসের সাদা পালক, দাড়িতে আর তিনি তখন হাত রাখেন না। স্পর্শ করেন সাদা নরম পাখির পালক, পাখির পালক তো নয় স্বপ্নরাই শুধু সেখানে খেলা করে এবং প্রিয়তম জনকও তখন স্বপ্নকে স্পর্শ করে স্বপ্নময় হয়ে যান। অথবা জন্মদাতা স্বপ্নাবলী নিয়ে শুধু নিজে খেলা করেন না, স্বপ্ন ছড়িয়ে উদ্দাম-উত্তাল করে তোলেন সকলকে: 'বিদেশী ডিশের মতো উপাদেয় স্বপ্নের সম্ভার/টেবিলের 'পরে রাখো ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে,/প্রতিদিন যথারীতি ব্রেকফাষ্টকালীন আলাপে।'—লক্ষণীয় স্বপ্নকে বিদেশী ডিশের মতো উপাদেয় বলা হচ্ছে, এবং এই খাদ্য পরিবেশিত হচ্ছে ব্রেকফাষ্টকালীন আলাপে। অথচ জন্মদাতার সন্তান রবারের বলের মতন স্বপ্নে কোনোদিন মগ্ন হয়ে স্বপ্নময় হতে পারেন না। এবার সমগ্র উদ্ধৃতিটি কেমন মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি করে দেখুন:

> প্রিয়তম হে জনক, শ্বেতশুভ্র তোমার দাড়িতে
> সকৌতুকে খেলা করে ফুরফুরে স্বপ্নেরা কেবল,
> অলৌকিক রাজহাঁস উড়ে যায় তোমার নিকটে:
> আদরে বুলাও হাত সর্বক্ষণ নরম পালকে।
>
> বিদেশী ডিশের মতো উপাদেয় স্বপ্নের সম্ভার
> টেবিলের 'পরে রাখো ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
> প্রতিদিন যথারীতি ব্রেকফাষ্টকালীন আলাপে।

হে নিষ্ঠুর জন্মদাতা, ভাগ্যাহত তোমার সন্তান
শিশুর স্বভাবে কেন কোনোদিন খেলতে পারেনি
একটি সুন্দর স্বপ্নে, রবারের বলের মতন।
অথচ হে জাদুকর, কী সহজে অবহেলাভরে
মনোরম স্বপ্নরাজি পুতুলের মতন নাচাও।

[ জন্মদাতার প্রতি : ঐ ]

এরই অনুষঙ্গে আরও কয়েকটি উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি :

হিরন্ময় নক্ষত্রের মেলা এক বসিয়েছি অবাস্তব স্বপ্নের বিন্যাসে :

[ স্মৃতি, চাঁদের মতো ঘড়ি : ঐ ]

স্বপ্নের মহান স্রোতে ভাসমান সমস্ত জীবন
ডাঙা ছেড়ে ডিঙা বেয়ে চৈতন্যের অতল অবধি
কি আমার অলৌকিক আনাগোনা, অবাস্তব লালন ফকির।

[ সমুদ্রায়ন : ঐ ]

সর্বশেষে, এই পর্যায়ে, কুয়াশার চাষে অভিলাষী একজন কবিকে দেখুন। এই চাষী পরবর্তী কাব্যে আর কুয়াশার চাষ করবেন না, কিন্তু যাত্রা শুরু হয়েছে এইভাবে, বাক্‌প্রতিমাও তাই স্বপ্নবেদ্য :

লাঙলে এনেছি তুলে অতলের উর্বর-মৃত্তিকা
বীজ দেবো সর্বোত্তম কুয়াশার তা-তে; ঘন-নীল
আস্তরণে ধোঁয়াটে, সবুজ, শাদা কুয়াশায় ভ'রে
উঠবে আমার এই গরীয়ান কুয়াশা-বাগান।
একাগ্র চাষীর মতো সারাক্ষণ একটি চিন্তায়—
ক্ষুদ্র এই বাগানকে কেন্দ্র ক'রে কাটাবো সময়।

[ কুয়াশার চাষ : ঐ ]

লক্ষণীয় এই চাষীর জমি ক্ষুদ্র, রচিত বাগান সীমিত—পরবর্তী কাব্যের নামও 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে'—যেখানে অবাস্তব কুয়াশার চাষী শিল্পের ভুবন সৃষ্টি করেছেন।

'বাতাসের উল্টোদিকে যাত্রা' কবিতায় কবি নিজে যাত্রা করেছেন.... যেন বোদলেয়রের শহরে-নগরে। কবির সংবেদনা ধ্বনিত হয়েছে দৃশ্যমান শব্দমান বাক্‌প্রতিমার খাঁচায় :

জলের রেখার মতো লেন-বাইলেন ধ'রে
সারি-সারি মুণ্ডিত বৃক্ষের নীচে
শুঁড়ির চাতাল ঘেঁষে
রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাতাসের উল্টোদিকে
বিরতিবিহীন হাঁটছি।

জলের রেখা, বাতাস ও বিরতিবিহীন হাঁটা এইসব প্রতিমা সরাসরি ধ্বনি বিস্তার করছে না; কিন্তু জল-বাতাস-গমন ইত্যাদির শব্দমান প্রতিমারা আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে, বিশেষত 'বিরতিবিহীন হাঁটছি' বলার সঙ্গে পদশব্দে উচ্চকিত পৃথিবী এবং গমনের চিত্র যুগপৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধকে জাগরিত করে। অবশেষে, এই কবিতায় বিষন্ন ক্লান্ত দূষিত শহরের মৃদু আলোয় আচ্ছন্ন পথ আমাদের অনুভূতিসম্পন্ন করে, অভিভূত করে, সর্বোপরি অনুভূতিহীন মানুষের বোধে ঘা দিয়ে বস্তুত আরও এক বোধের রাজ্যে নিয়ে চলে—তারই রূপায়ণ নিম্নের পঙক্তি নিচয় :

আমি তাই
বাতাসের উল্টোদিকে
দূষিত আলোক থেকে
প্রতিশ্রুত অন্ধকারের সিঁড়িহীন পিচ্ছিল পথে
—মদের পিপের মতো গড়িয়ে চলছি—
অন্যকোনো গ্রহের উদ্দেশে
সেই গ্রহে
কোনো ফানুসিক ক্ষুধা ও পিপাসা থাকবে না—
মানুষ যেখানে
ব্যতীত কোমল স্বপ্ন
অন্য খাদ্য গ্রহণও করবে না।

'জ্যোৎস্না আর নেই' কবিতা কিংবা 'সবুজ বয়স যিনি' কবিতাদ্বয়ের প্রতিমা নিটোল কারুময় দু'টি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। জ্যোৎস্না এবং সময় দুইই অধরা, অনুভবযোগ্য মাত্র; জ্যোৎস্না দৃশ্যমান আবার সময় শুধু

অনুভূতিকেই প্রহত করে—সেই অধরা অপ্রাপণীয় রূপের দিকেই শিল্পীর নিরন্তর যাত্রা, এখানে (পুনরায়) 'জ্যোৎস্না' ও 'সময়' যেন তাদের নিজস্ব শব্দরূপ অতিক্রম করে মানব-মানবীতে রূপান্তরিত :

'জ্যোস্না, জ্যোৎস্না'—ব'লে হেঁকে চতুর্দিকে শাড়ির আঁধার।
—এই ভীড়ে কী ক'রে যে খুঁজে পাবো তাকে,
নিজস্ব জ্যোৎস্নাকে?

[ জ্যোৎস্না আর নেই : ঐ ]

হে সময়, বানিয়ে দিয়েছো তার
কারুকার্যময় ডানা শিল্পীর মতন পরিশ্রমে—
উড়ে এসে সেই পাখি হৃদয়ের সৌন্দর্যে বসেন।

[ সবুজ বয়স যিনি : ঐ ]

এই কাব্যে সাহিত্যজাতিগত-স্বতন্ত্র বাক্‌প্রতিমা আছে। কয়েকটি যেমন, 'আল্পসের মতো সাদা/ডিমের প্রত্যাশে'; 'অনুসরণ করছে আমায় এক কৃষ্ণাঙ্গ কুকুর' (গ্যেটেকে স্মরণ করায়); উড়ে যায় তুখোড় সিমুমে'; 'আইবো-র শিংয়ের মতো বাঁকানো শৈশব ঘুবে আসি' (চিত্র-প্রতিমা হিসেবে ও ভাবনানুষঙ্গে একটি বিরল-সুন্দর প্রতিমা, শৈশবেব বা সুন্দর বয়সের স্বপ্নেব আবীরে ভাসা একটি শ্রেষ্ঠ বাক্‌প্রতিমা); 'দেখে যাবো জিরাফের গ্রীবা' ('জিরাফের গ্রীবা' এখানে কবির বিজয় কেতন বা প্রতিভার স্বীকৃতি —একটি শ্রেষ্ঠ বাক্‌প্রতিমা) ইত্যাদি।

প্রতিমা-ঐশ্বর্যে অনন্য 'শরীরী পুতুল' এবং 'চোব' কবিতা থেকে উদ্ধার করছি দুটি লোভন প্রতিমা। প্রথম উদ্ধৃতিতে 'মহীনের ঘোড়াগুলোর মতো' বলে জীবনানন্দকে চমৎকারভাবে ব্যবহার কবেছেন :

তবু, হে নৈঃশব্দ্য, হে বিপুল নিয়তি, হে সর্বপরিবেশগ্রাসী জ্যোৎস্নান্বিত রাত—আমি যাবো, আমি যাবো আমি যাবো—আমি তোমার স্বচ্ছন্দ প্রান্তরে মহীনের ঘোড়াগুলোর মতো বিচরণ করবো—তুমি দ্বার উন্মুক্ত রাখো ॥

[ শরীরী পুতুল : ঐ ]

চিত্রকর, দার্শনিক, ধ্যানী—তোমার অনুজ যারা,
তাদেরও নিকটে প্রিয় চাঁদহীন এই মধ্যরাত,
তারাও তোমার মতো কম্প্রবক্ষে খুব চুপিসারে
নিঃশব্দে একাকী ঢুকে পড়ে অজানা অচেনা কোনো
অর্গলিত ভাবনার দ্বারে।

[ চোর : ঐ ]

এমন অনেক প্রতিমা ছড়িয়ে আছে 'অসম্ভবের পায়ে' কাব্য গ্রন্থে; গ্রন্থের নামের মধ্যেও আছে অতীন্দ্রিয়লোকবিধৃত বাক্‌প্রতিমা। কবির মৃত্যু ভাবনা, ইন্দ্রিয় বাসনা, মরমী ভাবনা, লিরিক চেতনা, অস্তিত্ব অনুভূতি, রসানুভূতি, ঐতিহ্যচেতনা—কাব্যের প্রতিমা নির্মাণে সকলেই এসেছে, মাত্র কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রতিমার উল্লেখ করেছি। জটিল ও গভীর বাক্‌প্রতিমার সন্ধানও মিলবে এবং সেই সব প্রতিমার মধ্যে সৃষ্টি ক্রিয়া কি-ভাবে কাজ করেছে, উৎসাহী পাঠক খুঁজে পাবেন—'অসম্ভবের পায়ে' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ বা যাত্রা, অথবা মায়াবী রূপমাধুরীকে আজীবন খুঁজবেন বলে তিনি যাত্রা করেছেন—'হে দরোজা', 'নগর ধ্বংসের আগে', 'চোর' প্রভৃতি অধিকাংশ কবিতায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি, বিপুল-তীক্ষ্ণ মর্মবেদনা পাঠককে স্পর্শ করে এবং শিহরিত করে।

"বাক্‌প্রতিমা অধ্যয়নে কবিচিত্তের সন্নিহিত হওয়া সম্ভব কিন্তু সে-অধ্যয়নের প্রণালী সব সময় একরকম নয়, প্রয়োজন বিশেষে প্রণালীও বদলায়" (ডঃ অমলেন্দু বসু)। রফিক আজাদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করছি—তাঁর দ্বিতীয় কাব্যে উচচকিত ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত 'আমি', যে আমি বিদ্যুৎ-চকিত বজ্র-নিনাদিত উল্লাসে ফেটে পড়েছে—এই প্রণালীতে আলোচনা করা যায়।

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'আমি' চির-বিস্ময়। যেমন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে-পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'—
সুন্দর হল সে।

[ আমি : শ্যামলী ]

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন। তাঁর দীর্ঘকালের কাব্য সাধনায় তিনি 'বিশ্ব-আমি' বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন—'বিশ্ব-আমি'র রচনার আসরে/হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ'-এর রবীন্দ্রনাথে এই উচচকিত ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত 'আমি' বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও তা ফেটে পড়েছে বজ্র-নিনাদিত উল্লাসে—কবিতার ঐতিহ্য নির্মাণ ও ভাঙা-গড়ার কাজে এই দুই কবির 'আমি' প্রতিমা পরবর্তীদের আমিত্বকে প্রভাবিত করেছে উচচকিত উল্লাসে।

রফিক আজাদের প্রথম কাব্য গ্রন্থে বিদ্রোহী 'আমি' আশা-বেদনা বিষাদে আতুর :

> প্রোথিত বৃক্ষের মতো বদ্ধমূল আমার প্রতিভা
> সাধ ছিলো বেঁচে থেকে দেখে যাবো জিরাফের গ্রীবা ।।

[ নগর ধ্বংসের আগে : অসম্ভবের পায়ে ]

বৃক্ষ যেমন তার নিবিড় শিকড় মাটির গোপন অলিন্দের গভীরে চালিত করে এবং ডালপালা উচচালিত করে নীলিম-আকাশে—আমি প্রতিমা তেমনই সর্বলোকে ব্যাপ্ত : আমার প্রতিভার স্বীকৃতি আমি দেখে যাবো, আমার প্রাপ্য সম্মান আমার ন্যায্য দাবী আমি বেঁচে থেকে আদায় করে নেবো, আমার প্রতিভার সানুমান জিরাফ গ্রীবা দেখে যাবো ; কিন্তু উপরোক্ত 'সাধ ছিলো বেঁচে থেকে দেখে যাবো' বলার সঙ্গে-সঙ্গে বিষাদ এসে গ্রাস করে গর্বিত আমিত্বকে।

বিষাদগ্রস্ত, মৃত্যু চেতনায় অধীর, অসুস্থ আমি :

> 'এমন আলোর থেকে আলোহীনতাই ভালো'—ব'লে
> আমার ভিতরে কন্ঠরুদ্ধতায়
> চীৎকার করেন এক অস্থির যুবক।

[ রোগশয্যায় : ঐ ]

> রোগ-শয্যায়ও স্মরণ করি সে-মহাপ্রতাপশালী
> জীবনের সম্রাটের কথা, এবং অস্ফুটে বলি :
> 'মৃত্যু, আমার হে ক্ষমা করো, ক্ষমা, ক্ষমা করো প্রভু।'

[ জন্মদিনের জর্নাল : ঐ ]

মৃত্যুর জাহাজ তৈরি ক'রে নেবো, হে প্রিয় বান্ধবী,

*  *  *

অনুগামী এই আমি সমুদ্রেই জাহাজ ভাসাবো ।।

[ অনুগমন : ঐ ]

এবং এখন দ্যাখো : 'নীলিমা-নিমগ্ন আমি,
চতুর্দিকে নীলিমা, নীলিমা' ।।

[ মনোভূমি বনভূমি : ঐ ]

মৃত্যুর মতন বাজে রক্তে-মাংসে করুণ সানাই,
অন্তহীন বেদনায় ; শিরা-উপশিরা ব্যেপে ওঠে
অস্থির রক্তের কণা,—অস্থিরতা, শুধু অস্থিরতা

[ নির্জিন্‌স্কি : ঐ ]

পদাঘাতে মোহ্যমান নই,—
—পদাশ্রিত ; হে মাধবী, তোমাতেই পুতে রাখি আয়ু ।।

[ তোমাতেই পুঁতে রাখি আয়ু : ঐ ]

দুঃস্বপ্নে উত্ত্যক্ত আমি....এই দ্যাখো, তোমার সন্তান
মুখ গুঁজে পড়ে আছে, বালুকায়, দুরূহ সময়ে ।।

[ জন্মদাতার প্রতি : ঐ ]

'অসম্ভবের পায়ে' গ্রন্থের দ্বিধাদগ্ধ-ভীত-অবসিত উদ্ধৃত পঙক্তি নিচয়ে 'আমি' প্রতিমার একটি স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই 'আমি' মৃত্যুভাবনা কাতর, মৃত্যুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, আবার প্রিয়তমার অনুগামী হয়ে মৃত্যুর সমুদ্রে জাহাজ ভাসাতে প্রত্যাশী, নীলিমার নীলে নিমগ্ন হতে ইচ্ছুক, আবার জরা-ব্যাধি-আয়ু মানসী মাধবীর গভীরে পুঁতে রাখতে অভিলাষী।

কিন্তু 'অসম্ভবের পায়ে' গ্রন্থ থেকে 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে'র 'আমি' সম্পূর্ণ ভিন্ন—দুরন্ত দুঃসাহসী দুর্দম দুর্দান্ত। ধীরে-ধীরে বিশ্ব-বিষাদ আর হতাশার ঘূর্ণিঝড় থেকে উদ্ধার পেয়ে এই ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত 'আমি' বিদ্রোহী সত্তায় রূপান্তরিত হয়, বুঝতে দেরি হয় না বিষাদের সর্বগ্রাসী সত্তা থেকে উদ্ধারের পথ দুটি মাত্র : একটি মৃত্যু, অন্যটি সবকিছু ভেঙে-চূরে

আমি, এই আমির ক্ষমতা আসুরিক—এই আমি আত্মশক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান, (কিন্তু এখনও দ্বিধা আছে তাই কবি বলেন ছিপিবদ্ধ করে রাখতে, অথবা মানুষের জন্য কল্যাণকামী চিন্তা এখনও অবশিষ্ট আছে বলে—এই 'আমি' সাবধানের বাণী উচচারণ করে)। তৃতীয় উদাহরণে 'আমি'র শারীরিক আকৃতির পরিচয় এবং বংশানুক্রমিক বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় আছে—(মঙ্গোলদের জেদি স্বভাব, বাঙালীর রক্তে মঙ্গোলদের রক্তও আছে)। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে নৈরাশ্যবাদীর আমিত্ব পৃথিবীর মানুষকে বিষাদে-বিলাপে মগ্ন হতে (তার জীবন দর্শনে আস্থাশীল হতে) বলছে, অথবা এই নৈরাশ্যবাদী 'আমি' গ্রেনেডের মতো ধ্বংস-শক্তির পরিচয় দেবে। পঞ্চম উদ্ধৃতিতে সাহসী 'আমি'-প্রতিমা সকল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে, এবং তাই শিল্পের আসন বেদখলকারীরা সন্ত্রস্ত-ভীত। এই শক্তিমান 'আমি' বস্তুত শিল্পের রাজ্যে স্বাক্ষর রাখবে বলেই এতো সাহসী, এই দুঃসাহস বস্তুত মানুষের জন্য, শিল্পের জন্য এবং শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে বলে, তাই সৌন্দর্য-সৈনিক 'আমি' ঘোষণা করে :

'তোমাদের মনে রাখা প্রয়োজন
এই যুদ্ধ ন্যায়-যুদ্ধ ;—বিশ্বাসঘাতক নয়, আজ
সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রেমিক চাই ;—তোমাদের কাজ
নয় মোটে সাহজিক। আনন্দের রক্ষণাবেক্ষণ
অত্যন্ত দুরূহ কর্ম—অনেকের ঘটে অন্তর্জলি।
সত্যের বিরুদ্ধে নয়, আজীবন সপক্ষে লড়াই।'

[ সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ-প্যারেড : ঐ ]

শিল্পকে সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হবে, এই দায়িত্ব শিল্পীর, যেহেতু সৌন্দর্যের দরজায় শিল্পী অতন্দ্র প্রহরী—জীবনানন্দ দাশ বলেছেন : 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা ;/যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' রফিক আজাদের 'আমি' (যুদ্ধের স্মৃতি-অনুষঙ্গে প্রতিমা নির্মাণ করে) জলপাই-রঙ য়ুানিফর্মে, সবুজাভ হেলমেটে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিক ; বস্তুত সৌন্দর্যের দরজায় প্রহরারত এই সৈনিক।

সৌন্দর্যের রাজধানী ঘিরে অসংখ্য বিরোধী বীর
অবস্থান নেয়, সুবিধাজনকভাবে—একচেটে।

আছে যার শিল্পরুচি—তাকে প্রয়োজন—ব্যক্তিগত
কিম্বা সার্বজন্য হরিষে-বিষাদে—যে-জন সুস্থির ।।

[ সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ-প্যারেড : ঐ ]

এই উদ্ধৃত 'আমি', সৌন্দর্যের দরজায় উন্নিদ্র প্রহরী 'আমি' পরবর্তী আরেক সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে—এই সম্ভাবনার বাক্‌প্রতিমা প্রথম গ্রন্থে দৃষ্ট হয়েছে—'অসম্ভবের পায়ে' গ্রন্থের কুয়াশা ও অসম্ভব বাগান রচনা-কারী চাষী 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে' গ্রন্থে একজন বাস্তবের খাদ্য-উৎপাদনকারী চাষী ; অবশ্য এই সবুজ জমি বাস্তবের বর্ণনায় অন্তরঙ্গ সীমিত জমি হয়ে উঠেছে :

বহিরঙ্গে নাগরিক—অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক ;
স্থান-কাল পরিপার্শ্বে নিজ হাতে চাষবাদ করি
সামান্য আপন জমি, বর্গা-জমি চষি না কখনো ।

[ অন্তরঙ্গে সবুজ সংসার : ঐ ]

'অন্তরঙ্গে সবুজ সংসার'-এর 'আমি' কারও কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে না, আপন ভুবন থেকে উৎসারিত হয় প্রেরণা ও দীপ্তি। বাক্‌বৈভবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই শ্লোক, এবং শব্দে-বর্ণে উপমা-অলঙ্কারে—সাহিত্য-জাতিগত প্রতিমার আলোকে সমগ্র কবিতাটি পাঠককে মুগ্ধ করবে। আর, এমন সবুজ জমি ও কর্মিষ্ঠ কৃষকের (আমি) বাক্‌প্রতিমা সমৃদ্ধ কয়েকটি উদ্ধৃতি আহরণ করে বক্তব্য শেষ করছি। মানুষের জন্য চাই সবুজ জমি ও শস্য, শস্যের দানায় ভরবে পেটের প্রান্তর :

আমার সামান্য দাবী : পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর—
ভাত চাই—এই চাওয়া সরাসরি—

এই ক্ষুধাতুর 'আমি'র সামান্য চাওয়া কিছু মোটা চালের ভাত, যদি এই সামান্য চাওয়া ও দাবী অগ্রাহ্য হয় তবে বিদ্রোহী আমি হয়ে উঠবে সর্ব-গ্রাসী এবং সর্বভুক। এই ক্ষুধাতুর আমি-র রূপান্তর হয় শিল্পের মৌল চারাগাছ রোপণে, একদিন সেই চারাগাছ মহীরুহে পরিণত হবে (প্রথম

কাব্যগ্রন্থের 'সাধ ছিলো দেখে যাবো জিরাফের গ্রীবা'-র পরিণতি ও আত্মবিশ্বাস)। এমন কয়েকটি উজ্জ্বল ও স্মরণযোগ্য বাক্‌প্রতিমা :

কৃষকের মতো শ্রমে মনো-মৃত্তিকায় পুঁতি মৌল চারাগাছ :
মুহূর্তেই সেই কচি চারা দেখি সারা বিশ্ব ব্যেপে বেড়ে ওঠে ;
শাখায়-শাখায় নয়, পাতায়-পাতায় তার বিচরণ করি,
মনে মনে। বাধা দিতে পারে কেউ মানসিক অবাধ ভ্রমণে ?

[ চন্দ্রাহত কেরানীর রবিবার : ঐ ]

মন থেকে মনে, মনে-মনে, কৃষকের ঘরে-ঘরে,
দুঃখ-বেঁধা হৃদয়ে-হৃদয়ে ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি
মধুর শীতল স্পর্শে সান্ত্বনার ঠাণ্ডা হাত রাখে।

[ গান হ'তে বলি : ঐ ]

মানুষের ঘর-বাড়ি, শান্ত লোকালয়, সবুজ শস্যের মাঠ,
তরুণ চাষার হাতে-ধরা প্রবীণ লাঙল, গাছ্-গাছালির
ধারাবাহিকতা, নিকোনো উঠোন—শোলার বেড়ার ফাঁকে দেখি
ঘোমটা দেয়া চাষা-বউ, ছিমছাম গেরস্থালি, জ্বলন্ত উনুন,
প্রতিটি বাড়ির থেকে ভেসে-আসা ঢেঁকি-ছাঁটা চালের আঘ্রাণ ;

.... .... .... .... ....

................বারবার সবুজ সাম্রাজ্যে আমি
বিভিন্ন বয়সে গেছি—

[ চন্দ্রাহত কেরানীর রবিবার : ঐ ]

'আমি' নামক এই দুরন্ত গলে যাচ্ছে, বস্তুত এই চাষ অন্তরঙ্গ মনোভূমে, কৃষিক্ষেত্রের সবুজ রঙ্ বহিরঙ্গের ছলে অন্তরঙ্গ মনের কথাই প্রকাশ করছে, কিন্তু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ মনোভূমি এখন একাকার—কবিতা ও কাব্যলক্ষ্মীকে ঘরে তুলে নেওয়ার আয়োজন এইভাবেই চলবে, বিদ্রোহী 'আমি' তাই মননশীল বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে ক্রম-অগ্রসরমান—বহিরঙ্গের দৃশ্যমান-শ্রব্যমান -গন্ধযুক্ত প্রতিমা অবশেষে মননশীল বাক্‌প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়—'আমি'র পূর্ণতা আসে :

—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, নারী
গলায় পরায় মালা—অর্জুনের,—জয়ী তরবারি
ইচ্ছেমতো উপভোগ করে তাকে।

মন্দভাগ্য ব'লে
অনুন্নত দেশের সন্তান তীব্র মনস্তাপে জ্ব'লে
অবৈধ বাণিজ্যে নয়, তাকে আজ—সম্মুখ সমরে
শত্রুকে পরাস্ত ক'রে—তুলে নেবো শাশ্বতের ঘরে।

[ শাশ্বতের ঘরে : ঐ ]

অবশেষে, রফিক আজাদের বাক্‌প্রতিমা আলোচনায় যে অনুদ্‌ঘাটিত দিকটি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি, যে মননধর্মী ভাবনাসূচক 'আমি' বাক্‌-প্রতিমাশ্বৈর্যের উল্লেখ করতে সচেষ্ট হয়েছি তাতে তাঁর বিশেষ এক মনোভঙ্গির সোজ্জ্বল পরিচয় মিলবে। তাঁকে সকলের থেকে আলাদা করে চেনা যাবে, এবং তাঁর শিল্পীসত্তার গূঢ় আন্তর্লোক দীপ্যমান হয়ে উঠবে—এই পাওয়া আমাদের নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে ভাবিত করে তোলে, সাহসী করে দেয়—সৌন্দর্যের দরজা আগলে-থাকা এক দৃপ্ত সৈনিকের পরিচয় পেয়ে আশান্বিত হই।

## অষ্টম অধ্যায়

তাঁর কবিতা সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বোধ্য, সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র তিনি এমন কবিতা রচনা করেন যা অন্বেষণযোগ্য পাঠের নয়, তিনি বলে দেন কবিতার সার্থকতা চিত্র নির্মাণে ; ইমেজ সৃষ্টিতে। বিভিন্ন বিরোধী ভাব একত্রিত করে আবদুল মান্নান সৈয়দ একটি মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন যার নাসিকা-কর্ণ দৃশ্যমান হলে চক্ষু লুকোচুরি খেলে, ত্বক যদি দৃশ্যমান হয় জিহ্বা থাকে সাপের মতো দ্রুত সঞ্চরমান। তাঁর কবিতা, বিশেষ করে, 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' ও 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা' গ্রন্থদ্বয়ের কবিতা, পরাবস্তুর পানে এতই দ্রুত ধাবমান এতই সঞ্চরমান গতিশীল যে পাঠকবর্গ শুধু ভাবনাপুঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টই হয়—কবিতার ছত্রে-ছত্রে যে বাক্-প্রতিমা নির্মিত হয় তা এতই ভিন্নধর্মী চিত্র সহযোগে, এতই বিরোধী স্বার্থ সাধে, এমন গতিশীল ও কম্পমান, এবং চৈতন্যের মগ্ন আলো-অন্ধকারে এতই লুকোচুরি খেলে যে কখনও-কখনও পাঠক কবিতার রেশ রক্ষা করে রাখতে পারে না, কখনও বা পাঠক শুধুমাত্র কিছু অনুভূতি লাভ করেই তুষ্ট হয়। যেমন 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ'-এ শয়তান ও জ্যোৎস্নার মতো অনেক বাক্চিত্র অতি সহজে একটি প্রতিমা শৃঙ্খলে সৃষ্টি হয় না, হার্দ্য হয়ে ওঠে না—বুঝতে দেরী হয় না চিরাচরিত পথে চলবে না একেকটি চিত্র, চিত্রগুলি কখনও-কখনও বেপথু মেঘের মতো ; কিন্তু সেই দলছুট মেঘ হয় অবশেষে যূথচারী। একটি সহজ সরল বাক্প্রতিমার উল্লেখ করছি প্রথমে ; বস্তু ও দৃশ্য থেকে ধীরে-ধীরে কেমন দৃশ্যান্তরে আমাদের নিয়ে চলেন কবি, কেমন সহজে বলে ফেলেন :

> জনৈক বৃদ্ধ বৃক্ষ সাদা এবড়োখেবড়ো ডালপালার দাঁত বের ক'রে খুব পরিষ্কার হাসচেন, দ্যাখো। আমি ছুট দেবো ঐ গাছের কোটর লক্ষ্য ক'রে করতলে মন্ত্র-পড়া আমলকি নিয়ে কাঠ বিড়ালির মতো ; আমি দৌড় দেবো তামসী আত্মার গর্ভ লক্ষ্য ক'রে, সেঁধিয়ে যাবো, মিশে যাবো অবেদ্য অন্ধকারে. ছিটকে যাবো এই সরলরেখা থেকে মাতাল ট্রেনের মতো ;—এই

আকাঙক্ষার সমাধি লক্ষ্য ক'রে ফ্যালো, ছুঁড়ে ফেলো
একেকটি দর্পণ, যা অনায়াসে বেঁকেচুরে দিতে পারে আমার
কাউন্টেনান্স, জন্ম দ্যায় হাজার-হাজার আমাকে; দাও, আমার
দু'হাত ভ'রে পাঠিয়ে দাও রোদন, কেননা ইতিমধ্যে অতীত—
অতীতই ভবিষ্যৎ—আমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে একের পর এক
লাল-নীল-সবুজ শার্টের ভিতর।

[ গাধা ও আমি : জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ ]

বাক্‌চিত্রগুলি একটির পর একটি এইভাবে আসছে : জনৈক বৃদ্ধ, বৃক্ষ শাদা এবড়োখেবড়ো রুক্ষ ডালপালার মতো উঁচু নিচু দাঁত পংক্তি, এবং পরিচ্ছন্ন হাসি (লক্ষ্যণীয়, বিপর্যস্ত দন্ত পংক্তিতে শুভ্র-সিগ্ধ হাসি ফুটে উঠছে)। কিন্তু পরবর্তী বাকবন্ধে : আমি ছুট দেবো ঐ দাঁতের গাছের কোটর লক্ষ্য করে, করতলে মন্ত্র-পড়া আমলকি নিয়ে (যেমন কাঠবিড়ালি আমলকি বা বাদাম মুখে নিয়ে তরু কোটরে ছোটে : গতিমান চিত্রটি মুগ্ধ করবে পাঠককে), অতঃপর তামসীআত্মার গর্ভ লক্ষ্য করে দৌড় যাত্রা (তামসীআত্মা বাক্‌চিত্রটি লক্ষণীয়) এবং তারই অবেদ্য অন্ধকারে সেঁধিয়ে ও মিশে যাওয়া, তারপর ব্যক্তিগত জীবনের সরল-স্নিগ্ধ পথ থেকে অসচরাচর পথে লাইনচ্যুত মাতাল ট্রেনের মতো ছিটকে পড়া; (অতঃপর আরও মাতাল হওয়া পঙক্তিমালা) আকাঙক্ষার সমাধি লক্ষ্য করে যাত্রায় ছুঁড়ে ফেলতে হবে নির্মম মায়াবী আরশি, কেননা এই দর্পণ কবির মানবীয় আকৃতিকে অজস্র ভাঙচুরে রূপান্তর করে দেয়, মানসিক প্রতিক্রিয়াকে আরও সহস্রগুণ করে তোলে যে আয়না; অতঃপর শোকের উথাল-পাতাল আন্দোলন, অতীত ছুটে আসে সর্বনাশের মতো, এই অতীতই কিন্তু ভবিষ্যতের আহ্বাবহ দূত—অবশেষে আমরা জানতে পারি—চৈতন্যের এই পথযাত্রা, ভাবের এই উচ্চালিত যাত্রা ফিরে আসে বাস্তবে, অর্থাৎ বার্ধক্য অবেদ্য-অন্ধকার বিক্ষেপ লোক অতীত সবকিছুই 'আমি' মানুষটিকে ফিরিয়ে দেয় বাস্তবের লাল-নীল-সবুজ শার্টের নিচের কায়ায়।

লক্ষণীয়, চক্ষুগ্রাহ্য প্রতিমা থেকে অনুভবের রাজ্যে কবি আমাদের দ্রুত সঞ্চারিত করে চলেন, আবার শব্দমান প্রতিমা (যেমন, মাতাল ট্রেনের লাইন থেকে ছিটকে পড়ার শব্দ, এবং রোদন) থেকে দাঁতের ডালপালা বের করে পরিচ্ছন্ন হাসির (শব্দ-নিঃশব্দের হাসির) গতিমান প্রতিমা;

অথবা বস্তু থেকে বস্তুতে উচচালিত হয়ে ভাবের অনায়াস গমনাগমন, এবং পুনরায় নীড়ে ফিরে আসার মধ্যে বাস্তব প্রীতির পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে —মান্নান সৈয়দের এই অবিরাম যাত্রার বিভিন্নধর্মী বাক্‌চিত্র এক পঙক্তিতে এসে অবশেষে একটি সুঠাম বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছে। দীর্ঘ এই পথ যাত্রায় যে-সকল বাক্‌চিত্র সন্নিবেশে একটি পরিপূর্ণ বাক্‌প্রতিমা নির্মিত হল, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গমনাগমনে যে-বাস্তবের প্রতিষ্ঠা আসল, তাকে বলছি বস্তু থেকে পরাবস্তু এবং পরাবস্তু থেকে বাস্তবে ফিরে আসা বাক্‌-প্রতিমা।

ঈশ্বর আর শয়তানের দ্বন্দ্বের অনেক বাক্‌চিত্র আছে 'জন্মান্ধ কবিতা-গুচ্ছ' গ্রন্থে। আধুনিক কবিদের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার নাস্তি-দর্শন বাংলা কবিতার ধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। শয়তান, অসুর, মার ইত্যাদি অশুভ শক্তি ধর্মগ্রন্থ থেকে নেমে সাহিত্যে একটি গভীর খাত নির্মাণ করেছে, আধুনিক সাহিত্যে এই শয়তান আর অমঙ্গলের দেবতা রইল না, বরং শয়তানই হল মঙ্গলময় এবং ত্রাণকর্তা। ঈশ্বরের রাজ্যে যখন এত অনিয়ম-অন্যায়, হৃদয়হীন মমতাহীন করুণায় আলোড়নহীন মানুষই যখন শিল্প-সত্য-ন্যায়নীতির ধারক তখন ঈশ্বর আর ঈশ্বর থাকতে পারে না, তাই বোদলেয়র মহান শয়তানের কাছেই করুণা ভিক্ষা করেন :

> হে তুমি, দেবদূত, জ্ঞানীর শিরোমণি, রূপের নেই যার তুলনা,
> দেবতা, যার ভাগে জোটে না বন্দনা, নিয়তি দেয় শুধু ছলনা,
> মহান শয়তান করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে।
>
> [ শয়তান-স্তোত্র : বুদ্ধদেব বসু অনূদিত ]

পরিশেষে মহান শয়তানের কাছে আত্মার বিশ্রাম কামনায় বর প্রার্থনা করে বোদলেয়র শান্তি খোঁজেন :

> আমার আত্মাকে এ-বর দাও, যেন সেখানে হয় তার বিশ্রাম,
> যেখানে জ্ঞানতরু তোমাকে ছায়া দেয়, এবং উন্নত, গম্ভীর
> তোমার ভালে আমি ছড়াই ডালপালা নতুন যেন এক মন্দির।
>
> [ ঐ ]

আর, মান্নান সৈয়দের বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে শয়তানের মহিমময় রূপ (শয়তান হল প্রতিভার নামান্তর) :

> আমার প্রতিভা সেই শয়তান, যিনি আমায় কাঁধ থেকে আলগা ক'রে ফেললেন হাড়, খুবলে নিলেন চোখ, তারপর নগ্ন ক'রে ছেড়ে দিলেন পুরোনো এই বাড়িতে, যেখানে আমার মধ্য থেকে ডাক দিলো মৃত সব নিরিন্দ্রিয় কবি; অথচ কী সাধারণ আমি, মুখে যা-ই বলি আমি জানি আমি কী; প্রতিভা, বেয়াড়া মেয়েমানুষের মতো, আমাকে টান ক'রে পুরোনো এই বাড়ি অসংখ্যবার ঘুরিয়ে চলেছেন কেবলি, দ্যাখো, আমি তাঁর ক্রীতদাস : জীবন, আমার বোন, কেন আমার চাবি আমার বোনের ভিতর প্রতিশ্রুতি হ'তে পারবে না ?
>
> [ পাগোল এই রাত্রিরা : জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ ]

প্রতিভার উপমেয় শয়তান এবং বেয়াড়া মেয়েমানুষ। এই শয়তানই সাধারণ মানুষকে কবি করে তোলে, সাধারণকে অসাধারণ করে তোলে, আবার শয়তানের ক্রীতদাস হন কবি, কিন্তু জীবন নামক বোনের কাছে পরিপূর্ণ মিশে যাওয়ার প্রশ্নে সামাজিক বাধা প্রবল হয়ে ওঠে, জীবনের সঙ্গে গভীর সহবাসে বাধা আসে দুস্তর। অবশেষে সেই প্রশ্ন, সেই ঈশ্বর ও শয়তান এইভাবে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি হয়ে দুই বিরোধী টানে ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয় :

> আমার এক হাত ধ'রে টান দিয়েছেন শয়তান, আরেক হাত ঈশ্বর—কী উল্লাস আমাকে নিয়ে! আমি, ঐ দু'জনের ভোজ, মাঝখান থেকে আমার দু' হাত দু'দিকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো, থামছে না, স্বগতের মতো উল্টোদিকে হাত দুটো চলে যাচ্ছে সম্পূর্ণ।
>
> [ ঐ ]

কবির মধ্যে আস্তিক্য ও নাস্তিক্য দুয়ের সমান আকর্ষণ, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে জীবন হয় কাড়াকাড়ি। একদিকে কবির হাত ধরে টান দিয়েছেন শয়তান, অন্য হাত ধরে ঈশ্বর। এই টানাপোড়নে কবি দিশেহারা, কোনদিকেই পথ নেই, বস্তুত শয়তান আর ঈশ্বরের ভোজ্যবস্তু হচ্ছেন কবি—নিয়তির হাতে নিপীড়িত মানুষ যেমন অসহায়, গ্রীক সাহিত্যে যেমন দেখেছি মানুষ দেবতার হাতের ক্রীড়নক মাত্র, মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্বে যেমন মানুষ ধ্বস্ত ও চূর্ণ—অবশেষে উল্টোদিকে হাত দুটো চলে যায় স্বগতের মতো। এই

বাক্‌প্রতিমায় মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব, ঈশ্বর-শয়তানের চিরায়ত সংঘর্ষ, এবং মানুষের বোধে সেই প্রশ্ন কী যে তীব্র ক্ষত সৃষ্টি করে তারই প্রকাশ। সেই ঈশ্বর :

> এই রাত্রিরা
> জিরাফের গলা বেয়ে লতিয়ে উঠতে দ্যায় আগুন, যেটা আমাদের আকাঙক্ষা, অবশ্য যদি তার মাংস হ'তে রাজি হই তুমি আর আমি; ঈশ্বর নামক গৃহপালিত মিস্তিরি ভুল সিঁড়ি বানাচ্ছে আমাদের উঠোনে ব'সে—আগুনের, যে-অসম্ভবের সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে আমরা সবাই পাতালে নেবে যাবো হঠাৎ।
>
> [ পাগোল এই রাত্রিরা : জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ ]

এখানে, 'এই রাত্রিরা জিরাফের গলা বেয়ে লতিয়ে উঠতে দ্যায় আগুন' বাক্‌চিত্রটি দৃশ্য প্রতিমা (চক্ষুগ্রাহ্য), জিরাফ সাহিত্য-জাতিগত বাক্‌প্রতিমা ; আগুন লকলক করে লতিয়ে ওঠে, কিন্তু যখনই বলা হলো যে আগুন জিরাফের গলা বেয়ে লতিয়ে ওঠে তখন চিত্রটি উপমায় মঞ্জুল হয়ে ওঠে, তা ছাড়া লতার মতো বেয়ে ওঠা আগুন বলার সঙ্গে-সঙ্গে দৃশ্যটি আবার উপমিত হলো। অতঃপর এখানে ঈশ্বর আর চিরাচরিত সর্বশক্তিমান নয়। এই ঈশ্বরও ভুল করে, ভুল সিঁড়ি বানায় এবং সেই ভুল সিঁড়ি বেয়ে মানুষ অনবরত উর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করে মূলত পাতালে অবসিত হচ্ছে। এখানে আরও লক্ষণীয় যে ভুলের সিঁড়ি ঈশ্বর বানাচ্ছে তা আগুন দিয়ে তৈরী এবং অসম্ভব ও অস্পৃশ্য সেই সিঁড়ি—কাজেই ঈশ্বর প্রদর্শিত পথে পা দিলে দগ্ধ হওয়া এবং পাতালে পতন অনিবার্য। এবং তাই শয়তান স্তোত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। বাক্‌চিত্রটি বাস্তব ঘুরে অবশেষে অন্তশীল আবেগে আমাদের আরেক জগতে নিয়ে চলে, কিংবা পাতাল নামক অবাস্তব জগতে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়। মান্নান সৈয়দের কাব্যকলা নির্মাণে স্বর্গ-মর্ত-পাতালে গমনাগমন আমাদের অনুভূতির আরেক জগতে নিয়ে যায়, বাক্‌চিত্র চক্ষুগ্রাহ্য করে চিত্রিত হলেও এর উপপাদ্য বিষয় হয় অনুভূতির রাজ্য—কবি কি বলছেন নয় বরং কি-ভাবে এবং কোন অনুভতির উদ্বোধন করে কথাগুলি বলছেন তা-ই লক্ষ্য করতে হবে এই বাক্‌প্রতিমাবলীতে।

আবার যে ফেরেশতা কল্যাণের, আলো জেলে যে পৃথিবীতে নামে, নিবিড় অন্ধকার বনভূমি উজ্জ্বল করে যে ফেরেশতা স্বর্গীয় আলো বয়ে

এনে কাঠুরিয়াকে আলোর সন্ধান দেয়—সেই ফেরেশতাকে অতি সহজে মেনে নিতে চায়না কাঠুরিয়ার দল। আগে একবার ধ্বংস করতে হবে বিশ্বাসের তরু, অতঃপর চূড়ান্ত বিশ্বাসের কথা ভাবা যাবে। আবেগ-কম্পিত চিন্তা ও চিন্তায়িত আবেগ অভিন্নহৃদয় হয়ে এই ছত্রগুলি ইন্দ্রিয়বেদী প্রতিমায় রূপায়িত—এই বাক্‌প্রতিমার বিষয় (নিম্নে উদ্ধৃত) কবির আত্ম-চেতনা, কবি জেনে বুঝে কৃতসঙ্কল্প হয়ে আবেগ ও উপলব্ধিকে শব্দের বর্ণবৈভবে ধরে রাখবেন, কবির আত্মসচেতনা প্রবল। কিন্তু সৃষ্টি কর্মের কোন-না-কোন মুহূর্তে শিল্পী মগ্ন হয়ে যেতে পারেন চেতনার গভীরতম-লোকে—তখন ভাবনার বেগে উৎসারিত হয় কবির নিভৃত-অন্তরঙ্গ জীবনের ছবি, অবজেকটিভ বিষয়ও হয়ে ওঠে লিরিক—তরঙ্গায়িত হয় গূঢ় সত্তার গোপন কথা, সৃজনশক্তির অবিশ্লেষ্য শক্তিতে দৃশ্যমান রূপমান হয়ে ওঠে অতীতের হারিয়ে যাওয়া আবেগ-চিন্তা—এইজন্য কখনও-কখনও অবোধ্য হয়ে ওঠে শিল্পকর্ম, এইজন্য কবি ধাবিত হন পরাবস্তুর পানে, কখনও তিনি তাই অবিশ্বাসী আবার কখনও তাই বিশ্বাসের অশ্বে চড়ে দ্রুত ধাবমান। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে আত্মাশ্রয়ী কাব্যে কবির গূঢ়তম সত্তা কিভাবে মুকুরিত ও মুকুলিত দেখা যাবে :

ধিতাং কুঠার বাজে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু,  
আজ সে সর্বতোশূন্য যাকে পুরো চেয়েছি ভিতরে,  
ধিতাং কুঠার নাচে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু,  
রক্ত বুকে তীব্র নাদ শ্রাবণের মেঘের মাদলে,  
ধিতাং কুঠার জ্বলে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু,  
ধিতাং কুঠার বাজে, শক্ত কাঠে হৃদয় উপড়ে  
ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু, ভাঙো বিশ্বাসের তরু,  
শূন্য বুকে তাথৈ সুরমার জল ফুলে ওঠে জোরে,  
ভাঙো, ভেঙে ফ্যালো, মানবিক আদিম শিকড় থেকে  
বর্তমান ডালপালা ছিন্নভিন্ন করো ভেঙে চুরে  
ধিতাং কুঠার চৈতন্যের, বাজো, ধ্বংস করো তরু,  
উড়োই পিতার ভুল, ধর্মনির্দেশের পাতা ছিঁড়ে  
ফ্যালো তাথৈ সুরমার, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু—  
যতোক্ষণ না-জাগেন ধ্বংসালী ফেরেশতা আবার।

[ বিশ্বাসের তরু : জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা ]

শব্দের ঝনাৎকার ঐকতান তুলেছে নিবিড় বাগৈশ্বর্যে। মনে করিয়ে দেয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেষ্ট্রার উদাত্ত মহীয়ান অর্গানের তান-তালের সুর-সমন্বয়। শব্দ ঝঙ্কারের শিল্প নিপুণতার নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায় এই দীর্ঘতর বিস্তৃততর প্রতিমায়। "ইংরাজি কাব্যশাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে বলি **Sublime**, সেই মহৎ উত্তুঙ্গ কাব্যোক্তির বিচ্ছুরণের জন্য বাক্‌সংযোজনার বিস্তৃতি আবশ্যক"। বিস্তৃত আয়তনে এই প্রবল ধ্বনিময় প্রতিমা গড়িয়ে চলে গেছে বহুদূর বিস্তারিত অরণ্যের নিবিড়তা ভেদ করে, একটু বিলম্বিত লয়ে না-চলে উদাত্ত ধ্বনিময়তার গড়ানো প্রতিমা অবশেষে মূল লক্ষ্যের দিকে চলে গেছে এবং কবি ঘোষণা করলেন : ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু—/যতোক্ষণ না-জাগেন ধ্বংসালী ফেরশতা আবার। কিন্তু কেন এই ধ্বংসালী ফেরেশতাকে আহ্বান? ফেরেশতা ধ্বংসালী হল কেন? ফেরেশতা কি অমঙ্গলের ধ্বংস করছেন, না-কি মঙ্গলের?

> অর্থাৎ, শূন্যতা শুধু;—সাধ শূন্য?—তা-ই বটে : নাস্তির নিখিল নটরাজ
> নৃত্য করে চরাচরে ; জন্মান্ধ রেলোয়ে ব্যেপে নিরন্তর 'বিদায়, বিদায়।"
> যায় কেঁদে ; সবার উড্ডীন হাত কেঁপে-কেঁপে লিখে যায় বাতাসে কেবলি :
> "মেদিনী একটি বাঁধাকপি : পাতাগুলি খুলে নিলে পাওয়া যাবে না তাকে।
> [ রক্তের পলাশবনে কালো ফেরেশতা : ঐ ]

> হ্যাঁ, একটি বাঁধাকপি, খুলছে তার পাতাগুলি ঝ'রে পড়ছে যুগের পর যুগ, শূন্যে খসে বাতিল পালক,নীল শূন্যে রাঙা রামধনু হানলো কে, হানলো কে চাকরি আর মাছরাঙা আর তরমুজ আর চৈত্রসন্ধ্যা আর এই পালা—পত্রমোচনের
>
> কে খুলে নিচ্ছে, চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে, খুলছে ভাঁজের পর ভাঁজ পোশাক একটা বাধা : তাই চাই নগ্নতা ; কিন্তু শূন্যতা মেলে : শূন্যতা নয় নগ্নতা চাই—নগ্নতা আর নগ্নতা আর নগ্নতা
> [ উড়ন্ত অনুভূতি, ৬ : ঐ ]

এই বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছে মান্নান সৈয়দ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল বৃত্তিতে মগ্ন। বাক্‌প্রতিমা হিসেবে বাঁধা কপির আবরণ উন্মোচন, সত্যের আবরণ উন্মোচন, পৃথিবীর আবরণ উন্মোচন—দ্রৌপদীর শাড়ির মতো এযে উন্মোচন-হীন, কিছুতেই নগ্ন সত্য ফিরে আসে না ; আসে শূন্যতা, আর নগ্নতা বলে যে কিছুই নেই। প্রথম উদ্ধৃতিতে নিখিল নটরাজের নৃত্য, জন্মান্ধ

রেল, উড্ডীন হাতের কাঁপা-কাঁপা লেখা (বাতাসে), বাঁধাকপিরূপ মেদিনী, বাঁধাকপির পত্রাবরণ উন্মোচন ইত্যাদি বাক্‌চিত্র দৃশ্যানুভূতিকে সজাগ করে তোলে; আর সেই সঙ্গে নাস্তি, জন্মান্ধ রেল, বাতাসের অদৃশ্য শরীরে লেখার প্রয়াস মানসলোককে জাগিয়ে তোলে চৈতন্যে। আবার, দ্বিতীয় উদাহরণে বাঁধাকপির পাতার উন্মোচন, যুগের বিবর্তন, শূন্যে বাতিল পালক ঝরা, নীল শূন্যে রামধনুর উদয়; অতঃপর চাকরী মাছরাঙা তরমুজ চৈত্র-সন্ধ্যা। পত্রমোচনপর্ব....চামড়া খসে পড়া, পোষাকের উদ্দাম খসে পড়া, এবং পরিশেষে নগ্নতা শূন্যতা নগ্নতা নগ্নতা—দৃশ্যানুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে মনন এবং মেধার এই সংক্রাম আমাদের আন্দোলিত করে তোলে—বাগৈশ্বর্য এখানে বুদ্ধিকে জাগরিত করে এবং প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করে তোলে। বর্ণিত দুটি উদ্ধৃতিতে মান্নান সৈয়দ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোদুল বৃত্তিতে মগ্ন। কিন্তু বাক্‌প্রতিমা হিসেবে বাঁধাকপির আবরণ উন্মোচন (দ্রৌপদীর শাড়ির মতো উন্মোচন-হীন)—কিছুতেই নগ্ন সত্য ফিরে আসে না, ফিরে আসে শূন্যতা; নগ্নতা আসে না। কিন্তু নগ্ন না-হলে সত্যকে তো পাওয়া যাবে না, নিজেকে উপলব্ধি করা যাবে না, তাই 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' গ্রন্থে পৌঁছে একই সমস্যার সমাধানে তৎপর দেখি কবিকে—গড়িয়ে পড়া প্রতিমার আরেকটি নিদর্শন আমাদের বিহ্বল করে দেয়, এই বাক্‌প্রতিমা অবশেষে পৌঁছে সম্পূর্ণ নূতন এক তরুর বিশ্বস্ত প্রতিমায় (মূল প্রতিমা চৈত্র) :

এই চৈত্রে
আমি আদিম মানবের মতো নগ্ন হবো
চৈত্রের মতো নগ্ন হবো
তরুর মতো নগ্ন হবো
নগ্ন সূর্যের নিচে নগ্ন করবো সূর্যপ্রণাম
কৃষ্ণ সরোবরে নগ্ন করবো শান্তিস্নান
তারপর
পুরোনো তরুশরীরে পত্রে-পল্লবে মুকুলে-মঞ্জরীতে
নূতন নির্মাণের মতো
আমি হয়ে উঠবো সম্পূর্ণ নূতন
তরু এক

[ ও চৈত্র ও ডানা-অলা ঘোড়া ]

পরাবাস্তববাদীদের কবিতায় এই বিশ্বাস ও বিশ্বাসহীনতা কখনও বড় কথা নয়, বড় সমস্যা নয়। মান্নান সৈয়দ চিত্রের পর চিত্র সন্নিবেশ করে জীবনের দৃশ্যমান স্তরের স্বচ্ছতার গভীরে এক অস্পষ্ট জগতকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন—তাঁর বাক্‌প্রতিমা নির্মিতি তাই দৃশ্যবস্তু থেকে অদেখা লোকের দিকে ক্রম ধাবমান, ঈশ্বর-শয়তান-ফেরেশতাপন্থা একসময় মঙ্গলময় ফেরেশতার জন্য সনির্বন্ধ হয়ে ওঠে—তাঁর বিষয়াবলী সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার আয়ত্বে হলেও ভাবটি থেকে যায় প্রায় অধরা-দুর্লভ্য।

তাই মান্নান সৈযদ বাস্তব থেকে পবাবাস্তবে অনায়াসে চলে যান, এই অবিরল যাত্রায় তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বলে মনে হয়, কখনও-কখনও মনে হয় মান্নান সৈয়দের কবিতা চাঁদে-পাওয়া মানুষের প্রলাপ, এক উন্মাদের রহস্যালাপ। কিন্তু 'চাঁদে-পাওয়া' কবিতাগুচ্ছের 'সাতটি ফানুষ'-এর তৃতীয় সংখ্যক কবিতাটি:

> হাতে বানানো রুটির মতো চ্যাপ্টা, রোগা, পাৎলা চাঁদ,
> রেডিয়াম-দেয়া চাঁদ; হলুদ সূর্যমুখী, একমাত্র সূর্যমুখী
> আমার; একমাত্র তুমিই কি অসূর্যম্পশ্যা? কিশোরীর নতুন স্তন নাকি
> তুমি, অতল থেকে ফোয়ারার মতো উঠে এসেছো, সব
> সোনালি শিকড়গুলি উপড়ে ফেলে? ফসফরাসের কুয়ো?
> মেয়েমানুষের উজ্জ্বল-লাল বিদ্যুৎ-ঝরা কুয়ো? যেন বেলুন,
> বেলুন তুমি; কিন্তু অদৃশ্য শিশুটি সূতো ধ'রে লুকিয়ে আছে
> কোথায়? নাকি তুমি হৃৎপিণ্ড আমার?
>
> [ চাঁদে পাওয়া : জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ ]

চাঁদকে হাতে বানানো রুটির মতো চ্যাপ্টা বলার মধ্যে রয়েছে চাঁদকে আরও ঘরের করে তোলা (সুকান্তর 'ঝলসানো রুটি' স্মর্তব্য), অর্থাৎ চাঁদের বাক্‌প্রতিমাকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করানো। রোগা, পাৎলা, রেডিয়াম দেওয়া ঝলমল রূপ, হলুদ সূর্যমুখী—চাঁদকে পরিচিত জগতের সঙ্গে উপনিত করে তোলা হল। অথবা কিশোরীর স্তন কুঁড়ির মতো চাঁদ, রূপালী ফোয়ারা (যে সোনালি শিকড়গুলি ছিন্ন করেছে), ফসফরাসের কুয়ো, মেয়ে মানুষের অঙ্গের সঙ্গে তুলনা, ইত্যাদির মধ্যে চাঁদকে চিরপরিচিত করে তোলা হয়েছে, এখানে চাঁদের দূরতর পথে গমনাগমনকে ঘরে তুলে আরও বাস্তবে তুলে আনা হয়েছে এবং সর্বশেষে 'নাকি তুমি হৃৎপিণ্ড আমার'

চলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি মান্নান সৈয়দ বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে না পৌঁছে বরং পরাবাস্তব ঘুরে বস্তুধর্মী হয়েছেন—চাঁদকে বক্ষোবাসী হৃদপিণ্ড করে শব্দমান ও রক্তে-বর্ণে ইন্দ্রিয়বেদী করে তোলা হয়েছে, অন্তরতম প্রদেশে আবেগ ও শিহরণ সৃষ্টি করা অর্থাৎ স্পর্শরূপময় হল চাঁদ। সদা দৃশ্যমান ও অনুভূতির রাজ্যে, কাব্যে আবর্তনশীল চাঁদের উপমা সমৃদ্ধ-তর হল যখন কবি-কল্পনা একটির পর একটি উপমা গড়িয়ে উপনীত হল শেষতম উপমার (অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের) গায়ে, যেন প্রদীপ থেকে অজস্র প্রদীপ জ্বলে উঠল, অর্থাৎ প্রতিমাপুঞ্জ বা **chain imagery** পেলাম।

আবার দেখুন :

আজ দেখলুম
রৌদ্র একটা বিশাল সাদা ঘোড়া
ছুটছে প্রবল রমনায়
তার কেশর উড়ছে নীলিমার ঐ একথোকা ধূসর মেঘে
তার পায়ের নিচে একবার সবুজ ঘাসের ভেলভেট
একবার শাদা খটখটে ফুটপাত
একবার শীত-শেষ ঝরা মরা জালি-ধরা পাতার মতো অতীত
জানুআরির এই মধ্যদিনে
আমারি স্বপ্নের ভবিষ্যৎ-বাকশের মেঘনা ঢাকনা সরিয়ে
ঝলমলে এক লাফে বেরিয়ে এসে
রৌদ্র
একটা বিশাল শাদা ঘোড়া
প্রবল ছুটছে রমনায়

[শাদা ঘোড়া : ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ]

রৌদ্রের এক ধরণের বর্ণ আছে সেই জন্য দৃশ্যমান। চাঁদ সুদূরে বসেও কবির অনুভূতির রাজ্যে হৃৎপিণ্ড, আর রৌদ্র পরিণত হয়েছে বিশাল শাদা ঘোড়ায়। রৌদ্র দৃশ্যমান এবং গতিমান হয়ে উঠল; সর্বোপরি রৌদ্রকে রমনায় ধাবমান বলে চিহ্নিত করে স্থানিক করা হল, অশ্বের সঙ্গে উপমিত করে ধ্বনিরূপপ্রবল বাক্‌প্রতিমায় রূপান্তরিত করে দিলেন, এবং আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় উঠল সক্রিয় হৃদয় হয়ে, অথচ রৌদ্র ছিল এতক্ষণ শুধু দৃশ্যমান ও ত্বগেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। রৌদ্র অশ্বে রূপান্তরিত হয়ে প্রবল বেগে রমনায়

ছুটছে, দীর্ঘ কেশর উড়ছে নীলিমার এক থোকা ধূসর মেঘে (বাস্তব অতিক্রমশীল হয়েছে নীলিমা ও মেঘের মধ্যে অশ্বের কেশরকে দীর্ঘায়িত করে), ঘোড়ার পায়ের নিচে রমনার সবুজ ভেলভেট, পুনরায় খটখটে ফুটপাতে ইত্যাদি অতিক্রম করে প্রবল ভাবানুষঙ্গে মিলে গেল রৌদ্র নামক অশ্ব, পুনরায় অশরীরী ভাবের ও স্বপ্নের মেঘলা ঢাকনা সরিয়ে একলাফে বেরিয়ে এল রৌদ্র নামক সেই বিশাল ও পরাক্রমশালী শ্বেত অশ্ব এবং রমনায় ছুটছে প্রবল পরাক্রান্ত বীরের বাহন (বীর্যের প্রতীক হয়ে)। পূর্ববর্তী এই দু'টি উদ্ধৃতিতে চাঁদ এবং রৌদ্র সমৃদ্ধতর হল যখন কবি কল্পনা করলেন চাঁদ হৃদপিণ্ড এবং রৌদ্র অশ্ব। লক্ষণীয় সুদূর থেকে চাঁদ বক্ষোবাসী হয়ে নিকটবর্তী, রৌদ্রের নিরাকার অবয়ব অশ্বের উপমায় ঘনিষ্ট হয়ে উঠল— চাঁদ ও রৌদ্র আরও সুমিত হয়ে উঠল, আরও আবেগায়িত আরও সংক্ষুব্ধ হল।

'শাদা ঘোড়া' কবিতার সমান্তরালে 'ভোর' কবিতাটি পাঠ করা যায়। 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' কাব্যে মান্নান সৈয়দের কবি স্বভাব, কারুকৃতি, মনস্বিতা এইভাবে গড়িয়ে পড়া উপমায় বেশি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিম্নের আংশিক উদ্ধৃতিতে সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন ভোরের আলো প্রবল ধ্বনিরূপময় ও গতিরূপময় হয়ে বস্তু থেকে ভাবনাপুঞ্জ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে, কবি-কল্পনা উডডীন-উত্তাল হয়ে স্পর্শ করছে ভাবনা অনুভূতি বস্তু পরাবস্তু—বুঝতে পারি পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে ভোর বাক্‌প্রতিমা পূর্ণরূপ পাচ্ছে অস্থির বাগবৈভবের সম্মিলনে। ভোর ভাঙছে আর অনুভূতির শিহরণ জাগছে অস্থির আবেগে, ভোর উপচে পড়ছে আকাশ থেকে পৃথিবীতে 'নেমে আসছে আমাদের ছাদের উপর'। এবার পাঠ করুণ প্রবল ধ্বনিরূপময় কবিতাটি (কবিতাংশটি প্রথমে দৃশ্যরূপময়, অতঃপর ধ্বনিময়তা, অবশেষে বিষাদিত):

ভাঙছে ভোর
কোন অদৃশ্য-প্রস্ফুট লাইনের উপর দিয়ে
মাইল-মাইল গতিতে সোজা নেমে আসছে এক একটি রশ্মি
নেমে আসছে আমাদের ছাদের উপর
আমাদের ছাদ হ'য়ে উঠেছে বিরাট ফোয়ারা এক
শতধারে উচ্ছ্বিত হচ্ছে আলো
আলোককণা তারার মতো ছিটিয়ে পড়ছে ঘাসে উঠোনে বারান্দায়

প্রথম আলো
ভেসে যাচ্ছে বিশাল নীলিমা
দিগন্তে দেখা-না-যাওয়া এরোপ্লেনের শব্দ পাখির
মতো ঘুরে-ঘুরে উড়ছে
রাস্তায় প্রথম কোলাহল
শহরের মধ্য দিয়ে পার-হওয়া ট্রেনগতির শব্দ
ট্রেনগাড়ির এঞ্জিনের শব্দ
চিলেকোঠার উপর পায়রার পাখা-ঝাপটানির শব্দ
যে জীবন নষ্ট করেছি তার কথা ভেবে
ভোর হ'য়ে উঠেছে বিষাদিত

[ ভোর : ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ ]

'যে জীবন নষ্ট করেছি তার কথা ভেবে/ভোর হয়ে উঠেছে বিষাদিত'—শেষ পঙক্তির একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে-ভোর অন্য এক অর্থে প্রবল ও সংক্ষুব্ধ। ভোর ইতিপূর্বে অজস্র প্রতিমা নির্মাণ করে, ভোরের প্রতিমাপুঞ্জ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল তখনই একটি প্রবল আবর্তন তৈরী করল: অর্থাৎ নষ্ট জীবনের কথা ভেবে যখন ভোর বিষাদিত। ভোরের তরঙ্গ-প্রতিমা পৌঁছল অন্য এক ভাবানুষঙ্গে, ব্যক্তিক অভাববোধ নেমে এসে ভোর হয়ে উঠল স্থির এক বিষাদ বিন্দু, ভোরের ইন্দ্রিয়জ ধারণা গড়িয়ে পড়ল অন্য এক ইন্দ্রিয়ময় মনোশক্তিতে। পাশ্চাত্য সমালোচনা-শাস্ত্রে তার নামকরণ হয় সিনেসথিসিয়া (synaesthesia)। এই 'ভোর' কবিতার অনুষঙ্গে 'প্রথম ফাল্গুন ১৩৭৮' কবিতাটিও পাঠযোগ্য, অর্থাৎ প্রথম ফাল্গুনের সূর্য বা 'প্রাকৃতিক অগ্নি' পূর্বের সেই রৌদ্রের মতো এক তেজী ঘোড়া :

ফাল্গুনের
তরুণ
ঝলমলে
টাট্টু ঘোড়া

এদিকে, 'মৃত্যু, বৃষ্টির মতো' কবিতায় দেখি মৃত্যু চিত্ররূপময়, বর্ণাঢ্য, অলংকৃত মৃত্যু হয় চিত্ররূপময়-দৃশ্যরূপময়।

মৃত্যু মৃত্যু
বৃষ্টির মতো

মৃত্যু মৃত্যু
হঠাৎ তীব্র বৃষ্টির হাত থেকে পালানোর মতো
দৌড়ে উঠে আসে মানুষ ঘরে-বারান্দায়-নৌকোয়
মৃত্যু দৌড়ে এসে ধ'রে ফ্যালে
স্বপ্নের কালো ছাতা মেলে ধরে মাথার উপরে
বাস্তবের বর্ষাতি দিয়ে শরীর ঢাকে
মৃত্যু কোন ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে প'ড়ে ধ'রে ফ্যালে
বেলা দশটায় ডবল-ডেকার মনে ক'রে মৃত্যুতে চ'ড়ে বসে কেরাণী
ট্র্যাফিক-আইল্যাণ্ডে পুলিশের পোষাক প'রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যু
পাড়াগাঁর বৌ নদী থেকে কলসী ভ'রে মৃত্যু নিয়ে আসে
রাখাল টোকা মনে ক'রে মাথায় প'রে থাকে মৃত্যু
মৃত্যু এলো খাবার টেবিলে
মৃত্যু এলো পলায়মান নৌকোয়

[মৃত্যু, বৃষ্টির মতো : ও সংবেদন ও.... ]

এই চিত্ররূপময় মৃত্যু ভিন্ন-ভিন্ন ঘাটে বিভিন্ন চেতনায় গতিমান, সালংকার। মৃত্যু চলছে: বৃষ্টির মতো, তীব্র-বৃষ্টির হাত থেকে পলায়নপর মানুষের ন্যায়, আবার সেই দৌড়ে আসা মানুষকে ঘরে-বারান্দায়-নৌকোয় ধরে ফেলে দৌড়ে এসে ধরে ফেলে স্বপ্নের কালো ছাতা, বর্ষাতির মতো মানুষের শরীর ঢাকে মৃত্যু, বর্ষাতির ছিদ্র পথে মৃত্যু চুঁইয়ে পড়ে মানব-শরীর, ডবল-ডেকার মনে করে মৃত্যুতে চড়ে বসে কেরাণী, মৃত্যু ট্র্যাফিক-আইল্যাণ্ডের পুলিশ, কলসী ভরে মৃত্যু পাড়াগাঁর বৌ-এর কাঁখে করে আসে, রাখালের টোকা হয় মৃত্যু, খাবার টেবিলে আসে মৃত্যু, পলায়মান নৌকোয় চড়ে আসে মৃত্যু—অর্থাৎ বহুবিধ উপকরণের মধ্যে মৃত্যুকে আভাসিত করা হল, যেমন শামসুর রাহমান দুঃখকে দেখলেন 'দুঃখ' কবিতায়। মৃত্যু চিত্ররূপময় দৃশ্যরূপময় গন্ধযুক্ত স্বাদলিপ্ত ধ্বনিরূপময় গতিমান স্থির তীর্যক তেরছা। আবার এই মৃত্যু কখনও বর্ণলিপ্ত কখনও স্বপ্ন কল্পনাময়—অবশেষে অনেক মৃত্যু ও অনেক আত্মহত্যা পেরিয়ে জীবন জেগে ওঠে, মৃত্যুর হাজার দুয়ার থেকে ফিরে জীবন হয় বর্ণিল ও সুন্দর:

মৃত্যুকে
ঘরে-ওঠা অপরের মোরগের মতো
উড়ো-তাড়া দিয়ে সীমানা পার ক'রে দিয়েছি

তারপর নেমে এসেছি সূর্য-পক্ক ফসলের খেতে
তারা-আর সমস্যা-খচিত যুবরাজ
মৃত্যু নেমেছিলো বৃষ্টির মতো
আমার বন্ধ্যা ছোটো খেত ভরিয়ে তুলেছে শষ্যের সবুজ সন্দীপনে
জাগিয়ে দিয়েছে
জীবন

[ মৃত্যু, বৃষ্টির মতো : ঐ ]

মান্নান সৈয়দের কবিতা প্রবলভাবে চিত্ররূপময়। দৃশ্য থেকে দৃশ্যে যেতে, চিত্র থেকে চিত্রান্তরে গমনে, কিংবা ধ্বনির অর্কেষ্ট্রা তুলে তাঁর কবিতা চৈতন্যের গভীরে প্রবেশ করে। কখনও-কখনও মান্নান সৈয়দের কবিতা প্রায় কিছুই বলে না, শুধু একটা অনুভূতি হয়েই প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে, বাস্তব থেকে পরাবস্তু, পরাবস্তুর থেকে বাস্তবে এসে আন্দোলনধর্মী শুধু। তবে, 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ'-এ কবি যেমন জটিল 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ'-এ এসে কবি সংবেদনের দুয়ারে কবিতাকে উচচ স্বরে বেঁধে দেন,—দৃশ্যের সঙ্গে ভাবনা, ভাবনার সঙ্গে মনন, মননের সঙ্গে স্বপ্ন, স্বপ্ন থেকে পুনরায় বাস্তব—এই গমনাগমনে মান্নান সৈয়দ বিচিত্র রকম বাক্‌প্রতিমায় পাঠককে উদ্বোধিত করে রাখেন।

এবার, প্রতিমাপুঞ্জ সার্থক হয়ে উঠেছে....মান্নান সৈয়দের বাক্‌প্রতিমার একটি উজ্জ্বলতম উদ্ধৃতি এখানে সন্নিবেশ করছি। চৈত্র বাক্‌প্রতিমা :

ও চৈত্র
আমাকে তোমার ঝরা পাতার সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাও
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও ঝরা পাতার মতো
শূন্যে তুলে
ট্রেনগাড়ির অন্ধ ভিখিরির মতো একতারা বাজিয়ে
জীর্ণ এই জীবন থেকে
এই শতছিন্ন পোষাক থেকে
ও ডানা-অলা ঘোড়া
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও তোমার পিঠে এক নক্ষত্রের মতো
ছেঁড়া এই বর্তমান থেকে রাজকুমারীর মতো

[ ও চৈত্র ও ডানা-অলা ঘোড়া : ঐ ]

আবেকটি গড়িযে পড়া ভাবনাব....এক ইন্দ্রিযজ ধারণা থেকে অন্য ইন্দ্রিযজ ধাবণাব শ্রেষ্ঠ বাক্‌প্রতিমা, এখানে মূল প্রতিমা 'তুমি'। তুমিকে প্রতিষ্ঠা কবতে 'আমি'ব আগমন।

উর্ধ্বে চাঁদ
তুমি
মযলা আলো নিযে আমি দাঁডিযে থাকি শহবতলিব প্রান্তিক
লাইটপোষ্ট
সাবাবাত্রি ফ্রিজ-এ বাজে ঝিঁঝিব ক্রেঙ্কাব
আমাব বোদন চুবি কবে কেঁদে চলেছে ও

[বাত শহবেব তুমি : ঐ]

তেমন গড়িযে পডা, উর্মিল, ভাবনা-সংক্ষুব্ধ আবেকটি শ্রেষ্ঠ বাক্‌প্রতিমা . 'তুমি' বাকপ্রতিমা ভাবনা থেকে ভাবনায পৌঁছে 'আমাব' আনন্দ এবং চিব-কালেব দুঃখ হযে উঠল। একজন 'তুমি'কে কবি নিজেব সমস্ত দুঃখ-সুখেব পাত্রে ভবে অন্তবঙ্গ ও অন্তবতম কবে, একজন 'তুমি' একান্ত হর্ষ-বেদনাব নিত্যকাব সঙ্গী হযে ওঠে। দেখুন

নদী আমি
একবাব পাবো তোমাকে
হাবাবো একবাব
দক্ষিণে একবাব জেগে উঠবে
ধবতে গেলে পব-বছব পালাবে পশ্চিমে
পবে হযতো পূবে
পব-বছব উত্তবে
কি দক্ষিণে ফেব
এই আমাব চিবকালেব খেলা
চিবকালেব আনন্দ আমাব
চিবকালেব দুঃখ আমাব

[তুমি : ঐ]

নদী-তুমি-আমি-আনন্দ-দুঃখ একাকাব হযে সংবেদনকে উদ্বোধন কবাই—অবশেষে তুমি বাক্‌প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হযে এক প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি কবে।

বস্তুত মান্নান সৈয়দের মেজাজ এভাবে গড়িয়ে পড়া প্রতিমায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, এইভাবে বিশিষ্ট মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—বস্তুকে সম্মুখে এনে অথবা চিত্রকে বিন্যাস করে (আপাতভাবে মনে হবে বস্তু-চিত্র-ভাবনা মান্নান সৈয়দের কাব্যকারুতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, বিশেষত প্রথম দুটি গ্রন্থে), মান্নান সৈয়দের উচ্চালিত ভাবনাপুঞ্জ অবশেষে সংবেদনের অলিন্দে-অলিন্দে সনির্বন্ধ পুষ্পস্তবক সাজায়।

## নবম অধ্যায়

আসাদ চৌধুরী 'তবক দেওয়া পান'-এ কথার পর কথার আড়ম্বর করেননি, রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েননি; বরং তিনি স্বল্পবাক, ঋজু এবং বক্তব্য প্রকাশে একরকম অকুন্ঠ। এই ঋজু বক্তব্য প্রকাশে তিনি কখনও-কখনও কাব্য রীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, মাঝে-মাঝে বাক্‌ভঙ্গিতে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছেন, কখনও দুঃখের দহন-দানে কাব্যভাষাকে করেছেন অশ্রুমুখী, এমনকি ক্রোধকে প্রকাশ করেছেন বিনম্রভাষার বাক্‌বন্ধে—এই বাক্‌বিন্যাসের বৈচিত্র্যে ও বৈভবে তাঁকে এককরূপে চেনা যায়। আবার প্রেমের নিবিড়তা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যভাষা অলঙ্কার অন্বেষু হয়েছে, অবশ্য তখনও তাঁর কাব্যভাষার বুনট মূল ধারার অনুগামী। কাব্যভাষায় তিনি অলঙ্কার একেবারে পরিহার করেছেন বলছিনা, তবে এক্ষেত্রে বক্তব্য প্রকাশের অস্ত্ররূপেই তিনি প্রত্যেকটি তূণ সংযোজন করেছেন, তাই কখনও-কখনও সামান্য অলঙ্কারাভরণেই তিনি বক্তব্য সম্পূর্ণ করেছেন।

গ্রন্থের প্রথম দিকে তিনি একটু বর্ণিল, চিত্রল বা অলঙ্কারময়। নিম্নের স্বীকারোক্তি সম্পর্কিত অন্তরঙ্গ বক্তব্যটি বেদনায় কেমন মনোময় দেখা যাক। যেমন :

> বটের মূলে করুণ গাঁথা স্মৃতির গীতি
> প্রাচ্য দেশের অন্তরঙ্গ আজান যেন
> ফলবতী গাছের মতো বিনয় নত
> দলমুথা সহিষ্ণু ঘাস

[ স্বীকারোক্তি ]

এখানে, মূল বক্তব্য হচ্ছে কবির হৃদয় কেমন নরম-নিরব তা প্রকাশ করা। তিনি বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন কয়েকটি প্রতিমায়: করুণ গাঁথা, স্মৃতির গীতি, অন্তরঙ্গ আজান, বিনয়ী বৃক্ষ, সহিষ্ণু ঘাস। করুণ গাঁথা, স্মৃতির গীতি, অন্তরঙ্গ আজান যেমন শব্দময় আবার অন্তরঙ্গ বলে নিরব ভাষার শব্দহীনতাকেও প্রকাশ-প্রত্যাশী, এবং বিনয়ী বৃক্ষ ও সহিষ্ণু ঘাস

চিত্রল-প্রতিমা বা চক্ষেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। এই সকল প্রতিমায় প্রকাশিত হয়েছে একটি আবেগ, এই আবেগ প্রকাশের জন্য প্রতিমাগুলি হয়েছে বিনয়াবনত ও কোমল। কবির বক্তব্য এখানে অন্তরঙ্গ স্রোতে ধাবিত, উপচে-পড়া বেদনায় অন্তর্লীন—একে বলা যেতে পারে বেদনার উন্নত্ততায় লীন হওয়া, অথবা অস্থির বেদনাভারে আবেগবান ও চঞ্চল হওয়া। ফলবতী গাছ প্রতিমাটির মধ্যে শব্দময়তা ধরা যেতে পারে। বৃক্ষ যেমন স্থির শান্ত আবার বাতাসের আন্দোলনে সে মর্মর ধ্বনি তোলে। সমগ্র বাক্‌প্রতিমায় কবির মানসভঙ্গি ধ্বনিময় প্রতিমার দিকেই অধিক অভিসারী বোঝা যায়।

কিন্তু, তিনি ঐ দলামুথা ঘাসের মতো নিরবে পড়ে থাকবেন না। কবি হয়েও তিনি মনে করেন তাঁর কর্তব্য ও দায়ভাগ আছে, ঋণ শোধ করতে হবে, অপরে যে অন্যায়ভাবে সবকিছু জবরদস্ত দখল করে আছে তার মূল্য শোধ করতে হবে, জবর দখলকারীকে উৎখাত করতে হবে, এবং আপনার প্রাপ্য আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু ঐ পথ বড় কঠিন :

গোলাপের মধ্যে যাবো
বাড়ালাম হাত
ফিরে এলো রক্তাক্ত আঙুল।

[ আত্মজীবনী : ১ ]

উপরোক্ত 'রক্তাক্ত আঙুল' প্রতিমাটি বা প্রতিমাবিধৃত চিত্রটি বস্তুত মননসমৃদ্ধ। চিত্রধর্মীতাই যদি এর প্রধান গুণ হয়ে ধরা দিত তবে বক্তব্যটি প্রকাশে বিশেষ অর্থবহ হত না। কবিতার শেষ চরণ যুগলে পাই 'হায় দেহ, শুধুই শরীর/বিদ্যুৎবিহীন।।'—হাত বা আঙুল রক্তাক্ত হয়ে ফিরে এসেছে যে-শরীরে সেই শরীরে প্রতিরোধের বিদ্যুৎ নেই, বিদ্রোহ করতে জানে না যে—শরীর বা মন তার প্রাপ্য-তো যন্ত্রণা, সঙ্গী-তো যাতনা—অর্থাৎ বিদ্যুৎবাহী দেহ চাই, বিদ্রোহী সত্তা চাই। এই বোধ থেকে জন্ম নেয় :

তোদের আবার দুঃখ কেন, রাজার মতো ?
দায়িত্ব নেই, যোগ্যতা নেই লড়াই করার,
ভান করেছিস দিন রাত্তির সভ্য হবার
ঝুঁকি নেবার মুরোদও নেই, রাজার মতো
দুঃখ করিস মিছিমিছি এ রোগ কেন ?

[ আত্মজীবনী : ২ ]

ছত্রগুচ্ছ নিরাভরণ, চিত্রের আবর্তন তেমন নেই, আছে একটি বক্তব্যের তীর্যক ঘূর্ণন। বোকা জনগণের জন্য তীব্র কষাঘাতে চাবুক উদ্যত করেছেন তিনি, অথবা জনতার ছদ্মবেশে নিজের উপর আঘাত হেনেছেন। কবিতার নাম 'আত্মজীবনী', কাজেই প্রতীকের সাহায্যে কবি বক্তব্য তুলে ধরেছেন মনে করা যেতে পারে; অন্যদিকে সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিও এরই সমান্তরাল গতিতে আবর্তিত। আবার এই কবিতায় চিত্রধর্মী প্রতিমার উদ্ভাস আছে দেখুন: পেশির মতো দা বাঁকানো কাঁধ আছে তোর?—এই 'দা বাঁকানো কাঁধ' চলার সঙ্গে-সঙ্গে বাক্‌চিত্রটি আমাদের উদ্দীপিত করে তোলে, এখানে অধিকার আদায়ে আক্রমণমুখী মানুষ হওয়ার জন্য কবির যে দৃঢ় আস্থাজ্ঞাপক বাগৈশ্বর্য ফুটে উঠেছে তাতেই বুঝতে পারি কবির মানস-ভঙ্গী কোন লক্ষ্যের দিকে অভিসারী। এই মানসভঙ্গি থেকে জন্ম নেয় নিম্নোক্ত কথা :

তাঁতীর পূত গো করি মানা
লুঙ্গী থুইয়া শাড়ি বানা।
দেশ ভইরাছে মাইয়া লোকে
শাড়ি বানা থাকবি সুখে।
সোনার দেশ রে দুঃখে কই
লুঙ্গী-পরার পুরুষ কই?

[ফুল ফুটেছে থোকা থোকা]

সোনার দেশ এবং লুঙ্গী-পরা পুরুষ এই দু'টি প্রতিমার কথা ধরা যাক। সোনার দেশ কাপুরুষে ভরে গেছে, লুঙ্গী পরার পুরুষ মানুষ নেই বলে কবির দুঃখ—নিরাভরণ কবিতার, বক্তব্যধর্মী কবিতার পদাতিক এই কবি। অথবা, এইভাব ব্যক্ত-হওয়া শ্লোক' নামক কবিতার কথাই ধরা যাক—এই বক্তব্য যদি হয় অলঙ্কারহীন, মেদবর্জিত এমনকি কাব্যিক আবেদনও না-থাকে ভয় কী:

১. আসবে যতো সাহার্য। কমবে ততো আহার্য॥

[শ্লোক: ১]

২. পাট, ধান্য, চাল, চা,
দেশ ছেড়ে চলে যা॥

[শ্লোক: ২]

৩. চরম আঘাত হ'লো সব চেয়ে কোমল আঘাত।
অশ্রুর সরল বাণ অভিমানে বহায় প্রপাত॥

[শ্লোক: ৫]

সর্বশেষ উদ্ধৃতির প্রতিমাগুলি হল: চরম আঘাত, কোমল আঘাত, অশ্রুর সরল বাণ, অভিমানের প্রপাত। লক্ষণীয় চিত্রগুলো মনন সমৃদ্ধ এবং ঝোঁক নমনীয়তার দিকে, আবার চিত্রগুলো ধ্বনিরূপ সমৃদ্ধও।

অথবা নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিশ্লেষণ করা যাক:

পালায় মৃগ ঝাপসা রাতে বনে
তূণ ধ'রে কি সুন্দরীরা হিম?
ভাসলো ক্রোধ অশ্রুর লবণে
রাষ্ট্রনীতি পাড়লো শুধু ডিম?

[খতিয়ান]

এই স্তবকের মূল বিষয় রাষ্ট্রীয়-জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যর্থতা-বোধ। এখানে প্রতিমাগুলো হচ্ছে: পলায়নপর মৃগ, ঝাপসা রাতের বন, তূণ-ধরা সুন্দরী, ভাসমান ক্রোধ, অশ্রুর লবণ, রাষ্ট্রনীতির ডিম। অর্থাৎ চারটি চরণে ছ'টি প্রতিমার বুনট হয়েছে। পলায়নপর সুখের মৃগ বা সুখস্বপ্ন যে গতির উদ্ভাস তোলে, ঝাপসা রাতের বন যে চিত্রের উদ্ধার করে, কিংবা সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত-হওয়া হেতু ম্লান সৌন্দর্যের তূণ-হাতে হিম-প্রায় নারী (অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন-সাধনায় যে স্বাধীনতার উদ্ভাস হয়েছিল তার ব্যর্থতায় নারীর স্বাভাবিক লাবণ্যে পড়েছে ভাটা)—বাক্-চিত্রগুলো আমাদের আবেগায়িত ও চিন্তান্বিত করে তোলে। এইজন্য এখানে অশ্রুর লবণে ভাসছে ক্রোধ, যেহেতু রাষ্ট্র নামক স্বপ্নের অশ্বটি শুধু অলীক ডিমই প্রসব করে। কিন্তু এই ক্ষোভ থেকে বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়নি বরং ব্যর্থতার অন্তরঙ্গ ধ্বনিটিই উচ্চারিত হল মাত্র, কবি এখানে সামগ্রিক পরিস্থিতির ইতিহাস বৃত্তান্ত লিখেছেন কাব্যের মরমী স্রোতে। তাহলে উদ্দেশ্যমূলক কবিতা বলে একে উড়িয়ে দিতে হবে? কাব্য কি জীবনের সমাজের দর্পণ নয়, মহত্তর জীবনের উৎক্রান্তি কি কাব্যহৃদয় ধারণ করবে না? তাহলে 'রূপালী তবক দে'য়া পান'-তো মিলবে না, জীবনের থেকে সৌন্দর্য চর্চাই অন্তর্হিত হয়ে যাবে-যে। ধান-পান যদি ফুরিয়ে যায়-তো তবক দেব কোথায়? 'দুধ-মাখা ভাত' কাক নামক শোষকশ্রেণী লুটে পুটে খায়-তো শোষিত শ্রেণী চুপ করে থাকবে

কী। তাই কবি নপুংসক অর্ধ জীবিত শোষিত শ্রেণীকে পৌরুষের অধিকারী হওয়ার জন্য ডাকছেন; আয়রে মুর্দা ঘরে আয়/দুধ-মাখা ভাত কাকে খায় [ধান নিয়ে ধানাই পানাই : পৃষ্ঠা ৪৫]।

উপরোক্ত পর্যায়ের কবিতার পাশাপাশি আছে কবির ব্যক্তিগত আশা-নিরাশা প্রেম-হতাশার ধ্বনিপ্রবল চিত্রার্পিত কবিতা। আসাদ চৌধুরীর কবিতা এখানেও লোকজশিল্পকলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছে, পুনরায় এখানেও তিনি অন্তর্গত বেদনায় নিয়তি-তাড়িত। যে লোকসংস্কৃতির ধারা সিদ্ধাচার্যদের হাতে স্বর হয়ে বেজেছিল তার প্রতি প্রবল তৃষ্ণা কবিরও। দোহা গান বা পদাবলী একদিন বাংলার সংস্কৃতি মানসে যে নিজস্ব সঙ্গীত-শৈলী নির্মাণ করেছিল এবং মানস-সম্পদের বিবর্তন ঘটিয়েছিল তার বিকাশের ধারার অংশভাগী কবিও। যেমন:

তাহাদের স্বপ্নের ভিতরে কোন শব্দে স্বপ্নের আবহ বেজেছিলো?
কার সুরে?
কী ভাষায়?
মানুষের? না পাখির? মেঘের? নদীর?
নাকি ফোকের সরল বাঁশি
কেঁদে কেঁদে ফেলে গেছে আধোয়া জামায় মোছা
লেপ্টে যাওয়া দু'চোখের জল।

ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া কাঁপা কাঁপা শরীরের আয়তন নিয়ে
সরল উত্তর তার বেজে যায়।
মনে হয় কিছু তার বুঝি, যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মাথা কুটে মরেছেন, তার কিছু আমি আজ পেয়ে গেছি
বৃষ্টি-ভরা, দৃষ্টি-মেলা শ্রাবণের রাতে।

সে কি কোনোদিন বলা যাবে? কোনোদিন বলা হবে মানব ভাষায়?
নাকি সেও রাতের রহস্য হ'য়ে অন্ধকারে পাড় বুনে যাবে?
শুধু আমি, জীবিত জনেরা, তার পিছে পিছে কাঙালের মতো
লেগে থাকব আমরণ নিয়তি পীড়িত।।

[কোমল করাত]

দীর্ঘ এই স্তবকে কবির মানসভঙ্গীর একটি রূপরেখা ফুটে ওঠে। আজকের নগরকেন্দ্রিক কালচারের চাপে বাঙালী সংস্কৃতির মূল ধারার

বিবর্তন হবে অথবা ধ্বংস-করা উচিত কিনা সেই প্রশ্ন জেগেছে কবির মনে (এখানে কালচার ও সংস্কৃতির অর্থ সমার্থক নয়)। অর্থাৎ কবি বাঙালী সংস্কৃতির শুধু সংস্কারের পুনবার্বর্তন নয়. সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পক্ষপাতী। মানব সমাজেব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতিও খাত বদলায়। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামীর আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা সংস্কৃতি-চর্চা নয় বরং লোকজ সংস্কৃতিব শুদ্ধ বিবর্তনই তাঁর কাম্য। এই পর্যায়ে কবির বাগৈশ্বর্য সকল খাত স্পর্শ করে প্রবাহিত। একটি সুন্দর দৃশ্যমান প্রতিমা 'আধোয়া জামায় মোছা লেপ্টে যাওয়া দু'চোখের জল', চিত্রটি আবার ভাবনাতাড়িতও। কিংবা মনন-সমৃদ্ধ প্রতিমা হচ্ছে : শরীরের আয়তন নিয়ে বেজে যাওয়া সরল উত্তব, এবং আমরণ নিয়তি পীড়িত লেগে থাকা ইত্যাদি। ধ্বনিরূপপ্রবল অনেক প্রতিমা : স্বপ্নের শব্দ, সুর ও ভাষার শব্দ, মানুষ-পাখি-মেঘ-নদীর ভাষার শব্দ, ফোকের সরল বাঁশি, দু'চোখের জল (কান্নার শব্দমান প্রতিমা), কাঁপা কাঁপা শরীরের আয়তন, বেজে যাওয়া উত্তর, মাথা কুটে মরা, বৃষ্টি-ভরা শ্রাবণের রাত, মানব ভাষায় বলা, অন্ধকারে পাড় বোনা (জীবনানন্দ দাশ অন্ধকারের শব্দ শুনেছিলেন)। এত অধিক সংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর প্রতিমা এখানে নিবিড় হয়ে আছে যে বুঝতে কষ্ট হয়না কবি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন —সঙ্গীতধর্মীতা কবিতার বিশেষ গুণ হতে পারে। অথবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামের অনুষঙ্গে বেজে ওঠে বৌদ্ধ গান ও দোহার লোকজ সংস্কৃতির সুর—কবির অতীতচারীতা প্রীতির পরিচয় মেলে। আর, 'মাথা কুটে মরা' প্রতিমাটি নিহিত বাক্‌প্রতিমার উদাহরণ—মহৎ বা সাধারণ কবির মধ্যেও এই ধরনের সাহিত্য জাতিগত প্রতিমার উল্লেখ পাওয়া যায়, বস্তুত এই সকল ইমেজ ঐতিহ্যগত ভাষার সম্পদকেই স্মরণ কবিয়ে দেয়। পরিশেষে বলা যায় এই উদ্ধৃতি ধ্বনিরূপপ্রবল চিত্রল বাক্‌প্রতিমার নিদর্শন, এবং এর মধ্যে কবির বিশেষ মানসভঙ্গীর রূপ ফুটে ওঠে, বোঝা গেল কবি ধ্বনির অভিঘাত সৃষ্টির দিকে অধিক মনযোগী।

পুনরায় বিষয়বস্তুর ভিন্নতাধর্মী আরেকটি উদ্ধৃতি আহরণ করে দেখা যাক কবির মানসভঙ্গী ভিন্ন পথের দিকে গতিমান কিনা। যেমন :

> রূপসীর ঠোঁটে অবজ্ঞায় বেঁকে গেলেই
> আমি তাড়াতাড়ি নিজের বুকে টোকা দিই,
> আর আমার প্রবণতাগুলো অল্প জলে

রূপোলি মাছের
ঝকঝকে পিঠই দেখায়
আমি জলের উপর দিয়ে উড়ে গেলাম,
তো ঠিকই হলো—
হাঁটতে গিয়েই বিপদ,
আসলে ডাঙায় আমি হাঁটতে ভুলে গেছি।
আমি মুখের দিকে না তাকিয়ে
গোড়ালিকেই শুধু জিজ্ঞেস করি,
'হ্যাঁ ভাই, আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

[ আমার প্রবণতাগুলো ]

এখানে, বলা চলে, ব্যক্তিগত মানস প্রবণতাটি চরৈবতি মন্ত্রের ধারক। এখানে প্রতিমাবিধৃত চিত্রগুলো: অবজ্ঞায় বাঁকা ঠোঁট, টোকা দেওয়া বুক, অল্প জল, রূপালি মাছ, ঝকঝকে পিঠ, জলের উপর উড়াল দেওয়া, বিপদসঙ্কুল পথে হাঁটা, ভুলে যাওয়া পদাচারণ, চলমান গোড়ালি এবং পথ নির্দেশ ইত্যাদি। সমগ্র চিত্রটি গতিধর্মে উচ্চালিত, অর্থাৎ বিষয়গত চেতনায় কবি এখানে মানুষের চলিষ্ণু মন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন, এবং এই সকল বাক্-চিত্রের অনেকগুলোই ধ্বনিরূপ প্রবল। আবার, 'আমি জলের উপর দিয়ে উড়ে গেলাম' চিত্রটি পরাবস্তুর পানে ধাবমান, আর ঠিক পরবর্তী চরণে 'তো ঠিকই হলো' বলা গদ্যিক সাদামাটা কথাটি আকস্মিক এক অভিঘাত সৃষ্টিকারী বাক্‌বৈভব। কবিতাটি গদ্য ছন্দে রচিত, এবং গদ্যের এই চলমানতা বিশেষ আবহ সৃষ্টিকাবী। এখানেও শব্দমান প্রতিমারা উড়ে এসেছে। যেমন: বুকে টোকা দেওয়া, অল্প জলে রূপোলি মাছের পিঠ দেখানো, জলের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া, ডাঙায় হাঁটা ইত্যাদি।

কিংবা নিসর্গ বিষয়ক কবিতাব অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাক:

ব'সে আছি
শত্রুহীন
মিত্রহীন
পুরোনো এলবামে নিজের ছবিই
ঝাপসা

শ্রাবণ যৌবন
ঝ'রে যায় কদম্ব বনে
কেঁদে কেঁদে যায়
একেক দিবস আর একেকটি রাত ॥

[ নিসর্গ : শ্রাবণ ]

এখানে জীবনের অথবা যৌবনের ব্যর্থতাবোধ প্রকাশের জন্য বিষয়ানুগ যে প্রতিমার উদ্বোধন হল তা লক্ষণীয়। বসে থাকা শ্রাবণের দিনরাত্রি এবং শ্রাবণ যৌবন বলার সঙ্গে-সঙ্গে এক প্রবল ধ্বনিময় বর্ষার চিত্র চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বগেন্দ্রিকে উন্মাতাল করে তোলে, আর 'ঝ'রে যায় কদম্ব বনে' 'কেঁদে কেঁদে যায়' চিত্র দু'টিও ধ্বনিরূপপ্রবলতার চিত্র। অথবা একেকটি ব্যর্থ দিবস রাত্রিও কি বর্ষার শব্দপতনকে মূর্চ্ছাতুর করে তোলে না? কবিতার প্রারম্ভে 'রোগীর ঝোলের মতো দিবস ও রাত' চিত্রটি কবির ব্যর্থতাবোধকে দ্বিগুণ শক্তিমান-করা একটি নিজস্ব বাক্‌চিত্র। অথবা 'নর্দমার জল ফণা তুলে ফুসছে' বাক্‌চিত্রেও এই ধ্বনিময়তা—সম্পূর্ণ কবিতাটি এই আবহে পড়লে আসাদ চৌধুরীর লিরিক চেতনা এবং মানস-ভঙ্গীকে অনুভব করতে বেগ পেতে হবে না।

আরও একটি ধ্বনিরূপপ্রবল এবং বেদনায় অন্তর্লীন উদ্ধৃতি আহরণ করছি :

ঘরের বাঁশি তো সব প্রবাসীই শোনেন।
সবাই এলেন,
সে তো খালি হাতে
ধুঁকে ধুঁকে আসছে না—
ও ময়ূর, আমি পাগল হয়ে যাবো ॥

[ ঘরের বাঁশি ]

কবিতাংশটির মূল প্রতিমা বেদনাসঞ্জাত ভাবনার তাড়না। বাক্‌চিত্রগুলো এই : ঘরের বাঁশি, খালি হাত, ধুঁকে-ধুঁকে না-আসা, পাগল হওয়া ইত্যাদি। পুনরায় শ্রবণেন্দ্রিয় উদ্বেল প্রতিমা হচ্ছে ঘরের বাঁশি, ধুঁকে-ধুঁকে না-আসা কিংবা ময়ূর চিত্রটিও ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টিকারী, কেননা ময়ূর বলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ময়ূরের নৃত্যপরতার কথা ভুলতে পারি না-নৃত্যপটু ময়ূর যেমন চিত্রল তেমনি তার পাখার ঘ্রাণ ও আমাদের অভিভূত করে,

কবি এখানে ময়ূরের পালকের ঘ্রাণের উল্লেখ করেননি এবং করার কোনো প্রয়োজনও নেই, কারণ সহৃদয় পাঠক তাঁর ইন্দ্রিয়বেদী কাব্য শরীরের জন্য নিজেকে নিয়তই প্রস্তুত রাখেন। কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা তুঙ্গ স্পর্শ করে যখন আমরা শেষোক্ত চরণে পৌঁছি, অর্থাৎ যখন স্পর্শ করলাম শুনলাম দেখলাম যে: ও ময়ূর আমি পাগল হ'য়ে যাবো। অথচ সমগ্র কবিতাটি নোংরা তেল-চিট চিড়া, মস্ত ভারী বোঝা, শহরের আটা-চিনি, বাংলা সাবান, ছটাক খানেক জিরা ইত্যাদি অভাবের চিত্র আমাদের যন্ত্রণার চাবুক কষলেও স্তবকের শেষ পংক্তিতে এসে এক অভিঘাতের মুখে আন্দোলিত হয়ে উঠি—আসাদ চৌধুরী তুচ্ছ অভাবে সংসারেও বাঁশিতে নহবৎ বাজালেন বাঁশির সঙ্গীতময়তা থেকে আমাদের যেমন মুক্তি নেই, পুনরায় অভাবের তাড়না থেকেও পলায়ন অসম্ভব। 'ও ময়ূর আমি পাগল হ'য়ে যাবো' বাক্‌বন্ধে কবি যে বিরোধাভাস ফুটিয়ে তুলেছেন, যে প্রতীকি মর্যাদা দিয়েছেন —কবিতা পাঠের এই অভিজ্ঞতা স্মরণ থাকবে।

দুঃখ ভারাক্রান্ত ও ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টিকারী আরেকটি উদ্ধৃতি আহরণ করছি যার মূল বক্তব্য বেদনাবোধ:

দুঃখের ভারে আকাশ পড়ে না ভেঙে
জ্যোৎস্নার কাছে ক'ফোটা চোখের জল
রাখতে দিয়েছি আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
সঞ্চয় ওই ক'ফোটা চোখের জল।

[গোলাপের কাঁধে হাত রেখে]

বাক্‌প্রতিমান্বেষণে প্রায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছি যে আসাদ চৌধুরীর কবিতার প্রধান রং ধ্বনিচেতনাময় বেদনাভিলাষী। এখানে প্রধান বাক্-চিত্রাবলী কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, যেমন: আকাশ পড়ে না ভেঙে, ক'ফোটা চোখের জল, আষাঢ় শ্রাবণ মাসের সঞ্চয়, বা শেষ পঙক্তির পুনরাবৃত্ত সঞ্চিত ক'ফোটা অশ্রুজল। শব্দের এই মরমীবেদনাভার আমাদের ভাবিত করে তোলে। কবিতা ইন্দ্রিয়বেদী হেতু তার প্রতিমাবলী ইন্দ্রিয়ের কোন অংশকে উন্মথিত করে তুললে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে তা একেবারেই কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করবে। আসাদ চৌধুরী এই ব্রতে ধ্বনিময় বেদনার বাক্‌চিত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। এই পর্যন্ত যে সকল উদ্ধৃতি আহরণ করেছি তাতে দেখা যায় কবিকন্ঠে

বিদ্রোহের উচচকিত বক্তব্যের নয় বরং বেদনা-নির্ঝর ভাষাকেই তিনি বরাবর প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে এই কথা স্থির সিদ্ধান্তের মতো কেউ যেন মেনে না নেন যে তাঁর কবিতা শুধু ধ্বনিব্যঞ্জনানির্ভর।

'সুপ্রাচীন গল্প' ও 'তর্কাতীত' রচনাদ্বয়ে বাইবেলীয় ভাষাকে নিয়ে নিরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু সাফল্য ও অনুবর্তন কতটুকু গ্রাহ্য তা গুণী সমালোচকরাই স্থির করবেন। তবে, এই ভাষায় আসাদ চৌধুরী আবেগ-শীল কাহিনীকে বাঁধতে চেয়েছেন বোঝা যায়, অথবা ভবিষ্যতে এই ভাষায় তিনি কিছু কাজ করবেন বলে তার সূচনা করে দেখেছেন কিনা বলা যায় না। তাঁর এই ভাষার প্রধান গুণ সঙ্গীতময়তা, এবং কাহিনীর গুণ গীতিময়তা। উদ্ধৃতি আহরণ করে দেখানো যেতে পারে:

> যখন মঙ্গল মুহূর্ত, তাহারা ক্ষার দ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জনা করিল, অবগাহন করিল, মন্ত্রোচচারিত তৈল লেপন করিল, রমণীটি রেশমীবস্ত্র পরিধান করিল, দুশ্চিন্তা স্কন্ধে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যুবকটি পরি-ষেবিত কেশগুচ্ছ এবং দুগ্ধবতী গাভী ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিল, যুগলে প্রার্থনা করিল :
>
> কতদিন আমি বালুকা গগনা করিয়াছি ঝাঁ ঝাঁ দ্বিপ্রহরে কোনদিন শ্রবণ করি নাই ব্যগ্রস্বর, বাবা, আব্বা গো....
>
> [ সুপ্রাচীন গল্প ]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে সমগ্র চিত্রটি ধ্বনিময়তায় উচচালিত। ক্ষার দ্বারা গাত্র মার্জন, অবগাহন, মন্ত্রোচচারিত তৈল লেপন, রেশমীবস্ত্র পরিধান, দুশ্চিন্তার নিঃশ্বাস ত্যাগ, যুগলের প্রার্থনা, বালুকা গণনা, ঝাঁ ঝাঁ দ্বিপ্রহর, ব্যগ্রস্বরে বাবা ডাকা—প্রত্যেকটি চিত্র শব্দমান প্রতিমার উদ্বোধন করছে। আর, সমগ্র রচনাটিতে মঙ্গলগীতি ও আশীর্বাদ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কিংবা আলো প্রজ্জ্বলন, অস্ত্রের উল্লেখ, স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণ, জল উত্তোলন, বস্ত্র ধৌতকরণ, তৈল শোধন, শস্যের উল্লেখ ইত্যাদি বারবার ধ্বনিময় প্রতিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও তেমন উদ্ধৃতি আহরণ করছি :

> যখন তিনি আদরের কন্যা ছিলেন জনকজননীর, প্রতিবেশীদের ধরে তাহার সৎ-সমালোচনা হইত, কূপ হইতে জল তুলিতেন। বস্ত্র ধৌত করিতেন, মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতেন, তৈল শোধন করিতেন,........

অথবা,

যেই খানে মেষ—

পালকের বংশী বাজাইতেছিল সেইখানে গমন করত তিন মাসের শিশুর হস্ত হইতে বেলুন কাড়িয়া লইল এবং উক্ত বায়ুময়, ফাঁপা শূন্যোদর বস্তুকে নির্মমের মত হত্যা করিতে লাগিল, নিত্যসঙ্গী যুবতীরা বিষাদের গান গাহিয়া উৎসাহিত করিয়াছিল।

দেবদূতগণ বিশ্বাসীগণ, জনহীন শস্যশূন্য প্রান্তরে যেখানে শুধু শ্যামের বাঁশী, অত্যাচারিত শিশুটি কী গভীর অন্তরঙ্গ, ব্যগ্র আন্তরিক রোদন করিতেছে, হের।

একদা পাপীরাও ঐরূপ রোদন করিবে—উহাদের একজন রক্তাক্ত তলোয়ার মুছিতে মুছিতে বলিল, তাহার হস্তে রঙ্গীন ট্রানজিষ্টারে লালসার গান ঝরিতেছে।

দুগ্ধবতী জননী অসতী বলিয়া উহারা রোদন করিতেছে, উহারা দুগ্ধ পানে বিরত, কেবলমাত্র অভিশপ্তরাই ঐ দুগ্ধ পান করে, নিজেদের পবিত্র বিবেচনা করে।

আহা বিহঙ্গকুল কি মধুকান্ত সঙ্গীত শুনাইতেছে না?

[ তর্কাতীত ]

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে ধ্বনিরূপপ্রবল প্রতিমারা কি আবহ সৃষ্টি করেছে লক্ষণীয়। সমগ্র 'তর্কাতীত' রচনাটিতে রোদন ও সঙ্গীত বিশেষ ভূমিকা পালন করে গভীর আবহ সৃষ্টি করেছে। উদ্ধৃতাংশে পালকের বাঁশি, যুবতীদের বিষাদের গান, শস্যশূন্য প্রান্তরে শ্যামের বাঁশী, শিশুর আন্তরিক রোদন, পাপীর রোদন, রঙ্গীন ট্রানজিষ্টারে লালসার গান, শিশুর রোদন, বিহঙ্গকুলের মধুকান্ত সঙ্গীত ধ্বনিময় বাগৈশ্বর্য সৃষ্টিকারী। ধ্বনিময় বাক্‌চিত্রগুলো একের পর এক এসে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্ত করে—কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে।

পুনরায় এই জাতীয় রচনায়ও আসাদ চৌধুরীর ব্যঙ্গপ্রিয়তা অনুপস্থিত নয়। যেমন:

—(ক্রুদ্ধ যুবরাজ উপবেশন করিলেন, তাহার হস্তের অব্যর্থ বাণে 'নাগরিক' শহীদ হইল। জনৈক পণ্ডিত কথাগুলিকে বোতলে পুরিলেন, টাইপ করিলেন, কিছু নিজের উক্তি লেবেল দিয়া মিউজিআমে রাখিয়া দিলেন, যেন ভ্রূণ, প্রদর্শনীর ভ্রূণ।)

[ ঐ: ]

তবে 'সুপ্রাচীন গল্প' ও 'তর্কাতীত' জাতীয় রচনা যে নিতান্ত নিরীক্ষা-মূলক তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই পরীক্ষাধর্মীতা সর্বত্র সফল হয়েছে বলা যায় না। রচনায় মাঝে-মাঝে ইংরেজি শব্দের সাহায্যে বাক্‌বৈভব সৃষ্টির প্রয়াস যেন সমগ্র রচনাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছে। যেমন: ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সদের মত সেবা, রঙ্গীন ট্রানজিষ্টার, বাণী সমূহ বেশি পপুলার ইত্যাদি। এখানে ট্রানজিষ্টার, ট্রেনিংপ্রাপ্ত, পপুলার শব্দগুলো প্রয়োগরীতির দুর্বলতায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। অবশ্যই আমরা জানি এই রচনা বাইবেলের যুগের নয়। বাইবেলের বাংলা ভাষার নবায়নই এই রচনার আরেকটি গুণ হতে পারে, এই জন্য মুখের ভাষাও অবলীলা-ক্রমে চলতে পারে বলে যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই সব চিত্র সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন করেছে বলে আমার ধারণা।

সর্বশেষে প্রবল ধ্বনিময় একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই রচনা সমাপ্ত করছি। এই উদ্ধৃতির মধ্যে ধ্বনির বিস্তার ও প্রাধান্য রয়েছে, এবং ভাষার গতিময়তাও এর আর একটি গুণ। উদ্ধৃতি বাক্‌প্রতিমাটি যেমন ধ্বনিময়তা সৃষ্টিকারী তেমনি এর দৃশ্যময়তাও তুল্যমূল্য। যেমন:

> সুগন্ধিসমূহ সমীরণকে প্রিয় করিয়াছে।
> কিন্নর কিন্নরী বাদ্য বাজাইতেছে।
> বন্দীগণ স্তব করিতেছে।

লোকালয় হইতে দূরে, সানুদেশে এবং উপকূলে, পবিত্র বাধ্যভূমিতে নগরবাসী রমণীবৃন্দ স্বচ্ছ, আরামপ্রদ নয়নাভিরাম পোষাক পরিধান করতঃ প্রেমিকদের সহিত প্রণয় ভাষণ করিতেছে, আলো-স্রোতের মত প্রবল বারিধি রৌপ্যনির্মিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে—

[ ঐ ]

## দশম অধ্যায়

নির্মলেন্দু গুণের স্বভাবধর্মী দু'টি প্রিয় শব্দ ও শব্দের অনুষঙ্গের বিবর্তন-শীল রূপ এবং বাগবৈভব সকলকে আকৃষ্ট করে। তাঁর কাব্যবিচারে এই শব্দদ্বয়ের বিশেষ মূল্যমান স্বীকৃতি হবে বলে আমার বিশ্বাস। শব্দদ্বয়: জনতা ও নারী। এই শব্দ দু'টির ঘূর্ণাবর্ত বেদনায় বিহ্বলতায় উল্লাসে অপস্মারে বিরোধে কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও ম্লান, আবার কখনও উজ্জ্বল রৌদ্রদীপ্ত। জনতার রুচি প্রগতি পিছুটান আবর্তনশীলতা রোষবহ্নি তাঁর কবিতার অবয়বে এক বিশেষ আমেজ ও আবহ সৃষ্টিকারী শক্তি। অন্যদিকে নারী হয়েছে যুগপৎ কাম সহচরী ও প্রেমী। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' গ্রন্থের নারী নর্ম-সহচরী এবং স্বভাবতই একক কোনো নারীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এখানে নয়, এমন কি চিরন্তন প্রেম নেই এমন বাক্‌চিত্রের উল্লেখও এখানে পাওয়া যায়। আবার কখনও নারীর অধিক দেশ-ই প্রিয়তর, এবং জনতা হয়েছে কবির হৃদয়ের নিজস্ব প্রতিনিধি। 'কবিতা, অমীমাংসিত রমণী' গ্রন্থে ঐ নর্ম-সহচরী নারী গণ-নারীতে রূপান্তরিত, এবং ঐ সাধারণ নারীর অবমাননায় কবি ক্রন্দনময়; পরক্ষণে ঐ নারীর প্রতি বিতৃষ্ণ-বিদ্বেষেরও অবশেষ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রেম ও নারীর অধিক আরাধ্য হয় কবিতা। নারী ও জনতার মধ্যে অন্তর্বিরোধ সর্বপ্লাবী হয় 'না প্রেমিক, না বিপ্লবী' গ্রন্থে—কবিতা ও প্রেম-বিষয়ক স্মৃতি-বিস্মৃতি দূরস্মৃতির প্রতিমাই অবিসংবাদী প্রাধান্য পায় এই গ্রন্থে। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' গ্রন্থের 'অসমাপ্ত কবিতা'য় জনতার চেয়ে মাধবী নামক জনৈকা নারীর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী হয়। 'দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী' গ্রন্থে জনতা-বিষয়ক বাক্‌প্রতিমার অনুপস্থিতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; অবশেষে 'চৈত্রের ভালোবাসা' গ্রন্থে ভালোবাসার সর্বপ্লাবী ও শ্রেষ্ঠ বাক্‌-প্রতিমা কবিতাকে গাঢ় এক সমাচ্ছন্নতায় আবর্তনশীল ও হৃদয় দ্রবকারী করে তোলে—জনতা প্রতিমা বিদায় গ্রহণ করে। এক সময় জনতা-চিন্তণ প্রতিমা-ঘূর্ণি নির্মলেন্দু গুণের কবিতাকে যে বিশিষ্টতা দিয়েছে, অবশেষে সেই জনতা প্রেমের কাছে এবং প্রেমময়ী নারীর পদতলে সর্বস্ব উৎসর্জ্জন করে হারিয়ে গেল।

প্রথমে জনতা সম্পর্কিত বাক্‌গুচ্ছের আলোচনা করা যাক। জনতার এই ঘূর্ণন প্রতিমাগুচ্ছের স্বাদ এখানে ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়বেদিতায় তীক্ষ্ণ। জনতার সঙ্গে বিদ্রোহ-বিপ্লব অঙ্গে-অঙ্গে মিশল থাকে, জনতার সঙ্গে দেশের পরাধীনতার বেদনার চিত্রও সম্পর্কিত, এবং স্বাক্ষর থাকে অত্যাচারী শাসকের কাছে পরাভবের গ্লানিও। ভণ্ড দেশ-দরদী নেতা কি-ভাবে জনতাকে নেশার মধ্যে ডুবিয়ে বোকা করে রাখে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে এই বাগৈশ্বর্যাবলীতে। এমনকি, অবশেষে, একসময় দেখি জনতা-জনসভা সকলই কবির ব্যক্তিগত প্রেমের জন্যই, এবং এই ব্যক্তিগত প্রেম দেশপ্রেম থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়—কবিকে স্বদেশ প্রেম থেকে ব্যক্তিক প্রেমে, বহু থেকে একের দিকে ক্রমাভিসারী দেখি। প্রথমে স্বদেশ, প্রিয়তমা ও জনতার দিকে গতিমান্ একটি বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি :

সুন্দর মুখের ছাঁচ তোমার দেহের মতো
প্রিয়তমা দেশের সীমানা।
কোনো দিকে পথ নেই, এপথেই হেঁটে যেতে হবে
মানুষের কাছে, কলরবে।
আমি বসে আছি তোমাকে দেখবো বলে ব'সে থাকি
কতো দিন ধরে ব'সে আছি তোমাকে বলবো বলে ব'সে আছি
আজ হরতাল, আজ ভালোবাসবার শুভদিন।

[ প্রেমাংসুর রক্ত চাই : ২৩ ]

এই চিত্রটিতে দেশের সীমানা উপমিত হয়েছে প্রিয়তমার মুখ ও দেহবল্লরীর সঙ্গে, এই চিত্রটি দৃশ্যমান। পরবর্তী, কলরব করে পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে পেঁছার চিত্রটি গতিমান ও শব্দমান প্রতিমা। অতঃপর বসে থাকা, দেখার জন্য দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, হরতাল এবং হরতালজনিত প্রিয় সম্মিলনের সুবিধা (কবি হরতালকে সমর্থন করছেন দাবী আদায়ের সংঘবদ্ধ প্রয়াসরূপে নয় বরং প্রিয় সম্মিলনের প্রকৃষ্ট সময় হিসেবেই) চিত্রগুলি দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য প্রতিমা—সবকিছুর মিশ্রণে যে অখণ্ড বাক্‌চিত্রটির উদ্বোধন হয় তাতে প্রিয়তমার শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে।

লালশালু ঘেরা ষ্টেজে, বক্তৃতায়
পল্টনের মাউথ অর্গানে—
গণসঙ্গীতের নির্যাতিত রাতে।

মারমুখো অন্যায়ের রাহুগ্রাসে
আমাকেও দিতে হবে প্রতিবাদে নৃশংস আগুন।

[ ঐ : ২৬ ]

লালশালু ঘেরা ষ্টেজ, কথার খেলা-বিস্তার, গণসঙ্গীতের নামে সঙ্গীতের উপর নির্যাতন দেখে-দেখেও কবিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আগুন তুলে ধরতে হবে। বস্তুত কবি জনতা-জাগরণের প্রয়াসকে শূন্যকুম্ভ বলে উপহাস করছেন। এই বাক্‌চিত্রে কবি জনতা-ভীরুতা ও জনতা-প্রেম দুইই প্রকাশ করেছেন। (বাক্‌চিত্রটির পূর্বের পংক্তিতে কবি বলছেন, 'আমাকে থাকতে হতো, আমাকে থাকতে হয়/আমাকে থাকতে হবে, আমাকে থাকতেই হবে' —বাক্‌চিত্রের বর্ণনার এই ঢঙ বুঝতে বাকি থাকে না জীবনানন্দের। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' গ্রন্থে জীবনানন্দীয় রীতিতে এলায়িত বর্ণনার ঢঙ কবিকে আচ্ছন্ন করেছে, আবার 'চৈত্রের ভালোবাসা' গ্রন্থে রাবীন্দ্রিক বর্ণন-ভঙ্গীও দুর্লক্ষ্য নয় বলে আমার ধারণা। কিন্তু 'চৈত্রের ভালোবাসা' গ্রন্থটি অনেক পরিশীলিত, অনেক বেশি সৌকর্যমণ্ডিত এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; এবং এই গ্রন্থ নির্মলেন্দু গুণের শ্রেষ্ঠ কবিতার সাক্ষ্য বহনকারী বলে মনে হয়।) জনতা-ভীরু প্রতিমার আর একটি নিদর্শন তুলে ধরছি এখানে :

যে মিছিল বধূ হয়ে আমাকেও একদিন
কাছে ডেকেছিল তার সঙ্গে কোনো কথা হলো না
যে জনতা আমাকে কবি বানিয়েছে তারও সঙ্গে না।
আমি মাঝ পথে ফিরে এসে শব্দহীন মধ্যরাতে
আমার আত্মার সাথে, দুঃখ জ্বালা দহনের সাথে
একা-একা আলাপ করেছি। আত্মায় আগুন জ্বেলে
রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম, মুক্তির ইশতাহার পুড়িয়ে ফেলেছি।

[ কবিতা, অমীমাংসিত রমণী : ২০ ]

জনতার কাতারে নামতে হবে। জনতার কাতারে সামিল হয়েছেন তেমন বাক্‌প্রতিমার নিদর্শন :

ডিমের খোলশ ভেঙে পাখির মতোন
রাজপথে বেরিয়ে এসেছি, যেখানে মানুষ তার
জীবনের সব প্রাপ্য এসেছে মেটাতে

[ প্রেমাংশুর : ২৭ ]

বুকের বোতাম খুলে প্রেমাংশুকে বলিনি কি দেখো,—
'আমার সাহসগুলি কেমন সতেজ বৃক্ষ
বাড়ীর পাশের রোগা নদীটির নীল জল থেকে
প্রতিদিন তুলে আনে লাল বিস্ফোরণ?'

[ ঐ : ২৮ ]

মুক্তি বাহিনীর কালো জীপ থেকে ছিটকে পড়া
বুলেটের মতো রাজপথে গড়াতে গড়াতে একদিন
জনতার স্বাধীনতা মিছিলে গিয়েছিলাম

[ কবিতা : ১৯ ]

ভিক্ষুককে জনতার কাতারে নামাতে হবে, ভিক্ষার হাতকে দাবীর হাত করে তুলতে হবে। চিত্রটি মননশীল ও দৃশ্যময় কিন্তু চমক সৃষ্টিই যেন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য :

এই ভিক্ষুকটাকে আমি আর কোনদিন পয়সা দেবো না
রাজদণ্ড এনে দেবো হাতে?
নাকি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেবো ভিক্ষার্থে নিযুক্ত হাত সেসব হাতের দিকে
যে সব যমের হাত রাজদণ্ড ধরে বসে থাকে!

[ প্রেমাংশুর : ২৯ ]

জনতা একদিন হিসাব চাইবে, তার প্রাপ্যের ভাগ সুদে-মূলে দাবী করবে। জনগণ মনে করে মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-গভর্ণর সকলেই তাদের প্রতিনিধি এবং ইচ্ছার প্রতীক। কবি এই সত্য জানেন বলেই নিম্নোক্ত বাকবৈভব এত উজ্জ্বল (দৃশ্যমান ও শব্দমান বাক্‌বিন্যাস) :

আমার সঙ্গে অনেক টাকা জিন্নাহর
কোটি কোটি মাথা;
আমি গণভোটে নির্বাচিত বিনয় বিশ্বাস
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর
অথচ আমার কোনো সিকিউরিটি নেই, একজন বডিগার্ড নেই
সশস্ত্র হামলায় যদি টাকা কেড়ে নেয় কেউ
আমি কি করে হিসেব দেবো জনতাকে?

[ ঐ : ৪০ ]

উদ্ধৃত করছি জনতার জাগরণ চিত্র, জনতার প্রতিরোধ কঠিন বাকচিত্র, জনতার জাগরণ কবিকে সংক্রামিত করেছে। বাক্‌চিত্রটি কর্ণেন্দ্রিয় (ত্বক এবং চক্ষুও) তৃপ্তিকারী :

সেইসব কারখানার শ্রমিক যারা
ইস্পাতের আসল নির্মাতা
যারা তৈরী করতো স্নো-বিস্কিট
আমার জন্য সার্ট, নীলিমার জন্যে শাড়ি
তারা এখন অন্য মানুষ, তাদের বাড়ি এখন
প্রতিরোধের দুর্গ।
কাঠের লাঙল ফেলে লোহার অস্ত্র নিয়েছে হাতে
কপালে বেঁধেছে লাল শালুর আকাশ,
শহর জয়ের উল্লাসে ওরা রবীন্দ্রনাথকে বলছে স্বাধীনতা
রবীন্দ্রনাথের গানকে বলছে ষ্টেনগান।

[ না প্রেমিক, না বিপ্লবী : ১১ ]

তোমার হাতের তসবিহ্‌র মতো
মৃত লক্ষ ছেলের মাথার খুলি
আজ কি সুন্দর আলো দিচ্ছে দেখো, মাগো
অন্ধকারে ভয় করো না

[ ঐ : ৩৬ ]

এই সঙ্গে জনতার জয়ের, জনতার উল্লাসের বাক্‌চিত্রটি প্রণিধানযোগ্য। চিত্রটি মননধর্মী, গোলাপের ও আগুনের অনুষঙ্গে চিত্রময়, পুরোভাগে হাঁটার চিত্রে ও আগুনের উল্লেখে গতিমান চিত্রেরও উদ্ভাস তোলে। যেমন :

মানুষের মুখে গোলাপের স্বরলিপি
মৃত্যু এনেছে নির্মম দেবতার।
পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত ভূমণ্ডল
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

[ প্রেমাংশুর : ৩৪ ]

কিন্তু 'কবিতা, অমীমাংসিত রমণী' গ্রন্থে পৌঁছে কবি জনতা থেকে বিশ্লিষ্ট হতে শুরু করেন। এই গ্রন্থে জনতা-ভীরু প্রতিমা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে

উপস্থিত কেননা পরবর্তীকালে কবির মধ্যে আর জনতা প্রতিমায় সাক্ষাৎ মেলে না। কবি নিজের আত্মার দিকে মগ্নাভিসারী। যেমন:

যে মিছিল বধূ হয়ে আমাকেও একদিন
কাছে ডেকেছিল তার সঙ্গে কোনো কথা হলো না
যে জনতা আমাকে কবি বানিয়েছে তারও সঙ্গে না।
আমি মাঝ পথে ফিরে এসে শব্দহীন মধ্যরাতে
আমার আত্মার সাথে, দুঃখ জ্বালা দহনের সাথে
একা একা আলাপ করেছি। আত্মায় আগুন জেলে
রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম, মুক্তির ইশতাহার পুড়িয়ে ফেলেছি।

[ কবিতা, : ২০ ]

আবার প্রিয়তমার জন্য কবি জনতাকে বিসর্জন দিতে প্রত্যাশী। জনতা ও প্রিয়তমার দ্বন্দ্ব এইভাবে বিভিন্ন বাক্‌চিত্রে ধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধের বাক্‌-প্রতিমাও এই অনুষঙ্গে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, বস্তুত প্রিয়তমা নারী-বোন-দেশ এক নিষ্ঠুর দ্রংষ্ট্রার আঘাতে শতছিন্ন। তাই, বোধকরি এই বোধ থেকেই জনতা ও প্রিয়তমার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল (কে সর্বাপেক্ষা গ্রহণ-যোগ্য?) কারণ জনতা দেশ ও মূল্যবোধ রক্ষা করতে অপারগ হচ্ছে, বার-বার জনতার পরাজয় হচ্ছে। জনতা ও প্রেমের দ্বন্দ্বের প্রতিমার উল্লেখ করা যেতে পারে:

এইসব প্রাত্যহিক ভয়ে মোটামুটি কেটে গেছে
কেটে যাচ্ছে
না-প্রেমিক না-বিপ্লবী পঁচিশ বছর
কেটে যাবে আরও কিছু দিন।

[ না প্রেমিক: ৪৯ ]

জনতা ও প্রিয়তমার সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে; তারই বাকচিত্র:

আমি এখন কোথায় যাবো? প্রেমের দিকে
তোমার মানা আন্দোলনে সত্য আগুন
একটি মানুষ
দু'দিকে যাবে?

[ ঐ: ২৩ ]

আমার এলাকাবাসীরা চায় আমি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হই,
তারা গণভোট দেবে, কেননা আমি এখন সবচে' বিশ্বাসী, প্রতি দিন
সৎ এবং শক্তিশালী হচ্ছি। কুমারী স্তনের মতো বক্ষময়
বৃদ্ধি পাচ্ছে অলৌকিক আমার ক্ষমতা, তোমার যে কোনো উপেক্ষা
এখন আমার সহ্য সীমার মধ্যে, তুমি করতলগত, করতলে গত।

[ কবিতা, : ১১ ]

উপরোক্ত দ্বিতীয় বাক্‌প্রতিমায় কবি জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন, জনগণ এখন তাঁর মুঠোবন্দী। এইজন্য প্রিয়তমার উপেক্ষা তাঁকে আর বিচলিত করে না, এই জন্য প্রিয়তমার জন্য বা প্রিয়তমাকে হারাবার ভয় নেই। চিত্রটি মননধর্মী, সম্পূর্ণ চিত্রটিতে একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে (কুমারীর স্তনের মতো বৃদ্ধি পাওয়া)। আবার করতলগত বলার মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কার আছে, এবং পীড়নেচ্ছাও প্রকাশশীল। 'নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী' চিত্রটি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষুকে তৃপ্ত করে (নির্বাচনের হৈ হৈ ও মিছিল কর্ণ ও চক্ষুর উপর ক্রিয়াশীল)। কুমারী স্তন বলার সঙ্গে-সঙ্গে কাম স্পর্শ সুখ চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়, এবং 'করতলগত' চিত্রটি স্পর্শেন্দ্রিয়-জাগরূক প্রতিমা। 'সবচে বিশ্বাসী', 'সৎ এবং শক্তিশালী হচ্ছি' 'অলৌকিক আমার ক্ষমতা', 'তোমার যে কোন উপেক্ষা', 'আমার সহ্যসীমার মধ্যে' প্রভৃতি মননশীল প্রতিমার উদাহরণ।

অবশেষে জনতা হারিয়ে যায়, নারীর হয় জয়, ভালোবাসা হয় সম্রাট। কবির জনতা কবির নিকট পরাজিত হওয়ার প্রতিমার দেখুন:

স্মরণকালের বৃহত্তম সভায় আজ আমি
সদর্পে ঘোষণা করছি হে বোকা জমায়েত
পল্টনের মাঠে আর কোনোদিন সভাই হবে না
আজকেই শেষ সভা, শেষ সমাবেশ শেষ বক্তা আমি
এখনো বিনয় করে বলছি 'সাইরেন'
বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে
আপনারা সারা মাঠ খালি করে দেবেন
এই পল্টনের সারা মাঠে আমার প্রেমিকা ছাড়া
আর যেন কাউকে দেখি না কোনদিন।
এই সারা মাঠে আমি একা, একজন আমার প্রেমিকা।

[ প্রেমাংশুর : ৪২ ]

বাক্‌প্রতিমাটি শ্রবণেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করে এবং দৃশ্যমান। কবির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। জনতাকে তিনি ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথাই শোনাচ্ছেন, একজন প্রেমিকাই কবির সমস্যা—জনগণ, জনতার দাবী নয় বরং জনতাকে তুচ্ছ করা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখের পদতলে।

অবশেষে, কবিতার কাছে সমস্ত অস্ত্র একে-একে জমা রাখছেন কবি, অর্থাৎ প্রেম নয় এখন পরম আরাধ্য বিষয় কবিতা, কিংবা কবিতা ও প্রেম এখন একাকার। এই বাক্‌প্রতিমাটি শব্দমান (আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোত্থিত শব্দ শ্রব্যমান হয়) ও দৃশ্যমান, আবার 'মাল্য দেবে দাও' বলার মধ্যে স্পর্শ সুখেরও ইঙ্গিত আছে, এবং 'আমার বিদ্রোহ' ও 'আমার কিসের ভয়' প্রতিমাদ্বয় মানসিক চিত্রের উদ্বোধন করে। নিম্নে উদ্ধৃতিটি রাখছি :

এই দেখো আগ্নেয়াস্ত্র, কোমরে কার্তুজ
অস্থি ও মজ্জার মধ্যে আমার বিদ্রোহ
উদ্ধত কপাল জুড়ে যুদ্ধের রক্তজয়টিকা
আমার কিসের ভয়?
তোমার পায়ের নীচে আমিও অমর হবো
আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

[ কবিতা : ৩১ ]

এই সঙ্গে সমকালীন আরও চারজন কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করছি যাঁদের বাক্‌চিত্রাবলীও এই সঙ্গে স্মরণযোগ্য, যে-সব বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে তুলনাও করা যাবে নির্মলেন্দু গুণকে। যেমন :

ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
নৌ, বিমান আর পদাতিক বাহিনী
কেবল তোমাকেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে ঘিরে
নিশিদিন অভিবাদন করবে, প্রিয়তমা।

[ তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তম : শহীদ কাদরী ]

জলপাই-রঙ য়্যুনিফর্মে, সবুজাভ হেলমেটে,
স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিক আমি, কর্মরত।

সৌন্দর্যের রাজধানী ঘিরে অসংখ্য বিরোধী বীর
অবস্থান নেয়, সুবিধাজনকভাবে—একচেটে।
আছে যার শিল্পরুচি—তাকে প্রয়োজন—ব্যক্তিগত
কিংবা সার্বজন্য হরিষে-বিষাদে—যে-জন সুস্থির॥
[ সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ-প্যারেড : রফিক আজাদ ]

ছিলো সেটা গৃহ-যুদ্ধ
আমার ভিতরে
রাত্রির বিরুদ্ধে চাঁদের মতো জ্বলছিলাম আমি

.... .... .... .... ....

ট্যাঙ্ক-এর বিরুদ্ধে ঠ্যালা-গাড়ির ব্যারিকেড্ রাস্তা জুড়ে
পাশবিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতা
রাত্রির বিরুদ্ধে চাঁদ
কালো কামানের বিরুদ্ধে সবুজ পল্লব

.... .... .... .... ....

ভোরের দিকে
গৃহ-যুদ্ধ মুক্তি-যুদ্ধে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়
[ ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ : আবদুল মান্নান সৈয়দ ]

যে-হাত যুগল স্তনে খোঁজে চাঁদ-শাদা
স্বপ্নের মদির পথ, খোঁজে ক্ষেত্র প্রীতি কর্ষণের
ভাবতে অবাক লাগে, সেই একই হাত
সহজেই কাগজে নির্দেশ লেখে বোমা বর্ষণের।
[ বিধ্বস্ত নীলিমা : শামসুর রাহমান ]

জনতা ও প্রিয়তমার দ্বন্দ্বে জনতা পরাজিত হয় নারীর কাছে। আবার এই নারীও বিদেশিনী। বিদেশবাসী ঐ নারীর প্রসঙ্গ নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় বার বার এসেছে বিভিন্নভাবে। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' গ্রন্থে পাই বাসন্তী নাম্নী এক নারী, যাঁকে কবি ভালোবাসতেন, তিনি আজ দেশান্তরিত। বাকপ্রতিমাটি দৃশ্যমান ও স্মৃতিচারণমূলক। যেমন :

এক সময় কী ভীষণ ছায়া দিতো এই গাছটা
অনায়াসে দুজন মানুষ মিশে থাকতে পারতো এর ছায়ায়।
আমরা ভালবাসার নামে একদিন সারারাত

এ গাছের ছায়ায় লুকিয়ে ছিলুম;
সেই বাসন্তী, আহা সেই বাসন্তী এখন বিহারে
ডাকাত স্বামীর ঘরে চার সন্তানের জননী হয়েছে।
[ প্রেমাংশুর : ১১ ]

আবার বালক বয়সের প্রণয়িনী বাসন্তী এখন বিদেশিনী, কিংবা 'চৈত্রের ভালোবাসা' গ্রন্থের প্রণয়িনীও বৈদেশী। আর শুধু এই দুই নারী নয় আরও বহু নারীর উল্লেখ আছে তাঁর কবিতায়, এবং তাঁদেরও দু'একজন বিদেশবাসিনী। হয়ত এই জন্যই তাঁর রমণী নর্ম সহচরী, প্লেটোনিক প্রেমের আদর্শে কবির অনাস্থা হয়ত এইজন্যই। যেমন :

একাকী রমণে কতো করেছি নিহত
টোপে-গাঁথা মৎসের মতো
রাত্রিদিন অন্ধকারে শুধু রমণীকে।
[ ঐ : ২৬ ]

আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা বলে ভ্রম করি
[ কবিতা : ৯ ]

সম্পূর্ণ উলঙ্গ আমি
হই না কখনও'—বলে তুমি যতোই চীৎকার করো
আমি জানি কখন সময় হবে, অভিজ্ঞা নারীর মতো
তুমি এসে নিজ হাতে খুলে দেবে সায়া, খুলে দেবে রুদ্ধদ্বার
হে নগ্ন যৌন বেহায়া নারী
আমাকে নতুন তুমি কি দেখাবে বলো ?
[ ঐ : ৪৫ ]

বাক্‌চিত্রগুলি এখানে স্পর্শেন্দ্রিয়কেই বেশি জাগ্রত করে (দৃশ্যমানও)। 'টোপে-গাঁথা মৎসের মতো' 'অন্ধকারে শুধু রমণীকে' চিত্রময় ও স্পর্শেন্দ্রিয় জাগরুক চিত্র দুটি শিহরণ সৃষ্টিকারী। 'চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা' বলার সঙ্গে-সঙ্গে যুগপৎ ঔদরিক ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির দুইটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয়—দৃশ্যমান ও স্পর্শমান প্রতিমার স্বাক্ষর পাই। আবার প্রথম উদ্ধৃতির মৃত্যু চিত্র যেমন শিহরণ সৃষ্টিকারী, দ্বিতীয় উদ্ধৃতির কামেন্দ্রিয় তৃপ্তিকারী প্রতিমাটিও শিহরণধর্মী। তৃতীয় উদাহরণটিও দৃশ্যমান এবং স্পর্শ সুখকর প্রতিমার উদ্বোধক।

অথবা, কোনো একক নারী নয়, বরং যে-কোন নারীর বাক্‌চিত্রই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন:

সারাদিন খেলা করে সারারাত ঘুম যেতে চায়
যে কোনো নারীর তৃষ্ণা বুকের লজ্জায়।

[না প্রেমিক: ১৪]

অন্যদিকে, চিরন্তন নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা ও যন্ত্রণা ধ্বনিত হয়েছে এইসব বাক্‌প্রতিমায়। চিরন্তন প্রেম নেই এই পৃথিবীতে:

পিতা মাতা ভাই বোন প্রিয় পরিজন সময়ের অর্থহীন
শব্দে ভেসে গেছে—পদ্ম স্পর্শে যে কাগজ প্রতিদিন
পদ্য হয়ে ওঠে তার সঙ্গেও কথা বলা হলো না
যে নারী নিবৃত্ত করে যৌবনের প্রজ্জ্বলন্ত ক্ষুধা তারও সঙ্গে না।

[কবিতা,: ২০]

ক্ষীণকটি
আলো দেয় কৃষ্ণকররেখার আঁধারে
তবু রোজ মন এসে বলে ভালোবাসা বলে কিছু নাই।

[না প্রেমিক: ২৫]

তুমি যেখানেই হাত রাখো
আমার উদগ্রীব চিত্র থাকে সেখানেই
আমি যেখানেই হাত পাতি সেখানেই অসীম শূন্যতা
তুমি নেই।

[ঐ: ৪০]

কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে থেকে নদীর ভাঙন হয়ে
ঢুকে যায় যমুনার মতো তীব্র চুমুর ভিতরে—তারপর
একটি কবিতা লেখা হলে সেই নারী দ্রুত ফিরে যায়

[কবিতা,: ৩৯]

কিন্তু স্বীকারোক্তি আছে নিষিদ্ধ নারীকে গ্রহণ করেননি তিনি। এই বাক্‌প্রতিমাটি মননজাত ও স্পর্শেন্দ্রিয় উদ্বোধক:

প্রেম এসে নিজ হাতে শিখাবে মন্থন, এ আশায়
আমি নিষিদ্ধ নারীর স্বাদ গ্রহণ করিনি

[ঐ: ৪০]

প্রেম তাঁকে স্পর্শ করবে না এমন চমক সৃষ্টিকারী বাক্‌প্রতিমার সাক্ষাৎ মেলে। বাক্‌চিত্রটি মননশীল, দৃশ্যমান ও স্পর্শেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। যেমন :

আমার কন্ঠের হাড়ে অহংকারী যুবতীর খোঁপার শেফালি
মৃত্যুমাখা নীলপাট আমাকে ছোঁবে না।

[ ঐ : ৫৩ ]

যেহেতু চিরন্তন প্রেম নেই, তাই নারী মাত্রেই ভোগ্যা, বীরভোগ্যা, এবং বারাঙ্গনা। তেমন বাক্‌প্রতিমা :

আমার করুণা নেই দয়া ধর্ম নেই, আমার যৌবন যাকে চায়
আমি তাকে এভাবেই তুলে আনি বধ্যভূমিতে।
সে যদি পূজার যোগ্যা রাজরাণী হয়, আমি তাকে
দেবতা বলি না, রাজবেশ্যা বলি। বলি যৌবনের স্বপ্ন ভোগ্যা
নারী। আম্রপালির মতো সেই নারী তৃপ্ত করে আমার বাসনা।

[ দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী : ৫৪ ]

উপরোক্ত বাক্‌প্রতিমার 'বধ্যভূমি', 'রাজরাণী', 'দেবতা', 'রাজবেশ্যা', 'আম্রপালি' প্রভৃতি চিত্রে নির্মলেন্দু গুণের প্রাচীনচারিতা-প্রিয়তা লক্ষণীয়। তাঁর মধ্যে এমন প্রাচীনচারী প্রতিমার নিদর্শন স্বল্পই দেখা যায়।

তাঁর মধ্যে কখনও-কখনও দুই নারী, কখনও বহুনারীর বাক্‌প্রতিমা উপস্থিত হয়েছে 'দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী' গ্রন্থে। আবার, এই গ্রন্থে জানতে পারি প্রেম না-থাকার কারণ বাল্যপ্রেমের কিছু অভিসম্পাত। বাল্যপ্রেমের অভিশাপের এই উদ্ধৃতিতে জানতে পারি সেই নারী মৃতা :

যে মুখে জীবনের প্রথম চুম্বন রেখেছিলাম সেই মুখে
আমি মুখাগ্নি করলুম নিজের হাতে—সেই আমার সর্বপ্রথম
নিজের ঘরে আগুন জ্বালানো।

[ দীর্ঘ দিবস : ৪৭ ]

এই বাক্‌প্রতিমাটি দৃশ্যময়, গন্ধবাহী এবং স্পর্শেন্দ্রিয়কে জাগরিত করে। সমগ্র চিত্রটি দৃশ্যমান, কিন্তু শবদেহের গন্ধ ও আগুনের দাহ্য শক্তি ও উত্তাপ ঘ্রাণানুভূতি ও ত্বগেন্দ্রিয়ে যাতনা সৃষ্টিকারী।

কিন্তু ভালোবাসার দ্বিধাদীর্ণ ও যন্ত্রণার বাক্‌প্রতিমার সাক্ষাৎ পাই তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে, বিশেষত শেষতম 'চৈত্রের ভালোবাসা' গ্রন্থে। প্রেম নেই ভালোবাসা নেই—এই অবিশ্বাসে জীবনধারণ অসম্ভব। রক্ত-মাংস-দেহে

কাম ছাড়াও অন্য এক বোধ ক্রিয়াশীল, অন্য একপ্রকার বোধের নাম ভলোবাসা (আরও মহত্তর অর্থে যার নাম প্রেম)। ভালোবাসাহীন পৃথিবী, ভালোবাসাহীন নারী-দেহ পঙ্ককুণ্ড মাত্র। এই জন্যই নারী বাক্‌প্রতিমায় (এই পর্যন্ত উল্লেখিত) দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-বিষাদ উপস্থিত দেখেছি। জনতা প্রতিমার ঘূর্ণনে দেখাতে চেয়েছি ওই দ্বিধার স্বরূপ কি। কেননা, সেখানে জনতা ও প্রিয়তমা কখনও অঙ্গে-অঙ্গে একাকার, কখনও জনতার অধিক প্রিয়তমা শ্রেয়, কখনও প্রিয়তমার চেয়ে জনতাই কাম্য, কখনও আবার দেশ-ই প্রিয়তমা, একবার শুনেছি 'রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম, মুক্তির ইশতাহার পুড়িয়ে ফেলেছি' বাক্‌চিত্রটি। এই দ্বিধাদীর্ণ বাক্‌প্রতিমাবলীতে নির্মলেন্দু গুণের চারটি কাব্যগ্রন্থ হাহাকারময়; কিন্তু 'চৈত্রের ভালোবাসা'য় এই দ্বিধা অবসিত, এক বিদেশিনীর ভালোবাসায় ('তুমিই আমার বিভুঁই বিষ্ণুপ্রিয়া', 'তোমাকে আমি চিনেছি ওফেলিয়া' ইত্যাদি বাক্‌গুচ্ছে এই বক্তব্যের সত্যতা মিলবে) কবি-জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান। এই ভালোবাসা চৈত্রের, বর্ষশেষের এবং গ্রীষ্মারম্ভের (বর্ষ সূচনারও), এই ভালোবাসা কৃষ্ণচূড়ার রক্ত ক্ষরণের, আবার কৃষ্ণচূড়াগুলি নিবেদনের, এই ভালোবাসা অনেক নারীর স্মৃতি-বর্জন করে একক নারীর একাগ্রতার দিকে (কিন্তু আধুনিক নারীর সেই একাগ্রচিত্ততা আছে কি? যেহেতু কবির নিজেরও প্রথম প্রেম নয়। কিন্তু কবি ঘোষণা করেছেন: তোমার কানের কাছে কুন্তলে মুখ ঢেকে আমি/মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলুম আমার আজন্ম লালিত/স্বপ্ন—'ভালোবাসি'), পরবাসী নারীর বর্ণাঢ্য-বিস্তারী এই ভালোবাসা—কবি নিজেও বলতে পারেন না এই ভালোবাসা তাঁকে কোন অকূলে পৌঁছে দেবে। আর 'চৈত্রের ভালোবাসা' বাক্‌প্রতিমাটি বিবিধার্থ জ্ঞাপক। কাল হিসাবে এই মাসটি বর্ষ শেষের—অর্থাৎ জীবনের শেষ ভালোবাসা। আবার ঋতু পরিক্রমায় এই মাসটি যৌবনের এবং ভালোবাসার বর্ণবহুলতা ও তীব্রতার প্রতীক (কিন্তু, লক্ষণীয়, কবি ফাল্গুন মাসের উল্লেখ করেননি। কবি যদি ছন্দের সুবিধা ভোগের জন্য 'চৈত্রের' শব্দটি নির্বাচিত করেন তবুও প্রশ্নটি থাকে। কেননা, গ্রন্থের মধ্যেও কখনও তিনি 'ফাল্গুন' বা 'ফাল্গুনী' শব্দের ব্যবহার করেননি, বরং 'এপ্রিল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হয়ত অতি ব্যবহারের জন্য 'ফাল্গুন' শব্দটির ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবি চৈত্র শব্দটি নির্বাচন করেছেন, অথবা কেন জানি না।)। আবার, চৈত্র যেহেতু বর্ষশেষের মাস সেই হেতু বর্ষশেষের আবর্জনা ও জঞ্জাল

মুক্তির জন্য নববর্ষকে স্মরণ পথে টানে। চৈত্র যেমন বসন্তের ঋতু তেমনই কাল-বোশেখীর ধ্বংস-নৃত্যের ইঙ্গিতধর্মী, আবার ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনিত নবপত্রের সঙ্গে বিষাদে-বিহ্বলতায় সিক্ত করে। পুনরায় যৌবনের সঙ্গে যৌবন উৎক্রান্তির বেদনাও এই সঙ্গে সম্পৃক্ত। সকলেই উপলব্ধি করেন যৌবন উদ্দামতার ও বিষাদ-বেদনার দ্বৈত ঋতু—অর্থাৎ 'চৈত্রের ভালোবাসা' বাক্‌প্রতিমাটি বহুমাত্রিক অর্থ-বিস্তারী।

এইবার, চিরন্তন নারীর দিকে, ভালোবাসার প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ধৃতি সহযোগে বর্ণনা করা যাক:

আমি একা রমণীকে ভালোবেসে, বেসে
নিজেরি মুদ্রাদোষে নিঃসঙ্গ কৃষ্ণের মতো রাত্রিদিন আলাদা হলেও
ছিলাম নদীর মতোই সমর্পিত সাগর মিছিলে

[ প্রেমাংশুর : ২৫ ]

বলো তুমি প্রেম হবে কোন্‌খানে ছুঁলে!

[ কবিতা, : ৪৩ ]

আজন্ম অন্ধের মতো তোমার আশ্রয় চাই, প্রিয়তমা
বিষাদে বিষাক্ত দেহ তুলে নেবে তুমি
জেলেরা যেমন করে ত্রস্ত হাতে জাল থেকে মৎস্য তুলে নেয়
অথবা বেদেনী যেমন সব খেলা শেষ হলে বাক্সে ভরে
দন্তহীন ক্রীড়াক্লান্ত বিষাক্ত গোক্ষুর।

[ না প্রেমিক, : ১৭-১৮ ]

উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে সম্মোহিত হয়ে
আমি খুঁজেছি সেই
অবলুপ্ত অজন্তার প্রেম, আর অপস্রিয়মান বঙ্গদেশীয়
নারীর মোহিনী।

[ ঐ : ৬০ ]

শিহরণে কেঁপেছে হৃদয়
বারবার, তবু স্পর্শহীন এমন অক্ষয় দোলা, এমন অমৃত সঞ্চয়
ছিল তোমার ঐ পায়ের রেখায়, ভাবিনি কখনও।

[ দীর্ঘ দিবস : ৫৫ ]

আমি নখাগ্রে দেখাবো প্রেম, ভালোবাসা
বক্ষ চিরে তোমার প্রতিমা।

[ঐ : ১৬]

প্রথম বাক্‌চিত্রটিতে কবি রমণীর ভালোবাসায় একাগ্র এক পুরুষ, এই প্রেমিক পুরুষ নিঃসঙ্গ বৃক্ষের স্থিরচিত্রে একক, এবং বহমান নদীর গতিমানতায় সাগরাভিসারী। বাক্‌চিত্রটি চিত্রসমৃদ্ধ গতিমান এবং একাগ্রতায় মনন-শীলতাযুক্ত। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বিষাদময়তা যুক্ত হয়েছে এমন একটি ঋজু ও উদ্দাম বাক্‌চিত্র। উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে 'পাথরের সাপ' কবিতা থেকে, এবং সম্পূর্ণ কবিতার প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে নারী একদিন কামসহচরী ছিল......একদিন নারীকে এবং নারীর সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতিকে স্পর্শ করেও কবির ভালোবাসা মেলেনি। আজ সেই কবি প্রেমের ভিখারী, প্রেমের আকাঙক্ষায় তিনি দুস্তর পথের অভিসারী, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে লক্ষ্যশীল—অর্থাৎ এই 'কোনখানে ছুঁলে' বাক্‌-চিত্রটির অর্থ সত্ত্বাকে স্পর্শ করার ইঙ্গিতধর্মী বলে আমার ধারণা। বাক্‌-প্রতিমাটি স্পর্শেন্দ্রিয়কে ইঙ্গিত করলেও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত চিরন্তন সত্তার (স্পর্শাতীতের) স্পর্শে অস্থিরধর্মী। বাক্‌চিত্র হিসাবে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিমাকেই অনুভব করলাম আমরা। তৃতীয় উদ্ধৃতিতেও বিষাদের মননশীলতা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী মৎসের উপমাটি হয়ে উঠেছে গতিশীল, জিহ্বান্দ্রিয় তৃপ্তিকারী, আবার জাল জল ইত্যাদির শব্দমান দৃশ্যচিত্রও জেগে ওঠে চোখে (মৎস যৌনতা ও উর্বর-শক্তির প্রতীক)। অবশেষে বেদেনীর সর্পের উপমার চিত্রটি কামবাসনার বাক্সবন্দীত্বের এবং ভীতিকর চিত্রের অবতারণা করেছে যুগপৎ। সর্পের গতিশীল রূপটি বেদেনীর বাক্সবন্দীত্বের সঙ্গে স্থিরচিত্রের অবতারণা করেছে, অর্থাৎ গতিশীলতায় ও স্থিরধর্মীতায় চিত্রটি আলাদা একটি দ্যোতনায় মূল্যময় হয়েছে। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে প্রাচীন-চারীতা, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ আমাদের রোমান্টিক বিহ্বলতায় উদ্বেল করে তোলে। যদিও উষ্ণ আলিঙ্গন কামবাসনা উদ্রেককারী স্মৃতি তবুও পরক্ষণেই অজন্তার প্রেম ও অপস্মৃত প্রাচীন (ও চিরায়মান) বঙ্গদেশীয় রমনীর উল্লেখে প্রতিমাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এখানে ত্বগেন্দ্রিয়ের স্পর্শ সুখের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি কবি-প্রেম কামগন্ধহীন নয়। এই মর্ত-প্রীতি ও বাস্তবধর্মীতা 'চৈত্রের ভালোবাসা'র সম্পদ। পঞ্চম বাক্‌চিত্রটি অতীতের স্পর্শ সুখের স্মৃতি-বিষয়ক, কিন্তু পদচিহ্নের গতিমান ও স্থির-

চিত্রের নিবিড়তা যুগপৎ বিহ্বলতা সৃষ্টি করে। আবার, 'অমৃত সঞ্চয়' ও 'ভাবিনি কখনও' চিত্রগুলি মননধর্মীতার গুণারোপিত। ষষ্ঠ উদ্ধৃতিতে কবি ভালোবাসার সঙ্গে একাত্ম বলেই ভালোবাসার বক্ষ বিদীর্ণ করে প্রিয়তমার ছবি উৎপাটনের কথা ঘোষণা করতে পারেন। 'নখাগ্রে দেখাবো প্রেম' বলার মধ্যে একরকম চমকসৃষ্টির প্রয়াস আছে কিন্তু চিত্রটি মনন সমৃদ্ধ, চিত্রটিতে চক্ষু-তৃপ্তিকরতা আছে। আবার বক্ষ দীর্ণ করার মধ্যে একরকম শব্দমান প্রতিমারও উল্লেখ আছে, এবং সেই সূত্রে বক্ষের অন্তঃপুরের হৃদপিণ্ড-ফুসফুসের রক্তাপ্লুত চিত্রগুলি শিহরণধর্মীতা সৃষ্টিকারী—বক্ষ বিদারণের অসম্ভাব্যতায়ও চিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়-দ্রবী। বস্তুত এইভাবে খণ্ড-খণ্ড চিত্র সহযোগে একটি পরিপূর্ণ বাক্‌প্রতিমার সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত বাক্‌প্রতিমাবলীতে নির্মলেন্দু গুণের মানসিক ভাব প্রকাশমান, এবং 'চৈত্রের ভালোবাসা' গ্রন্থ প্রেমের তলস্পর্শী বাক্‌বৈভব সৃষ্টিতে অভিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে।

এই প্রেম সর্বগ্রাসী, কিন্তু প্রেমের এই নিঃসঙ্গ খেলায় ব্যর্থতা এলে (বৈষ্ণব কবির 'এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে' স্মর্তব্য) কবি হবে পীড়নচারী। এই পীড়নেচ্ছু বাক্‌প্রতিমাটি লক্ষণযোগ্য হতে পারে (জিহ্বা ও ত্বগেন্দ্রিয় তৃপ্তিকারী বাক্‌প্রতিমা):

> যদি ব্যর্থ হই এরকম নিঃসঙ্গ খেলায়
> কুরে খাবো চর্ব্যচোষ্য লাবণ্য তোমার,
> আলিঙ্গনে ভরে দেবো অজস্র বাহুর পিপীলিকা।
>
> [ চৈত্রের ভালোবাসা : ৯ ]

এমনকি আজন্ম লালিত 'ভালোবাসা' যখন উচ্চারিত হয় এমন দুর্লভ মুহূর্তেও পূর্ব-পূর্ব দেহসুখস্পর্শজনিত স্মৃতি হানা দেয়। এই স্পর্শেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, শ্রবণ সুভগ, গতিমান চিত্রধর্মী বাক্‌প্রতিমাটি দেখুন:

> তোমার কানের কাছে কুন্তলে মুখ ঢেকে আমি
> মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলুম আমার আজন্ম লালিত
> স্বপ্ন—'ভালবাসি.'
> তুমি কেঁপে উঠলে যেন সঙ্গমের প্রথম শিহরণ
> কুমারীর। স্পর্শ ও আবেগের উত্তাপে বৃষ্টি হয়ে
> ঝরে গেল চৈত্রের ছিন্ন মেঘমালা,
>
> [ ঐ : ৬৫ ]

কিন্তু দেহধর্মের প্রাধান্য নিয়েও নিম্নোক্ত বাক্‌প্রতিমাগুলি দেহাতীত প্রেমের জয় ঘোষক :

তুমি ঐ চামচে লেপ্টে থাকা চিনিতে চুমু খেয়েছিলে,
শাদা নিকেলে তোমার সেই লাল জিভের দাগ এতো স্পষ্ট—
তুমি কি বিড়াল?

.... .... .... .... ....

সম্ভব হলে এই ফাঁকে আমি চামচটিকে চিরকালের জন্যে পকেটে পুরে নেবো। যদি আমরা কোনোদিন ভালোবাসায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠি এই চামচটা আমাদের প্রথম ক্লান্তির সাক্ষী হয়ে থাকবে।

[ ঐ : ৬৪ ]

সেই থেকে তোমার পায়ের লাল গোড়ালিতে এসে ঠেকে আছি,
প্রাণপণ চেষ্টা করেও তোমাকে কি একবারও ভুলতে পেরেছি?'

[ ঐ : ৫০ ]

যদি মনে করো প্রয়োজনহীন ফেলিয়াও দিতে
পারো—এই পরবাসে কি করে জানিব কোন্‌খানে
তুমি রাখো? কোন্‌খানে আমি কতটুকু বেঁচে আছি?
একবার শুধু ছিঁড়িবার আগে চুম্বন করো চুয়া।

[ ঐ : ৫৭ ]

আমার হাতের কালো তিলটিকে নিয়ে অনর্থক
ব্যস্ত হয়ে উঠলে যেন ঐ তিলটি ভীষণ একা
তোমার হাতের ছোঁয়া না পেলেই শূন্যে উড়ে যাবে।

[ ঐ : ৬৫ ]

আমার দু'খানা চোখ তোমার কটিতে এসে
অবাক শিশুর মতো মাথা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল
যে রকম মা'র কোলে একবার সুদূর শৈশবে সিনেমায়।
তুমি তো জননী নও, জাগালে না কেন?

[ ঐ : ৬৬ ]

লক্ষণীয় তাঁর শ্রেষ্ঠ বাকপ্রতিমাগুলি স্পর্শেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। স্পর্শে যেমন মাদকতা আছে, সেই স্পর্শে যখন অধিক আছে ভালোবাসা, আবার স্পর্শ-

জনিত স্মৃতিরাও বিষণ্ণতা বিস্তার করে বিচ্ছেদের দিকে ক্রম ধাবমান—বাক্‌প্রতিমাগুলি তাই ত্বগেন্দ্রিয়কে বিহ্বলতা দান করেও হৃদপিণ্ডের রক্তই বেশী ক্ষরণ করে।

পরিশেষে আমি এমন কিছু বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণ করে উদ্ধৃত করছি যাদের মধ্যে নারী নয় ( একক কোন নারীও নয়, ঐ ওকাম্পোর মতো নীল-চোখ নারী নয়। ঐ প্রবাসী বিড়াল নয় ) বরং কবি ভালোবেসেছেন চৈত্র মাস ( অথবা এপ্রিল মাস ), অর্থাৎ সময়কে। এই সকল বাক্‌প্রতিমা পড়তে-পড়তে আমার কেবলই মনে হয়েছে কবি এক বিদেশিনীকে (বাঙালী, কিন্তু বাংলাদেশে তুলনামূলক রূপে কিছুটা বিদেশিনীকে নয় ) ঐ পরবাসী নারীর মধ্যে কবি আপন যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে হাতে তুলে ভালোবেসেছেন, অর্থাৎ প্রেমের লুটতরাজ খেলা দেখেছেন চৈত্রের প্রান্তিক সময়কে করতলগত করে। এই ভালোবাসার নিঃসঙ্গ খেলায় কবি নিজের মধ্যে আর একজন মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন, দ্বন্দ্ব-দীর্ণ হয়েছেন [ যেমন : পরিপূর্ণ একা নই, পূর্ণ একা মানুষের মতো/ভালোবেসে কমে গেছি একা থেকে অধিক একায়/তবে কি আমিই সেই সদ্যোজাত একাকী আদম ?/। এই একাকীত্ব ও দ্বিধার স্বরূপ দেখুন : আমি রয়ে যাবো ভালোবেসে একা থেকে একার গভীরে,/তুমি-হীন অর্ধ-একা জুড়ে।/। (লক্ষণীয় 'অর্ধ-একা' কথাটি। একাকীত্বকেও আবার খণ্ড-খণ্ড করা হচ্ছে। ) এইসব প্রশ্নের উত্তর গবেষকরা দেবেন ]। সময়কে ভালোবেসে কবি যে-সকল বাক্‌প্রতিমা রচনা করেছেন তেমন কয়েকটির উল্লেখ করছি মাত্র :

> তুলতুলে পদতলে এগিয়েছে অনাগত প্রেম,
> যেনবা অনন্তকাল ভালবেসে ক্ষণিকের দিকে
> বাড়িয়ে দিয়েছে তার সময়ের পাখা, প্রপেলার।
>
> [ চৈত্রের : ১০ ]

> আমার পাশের সীট আমি চৈত্রের উড়ন্ত ধুলোকে বসতে দিয়েছি, গান হবে পথে পথে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে কখনও আকাশ, কখনও তোমার এলোচুল-আমি জানলায় পাখি দেখবো।
>
> [ ঐ : ২০ ]

> এতো সুন্দর, এতো ভালোলাগা, এতো ধুলোবালি,
> এতো তীব্র চোখ-ভয় হয়, এপ্রিলের উদাসী হাওয়ায়

যদি প্রেমে পড়ে যাই সেই দুপুরের দুপুরের সাথে
সেই পাখির আঁখির বাসনায় যদি প্রিয়তর হয়ে ওঠো তুমি ?
এইভাবে দেখতে-দেখতে যদি আমার ভিতরে এক তুমি-হীন
বিশ্ব গড়ে ওঠে, তুমি কষ্ট পাবে নাতো ?

( ঐ : ২৬ )

করতল কেটেছি চুম্বনে, কখন কেটেছি মনে নেই
ক্ষতের যন্ত্রণা থেকে যতটুকু ঝরেছে সময়
তারও চেয়ে অধিক গতিতে মনে হয়
আমরা গিয়েছি মিশে
জীবনের অন্য এক স্বাদের ভিতরে
ভালবেসে, নিরিবিলি, মুখোমুখি একা।

( ঐ : ৩২)

# একাদশ অধ্যায়

মহাদেব সাহার কবিতা সাম্প্রতিক কাব্যধারায় একটি নমনীয় স্রোত। তাঁর কবিতা কখনও উচ্চনিনাদে উচ্চকিত নয়, এক মগ্নস্রোতে তিনি অবগাহন করেন—পাঠককে কখনও-কখনও প্রায় জানতেই দেন না তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে, আর কখনও যদি উচ্চ সুর ধ্বনিতও হয় তা মূল সুরকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কবিতার লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁর সহজ সাধারণ প্রচলিত রীতির বাক্‌প্রতিমা ধীরে-ধীরে পৌঁছে 'চিন্তান্বিত আবেগ, আবেগান্বিত চিন্তা, ইনটেলেক্ট ও ইমোশন'-এ। শেষোক্ত বাক্‌প্রতিমার সাক্ষাৎ খুব বেশী না হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এইভাবে তাঁর বাক্‌প্রতিমান্বেষণে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যদিও জানি শিল্পীর গূঢ় অন্তরলোক-রহস্য পূর্ণরূপে ধরা যায় না, তবে শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে তার চূর্ণ-চূর্ণ কিছু বিচ্ছুরণ সর্বদা ছড়িয়ে থাকে।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' বাক্‌প্রতিমাটি এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণযোগ্য। গৃহে আছে সাংসারিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র, বন্ধন, মায়া, আকর্ষণ ও আবেগ; সন্ন্যাসে আছে সংসারাতীত ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞা, অধ্যাত্ম-জ্ঞান, পরাবিদ্যা, মহাবিদ্যা ও অনুভব। গৃহে মানুষ দেহের ও মনের কাছাকাছি, সন্ন্যাসে আত্মার কাছাকাছি। গৃহ যেমন মানুষ চায়, সন্ন্যাসও আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে—যদি সাহিত্যের অর্থ হয় একটি হৃদয়ের কাছে অন্যটির সঞ্চার। মহাদেব সাহা গৃহ এবং সন্ন্যাসের মধ্যে বিচরণ করে অবশেষে মানুষ হয়ে ফিরে এসেছেন 'মানব এসেছি কাছে' গ্রন্থে। যে ত্যাগী সন্ন্যাসী মহাযাত্রা করেন তার প্রত্যাবর্তন হয়ত হয় না; কিন্তু মানুষ, কিংবা বলা যায় কবি সন্ন্যাস-যাত্রার পর পুনরায় ফিরে আসেন, এবং পরিশেষে মানুষের জন্য কিছু সম্পদও আহরণ করে আনেন—তিনি পরিপূর্ণ মানব হয়েই ফিরে আসেন।

নিম্নোক্ত বাক্‌প্রতিমায় পাওয়া যায় সহজ-সাধারণ চিত্র, সরল স্বাভাবিকতা।

> ১. যখন শহরে বাধে গোলযোগ, ধর্মঘট হরতাল চলে
> যানবাহন বন্ধ থাকে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়

ঝাঁপফেলা দোকানপাট দেখে মনে হয় সমস্ত শহর যেনো
মৃত রবিবার
[ তার বুকে আছে : এই গৃহ এই সন্ন্যাস ]

২. আমাকে নেয় না বাস আবার দৌড়ই
সামনে ষ্টপেজ ডবল ডেকার থামে
লোকজন ওঠানামা করে, ছেড়ে যায় বাস
[ কোনো বাস নেয় না আমাকে : ঐ ]

৩. সেই দিকে কাহার বসতি আছে, চাষবাস আছে
ঐ সব কাহাদের রাঙা খেতখামার ?
[ সেই দিকে যায় : মানব এসেছি কাছে ]

৪. আমাকে তুই মাটি দে মাটি দে
মাটির মমতা দে, মন্ত্র দে
তুলে দে তুলে দে !
[ মাটি দে, মমতা দে : ঐ ]

প্রথম বাক্‌প্রতিমাটি রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের, বিপৎপাত হচ্ছে চতুর্দিকে। শহরে-শহরে হরতাল, গোলযোগ, শব্দ করে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে—এই সম্পূর্ণ চিত্রটি দৃশ্যমান, শ্রব্যমান এবং গতিশীল। প্রতিমাবিধৃত দ্বিতীয় চিত্রটিতে দেখি ব্যক্তিগত বিপৎপাত, শহরের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তা সংক্রামিত হয়েছে ব্যক্তিজীবনে, তাই কবি একা ও নিঃসঙ্গ; এইজন্য পাবলিক বাসটিও ঐ নিঃসঙ্গ মানুষকে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে (আর-আর সকলকে তুলে নিয়ে) উধাও হচ্ছে—এখানে শব্দচিত্রটি গতিশীল ও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বাক্‌প্রতিমায় দেখি আশার আলোর বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ, মাঠের প্রান্তদেশে দৃশ্যমান হয় চাষীর লোকালয় ও রঙিন গন্ধবহ ক্ষেতখামার —চিত্রটি চক্ষেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। আর চতুর্থ বাক্‌প্রতিমায় কবি আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল, মুখর। এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে কবি বলেন মানুষের জন্য মাটিই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, খাদ্য ও বসবাসের ভরসা এই মাটি, মাটিতে বীজ ছড়ালে সোনালি ফসল ফলবে, মাটির ঘ্রাণ ঘাসের গন্ধ অনুভবযোগ্য হয়—এই বাক্‌চিত্রটিকে প্রার্থনা বাক্‌প্রতিমার উদাহরণ বলা যায়। উপরোক্ত চিত্রাবলী সহজ সরল। কখনও দৃশ্যমান, কখনও গতিমান, একবার

গন্ধবহ, পুনরায় আবেদনের ভাষায় দীপ্র। এই প্রতিমাগুচ্ছে আছে মানুষের কাছে ফিরে আসার প্রত্যয়, পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা আছে, আছে ভুল ভাঙার বেদনা এবং সেই বেদনা থেকে উদ্ধারের পথ-পরিক্রমা এবং আয়োজন। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে 'রাঙা' শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিমাটি এক বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়।

পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এবার ভিন্ন পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমার দিকে যাত্রা করি। যেমন প্রথম কাব্যগ্রন্থের 'তার বুকে আছে' কবিতায় পৌঁছে দেখি মননময় বাক্‌প্রতিমা যা আমাদের দৃষ্টিকে তুলে ধরে, বুঝতে পারি চিন্তাসমৃদ্ধ প্রতিমা ধীরে-ধীরে আমাদের আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী। এই কবিতার কারুকৃতিতে আছে সাধারণ চিত্রাবলীর সঙ্গে মনন ও মেজাজের মিশ্রণ। যেমন, 'তার বুকে আছে দেরী করে ঘরে ফিরে ডাক দিলে যে দেয়/দুয়ার খুলে/সেই ভালোবাসা', কিংবা 'বনের চোখের নীচে যারা পাখির পালক খোঁজে' ইত্যাদি প্রতিমা উক্ত কবিতাকে একটি সুন্দর বাক্‌চিত্রকল্পে উচ্চালিত করে। সামগ্রিক প্রতিমা দীপ্তিতে এই কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

অন্য এক ধরনের কয়েকটি প্রতিমা আহরণ করছি:

১. অথচ একেকদিন আকাশটা লেপ্টে থাকে মেঘে,
মেঘে মেঘে বেলা বেজে যায়
সারাদিন দেখা যায় না রোদের মুখ
বেলা দুটোতেও মনে হয়
এক্ষুণি বুঝি রেডিওতে সকালের খবর শেষ হলো
ঘরবাড়ি গাছপালা থমথমে
যেনো এক দজ্জাল মেয়ের সংসার,
[ না-রোদ না-বৃষ্টি : এই গৃহ এই সন্ন্যাস ]

২. নেই নীল অগ্নি বুকে নিয়ে মানুষের জন্য জেগে থাকা গ্রাম
পাহাড় অরণ্য শুধু পাহাড়প্রতিম, শুধু হুহু কান্না
একা, উদাসীন একা,
এখানে মমতা কই! দুঃখভোলা নই!
[ ভ্রমণে ভ্রমণে : মানব এসেছি কাছে ]

প্রথম পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমা থেকে এই প্রতিমাগুলি ভিন্নতর স্বাদ পরিবেশন করে। এই পর্বের প্রতিমাগুলি আবেগময়, গতিমান এবং একটি মানবিক

বেদনাবোধ এই প্রতিমায় লেপে আছে; এখানে সাক্ষাৎ পাই অন্যরকম বিদ্যুৎচকিত আলোর উদ্ভাস। প্রথম দৃষ্টান্তের মধ্যে—আকাশে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মেঘ জমেছে, মেঘে-মেঘে বেলা বেজে যায়, প্রার্থিত রোদের মুখ নেই, সময় অসময় নেই, ঘর-বাড়ি গাছপালা থমথমে, পরিশেষে কবি সমগ্র চিত্রটিকে ছেঁকে এনে তুলনা করলেন এক দজ্জাল মেয়ের থমথমে সংসারের সঙ্গে (ঝগড়া শেষে বা ঝগড়ার পূর্বে দজ্জাল গৃহিনীর মুখভাব বা পরিবেশ যেমন থমথমে থাকে, মেঘ-ভার-নত আকাশও তেমন)। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি বরং অধিক ব্যঞ্জনাময়। যে মানুষ নিরন্তর একা নিঃসঙ্গ অর্থাৎ যে-শিল্পী নিজেই নিরবধি বিচ্ছিন্ন মানুষ সেই শিল্পী-মানুষ তবুও মানুষের কল্যাণ কামনার বেদনাবোধে মজ্জিত। কেন মানবের মধ্যে নেই মানুষের নীল বেদনা (স্মরণীয়, নীলকন্ঠ শিব সৃষ্টিকে রক্ষা করতে কন্ঠে হলাহল ধারণ করেছিলেন), পাহাড় অরণ্য মানব-কল্যাণে যেন আর স্থির নয় (অর্থাৎ পাহাড় যেন জড় পাহাড় শুধু), যেন ঐ পাহাড় শিল্পীকে নিরন্তর শোক-পাথারে মগ্ন করে শুধু, যেন সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে এক অপর্থিব কান্না ('এখানে মমতা কই!')—বলা যেতে পারে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই বাক্‌প্রতিমা কবির মানসভঙ্গিকে প্রকাশ করেছে মননশীলতায়, মানুষের কাছাকাছি পেঁৗছার বেদনা এখানে প্রকাশশীল। লক্ষণীয় মহাদেব সাহার প্রিয় শব্দ সূর্য ও রৌদ্র এখানে উপস্থিত হয়েছে।

অন্য এক পর্যায়ের এক রকম বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি, পূর্ববর্ণিত দুই ধারার প্রতিমায় যে অভিজ্ঞতা এই পর্যায়ে এসে পুনরায় ভিন্ন স্বাদ লক্ষ্য করা যাবে। যেমন:

১. বুড়ো দর্জি
আমাকে বানিয়ে দাও উষ্ণ
জ্যাকেট, যেখানে আমার সমস্ত শোক
এই শীতে ভেজা ম্লান বিষন্নতা অনায়াসে
ঢেকে রাখতে পারি,
[ আমার দর্জিকে বলি : এই গৃহ এই সন্ন্যাস ]

২. তোমার চোখে তাকিয়ে দেখি সূর্য ওঠে
নরোম সকাল,
আমি তখন নামাজরত শুদ্ধাচারী

তোমার চোখে তাকিয়ে দেখি
আমায় দেখি নতুন করে হারিয়ে যাওয়া
গাঁয়ের রাখাল।
[ তোমার চোখে : ঐ ]

৩. আমি শুধু চাই প্রতিদিন এই মতো সূর্য উঠুক, চাঁদ ডুবে যাক,
শহরের সব কটি রেস্তোরাঁর দরোজা খুলুক।
এর বেশী আমার কী প্রয়োজন, আমার কী বলো প্রয়োজন।
[ আমি এ-কিছুতে নেই : মানব এসেছি কাছে ]

৪. সৎকারের সন্তপ্ত মানুষ, তোমরা প্রার্থনা করো
আগন্ন মানুষ যারা তোমাদের সঙ্গমে সৎকারে জন্ম নেবে
তারা যেনো জয়ী হয়, তারা যেনো না হয় এমন আর বারবার
তোমাদের মতো ব্যর্থ পরাজিত, ব্যর্থ পরাজয়ে নত।
[ যাও সঙ্গমে সৎকারে, প্রেমে : চাই বিষ অমরতা ]

উপরোক্ত পর্যায়ের বাক্‌প্রতিমায় আছে উদ্ধারের, উত্তরণের প্রার্থনা। যে সকল প্রতিমা এখানে রচিত হয়েছে, যে ইন্দ্রিয়জ শক্তি থেকে অতিন্দ্রিয় জগতে প্রবেশের প্রার্থনা ধ্বনিত হল—উদ্বোধনী শক্তির দিকে অনুভূতি বিধৃত করে আমরা দেখলাম শুনলাম স্পর্শ করলাম, ঘ্রাণ আর স্বাদ পেলাম, অর্থাৎ এমন ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করলাম যা শুধু দৃশ্যমান স্পর্শমান শ্রব্যমান বা চিত্রল নয় বরং অনুভূতির রাজ্যে আঘাত করে—এই শ্রেণীর বাক্‌বৈভব বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি কবির সৃজনী-চেতনা কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিকে অনুরক্ত, বা কবি কোনদিকে ইশারা-ইঙ্গিত করতে প্রয়াসী। এমন প্রতিমাপুঞ্জের সাক্ষাৎ 'মানব এসেছি কাছে' গ্রন্থেই বেশি মেলে;—যেমন, জনতা পুঞ্জপ্রতিমা 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' গ্রন্থেই শুধু পাওয়া যাবে। জনতার উপর কবির তেমন আস্থা নেই, জনতা তাই কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না—যদিও আধুনিক মানুষ, শহরবাসী মানুষ জনতার অবিচ্ছিন্ন অংশ। জনতার মানসভঙ্গী, জনতার উদ্বেল অস্থিরতা, চক্রবৃত্তি তার কবিতায় খুব বেশী প্রভাব বিস্তার-পারঙ্গম নয়—এই থেকে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা যায় যে মহাদেব সাহার কাব্য-স্বভাব মৃদু-কোমল, এবং কবি অন্তর্মুখী স্রোতে অবগাহন করতেই অধিক প্রত্যাশী।

উদ্বেল জনতা-চেতনার চেয়ে কবি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ্যের দিকেই অধিক অনুরক্ত। মানুষের কাছে সম্পূর্ণ ফেরার পূর্বে দ্বিধান্বিত কবি একবার সন্ন্যাসী একবার গৃহী হয়েছিলেন, অতঃপর তাঁকে দেখি ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর মানবরূপে, এই নিষ্ঠুরতাও 'এই গৃহ এই সন্ন্যাসে' আসেনি বরং সেখানে তিনি দুঃখী। তাব এই দুঃখবাদ 'চাই বিষ অমরতা' গ্রন্থেও লেপে আছে। পরিপূর্ণ মানব হওয়ার পূর্বে এক নিষ্ঠুর মানুষের সাক্ষাৎ 'মানব এসেছি কাছে' গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হবে, দ্বিধাদীর্ণতায় দোদুল দেখা যাবে, অতঃপর শিরদাঁড়া ও হাটু-ভেঙে আজীবন সেজদার ভঙ্গিতে সর্বকল্যাণকামী মানুষের প্রার্থনা-প্রতিমারও লক্ষ্যগোচর হবে। এইবার উদ্ধৃতি আহরণ করা যাক।

নিষ্ঠুর-নির্মম মানুষ :

ছোঁবো না ধানের জমি, সবুজ ভাঁড়াব
ঐ কলাপাতা, তৃণ
এ হাতে সবে না কিছু, পরমায়ু খাবে।

[ এ হাতে ছোঁবো না : মানব এসেছি কাছে ]

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমানতা :

আমি কি গোলাপ চাই, সংসারের সুস্থতা চাই
সভ্যতার শুশ্রূষাকে চাই
নাকি আমি দুঃখ চাই, দুর্ভোগ দুর্দশা চাই, নিষ্ঠুরতা চাই ?

[ পক্ষপাত : ঐ ]

সেই দ্বন্দ্বের মুক্তির প্রতিমা :

সাক্ষী থাকো তুমি হে তৃষ্ণার নদী, হে রাখাল, অশথ বাউল
আমিতো তোমারই বশ ঐ যে সাতটি হরিৎ তৃণ, সোমত্ত সাতটি তারা
কামিনীর সাতগুচ্ছ চুল, আমি তোমাদেরই বশ

[ আমিতো তোমারই বশ : ঐ ]

কিন্তু মানুষের, জীব ও উদ্ভিদ জগতের হন্তারক যে স্বৈরাচারী মানুষই। তেমন প্রতিমা :

কল্যাণকুশল হন্তা তোমাদের পাশবপ্রধান বৃত্তি, যৌথযজ্ঞ,
বলিদান, দাহ, তোমাদের কঠিন মর্মর

আরো কতো পাখিদের পালক ঝরার শব্দে উঠে গেলো গ্রাম
দেখো পাখি ও প্রকৃতির মতো শুদ্ধ আরো কতো মানুষ লুকালো।
[ কল্যাণকুশল হন্তা মোদের : চাই বিষ.. .. ]

মানুষ নিরন্তর দুঃখজর্জর। এই দুঃখবাদ সর্ব-ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সর্বগ্রাসী দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বড় কঠিন। কখনও-কখনও এই দুঃখ-যন্ত্রণা কোনো-কোনো কবির কবিতায় অন্তর্জলী স্রোতের মতো বহমান। এই দুঃখবাদ মহাদেব সাহার কাব্যের বিস্তৃত অংশ অধিকার করে আছে :

১. কবে কখন ঠিক মনে নেই আমরা দু'জন
জ্যোৎস্নাহীন চাঁদের মাঠে জ্বলজ্বলে এক নেশার পিছু
ধাওয়া করে পেলাম কেবল দুঃখ কিছু
সে সব দুঃখ
আমার রুক্ষ চুলের ভিতর লুকিয়ে রাখি
লুকিয়ে রাখি
[ নীলকমল ও সুনীল মাছি : এই গৃহ...... ]

২ আমার এ-বুকে বাধা এই সেই দুঃখের পাথর
সেকি গীর্জের গভীরে আলো, খ্রীষ্টের দর্শন লাভ
[ বিলাপ : মানব এসেছি কাছে ]

৩. এই বুক শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য
আমার ফাটল ধরা এই বুক
বৃষ্টির মধ্যে থরথর কাঁপা আমার এ-হাত শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য
[ তোমাকে উৎসর্গ, দুঃখ : চাই বিষ.... ]

উপরোক্ত বাক্‌বৈভবকে বলা যায় দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতিমাপুঞ্জ। এখানে কবির ভাবনা আবর্তিত হয়েছে এই একটি বিশেষ প্রতিমায়। তাঁর তিনটি কাব্য-গ্রন্থের বড় অংশ জুড়ে দুঃখ-নৈঃসঙ্গ-বেদনা—কিন্তু এই অতীব দুরূহ ভাবনাবৃত প্রতিমায় সিদ্ধিলাভ সহজসাধ্য নয়। জ্যোৎস্নাহীন চাঁদের মাঠে নেশার পিছু ধাওয়া করে দুঃখ লাভ, বুকে বাঁধা দুঃখের পাথার, দুঃখ পাওয়ার জন্য ফাটল-ধরা কবির বুক, বা বৃষ্টির মধ্যে থরথর কাঁপা দুঃখ-পাওয়া হাত—কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই এই সব ছত্র-বিধৃত প্রতিমার। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে,

প্রাচীনচারী চিত্রের প্রভাবে এক ভাবনার আবর্ত সৃষ্টি করে। গীর্জার গভীরে আলো, খ্রীষ্টের দর্শন লাভ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ এক ভাবনাময় প্রতিমার উদ্ভাস হয়, কিন্তু এইভাবে বলার মধ্যে নবত্ব নেই। 'চাই বিষ অমরতা' গ্রন্থের 'তোমাকে উৎসর্গ, দুঃখ' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে ধরা যেতে পারে। এই কবিতার কতকগুলি প্রতিমা এই : ফাটল ধরা বুক, বৃষ্টির মধ্যে থরথর কাঁপা আমার এ-হাত, দুঃখদীর্ণ এই বুক, কালো ক্ষুব্ধ চোখ, এ-নগ্ন বুক, ফুলের মতো গভীর বুক, বেদনায় কাঁদো চোখ—এসব প্রতিমাকে বলা যেতে পারে dead imagry, 'কোনো কালে হয়তো কেউ যখন প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তখন তাতে ছিল নবত্বের আকর্ষণ যদিও চিন্তনের গভীরতা নয়, কিন্তু বহুপ্রয়োগের ফলে এগুলি বাঁধিগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কবিকল্পনা উদ্বুদ্ধ না হয়েও অভ্যস্ত প্রয়োগে সন্তুষ্ট থাকতে পারে'। তবে 'আগুনের মতো আন্তরিক/এই চোখ, শস্যের মতো স্বাধীন এই হাত উৎসর্গ করেছি' প্রতিমা, বিশেষত দ্বিতীয় বাক্‌চিত্রটি আমাদের সুখী করে। এই গ্রন্থের 'মানুষ ক্ষমা পায় না' কবিতায়ও তেমন **dead imagery**-র সাক্ষাৎ মেলে। যেমন, কাঁদতে-কাঁদতে মানুষ এমন পাথর হলো', 'মানুষ পাথরপ্রতিম হলো' বাক্‌চিত্রদ্বয়। এই কবিতার মূল প্রতিমা দুঃখ, দুঃখকে ভাবনাবৃত বাক্‌বৈভবে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু গভীরতার অভাব হেতু জীর্ণ হয়ে পড়েছে।

কবির প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে 'জল' একটি অতি পরিচিত এবং প্রিয় প্রতিমা। দুটি গ্রন্থে জলের উপমা-রূপক-প্রতীক বহুবার এসেছে। মানুষের সঙ্গে জলের সম্পর্ক নিবিড়। কবি দ্বিতীয় গ্রন্থে মানুষের জন্য তৃষ্ণার জল নিয়ে উপস্থিত, কিন্তু তিনি জলের সংহার শক্তির কথা ভোলেননি। যেমন :

১. মানুষের সাজানো সংসার
এই ভয়ঙ্কর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ

[ফ্লাড : এই গৃহ এই সন্ন্যাস]

২. তাই ঢাকাতেও বেরিয়েছে এতো বড়ো মিছিল :
সীতা, এই ভয়ঙ্কর বন্যায় আমাদের সব
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে

[ঐ : ঐ]

সমগ্র কবিতায় 'ভয়ঙ্কর বন্যায়'-এর মতো সাধারণ প্রতিমা অনেক আছে। এই কবিতায় দৃশ্যমান প্রতিমার প্রাধান্য অধিক, তবে সীতা ও কবির মধ্যেকার অদৃশ্য বেদনার প্রতিমা কবিতাটিকে মননধর্মী করে তুলেছে।

আবার :

জল নেই শহরে কোথাও
শহরের কোথাও আজ শান্তি নেই, যদিও অনর্গল শান্তির ডঙ্কা পেটাও
খুলে দাও জলছত্র, তবু হায়
এ শহরে মরে লোক ভয়ে, জলশূন্যতায় আর
পিপাসায়।

[জলছত্র : ঐ]

এখানে জলের প্রতিমা মননশীলতা থেকে মঙ্গলচিন্তান্বিতধর্মী হয়েছে। কবির ভাবনা এখানে শাশ্বত চিন্তাধর্মী। মহাদেব সাহার চিন্তার বিশিষ্টতা এই জন্যই বলি সূর্য, রৌদ্র, জল (মেঘ), দুঃখ ও মানুষ প্রতিমায় মিলবে। এইসব শব্দসম্ভারে কবির শিল্পী সত্তার কিছু আভাস পাওয়া সম্ভব।

পরিশেষে কবির বস্তু ও পরাবস্তুর মধ্যে গতায়তের একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। এই স্বভাবই তাঁর কাব্য-শরীরকে স্থূল জড় রূপ থেকে মুক্তি দিয়ে সুন্দর করে তোলে। যেমন :

মানুষকে ধরে বলি এইখানে ঠিক
সন্ধ্যেবেলা দাঁড়াও তুমি স্বর্ণচাপার গাছটি হয়ে
আমার ঘরের মধ্যিখানে মেলো তোমার
ডালপালা সব এক এক করে
গাছ হয়ে যাও আমার তুমি স্বর্ণচাঁপা
আমার তুমি বুকের মধ্যে লতাপাতা, শিশিরকণা
মানুষ তুমি বৃক্ষ আমার বুকের মধ্যে স্বর্ণচাঁপা
লতাপাতা, সবুজ তৃণ,
গাছ তুমি মানুষ আমার রাত্রিকালে সঙ্গে যাবে
কাছে শুয়ে ঘুম পাড়াবে বৃক্ষ তুমি মানুষ আমার,

[অনেক কিছু ভুল হয়ে যায় : মানব এসেছি]

উপরোক্ত শেষ উদ্ধৃতিটি 'মানব এসেছি কাছে' গ্রন্থ থেকে নেওয়া, কেননা এই গ্রন্থেই কবির শ্রেষ্ঠ বাক্প্রতিমার উল্লেখ পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। উল্লেখিত বাক্প্রতিমায় বৃক্ষ আর মানুষের মধ্যে নিবিড় সাযুজ্য, বৃক্ষের মানুষ হওয়া এবং মানবের বৃক্ষে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে যে ভাব লাভ, বস্তু থেকে পরাবস্তুতে এবং পরাবস্তু থেকে বস্তুতে আগমন যে বোধের সৃষ্টি করে—কবি কল্পনার এই জড়ত্ব থেকে পরাবাস্তবে গতায়ত সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় চেতনায় উদ্বোধিত। মহাদেব সাহার সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত বাক্-প্রতিমা মূলত এইগুলি।